আইনস্টাইনের বিশ্ব

অনুবাদক
ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত

মূলগ্রন্থ নিগেল ক্যালডারের আইনস্টাইনস্ ইউনিভারস্
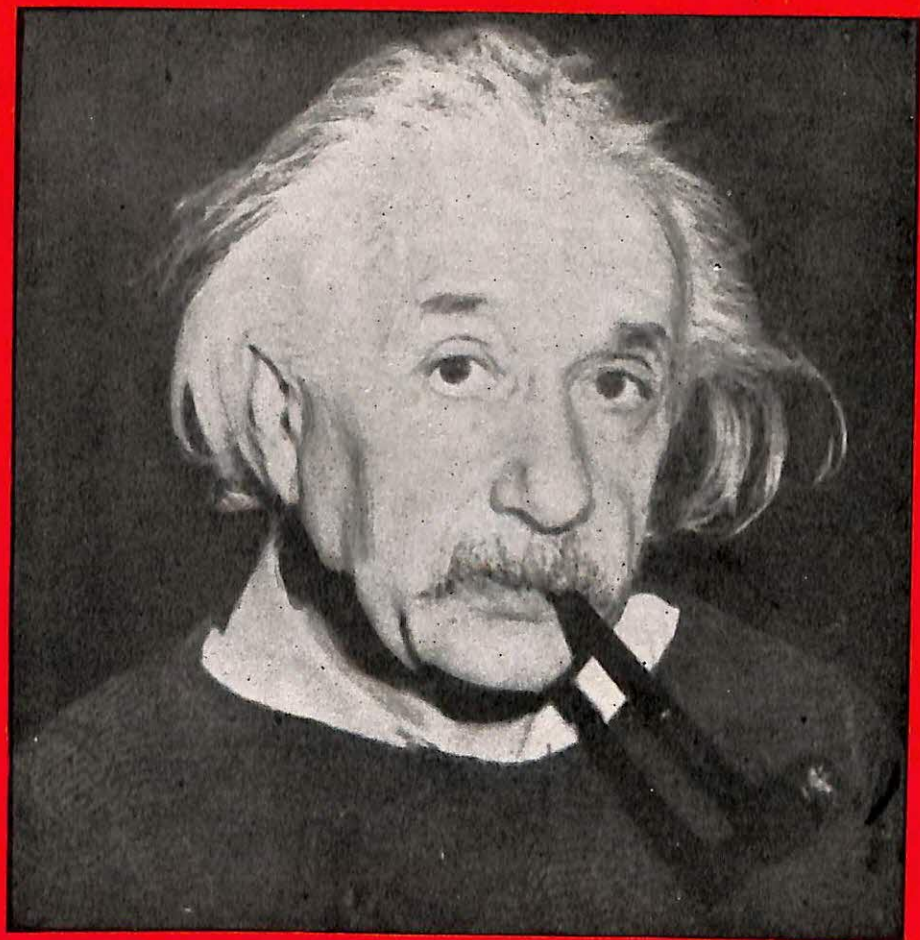
আইনস্টাইনের বিশ্ব

আইনস্টাইনের বিশ্ব

মূলগ্রন্থ নিগেল ক্যালডারের আইনস্টাইনস্ ইউনিভারস্

অনুবাদক

ডঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত

বেস্টবুক্স্

১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০ ০০৯

লেখকের কথা

কোন সত্যকে অনাবশ্যক সরলীকৃত করে বলা সত্যকেই ছোট করা। সবটা যদি তখনই বুঝতে না পারা যায় তবু যে বোঝাটা শুরু হয় সেটা সত্য। আইনস্টাইন যে বিশ্বের কথা ভেবেছিলেন তাকে অনুধাবন করা খুব সহজসাধ্য নয়। আমার এই লেখার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ যদি আইনস্টাইনের বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করেন তবেই পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৩২

ড. শঙ্কর সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

মহাজাগতিক ঘূর্ণিবাত্যা

১। মাধ্যাকর্ষণ ও অতিদ্রুতগতি, জগৎ সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আনে।
২। সাধারণ আপেক্ষিকতবাদ মাধ্যাকর্ষণকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
৩। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অতি দ্রুতগতির প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।
৪। সব কিছুর চেহারা পালটাতে পারে কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি অপরিবর্তনীয়।
৫। কৃষ্ণ গহ্বরের সন্ধান আইনস্টাইনের চিন্তাধারারই ফলশ্রুতি।

ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ আর বর্তমানে অসংখ্য কৃত্রিম উপগ্রহ নিখিলবিশ্বের চারিপাশে ছোটাছুটি করছে। বস্তুদের স্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কিন্তু আমাদের সময়ের ধারণা জন্মায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর নিজ কক্ষপথের চারিপাশে আবর্তনের জন্য সূর্যকে আমরা পূর্ব আকাশে উদিত হয়ে পশ্চিম আকাশে অস্ত যেতে দেখি এবং এ থেকে আমাদের দিন রাত্রি সম্বন্ধে ধারণা জন্মায়। কাছে অথবা দূরের দৃশ্যপটের পরিবর্তনের ওপরই স্থান, কাল, ও গতির সম্বন্ধে মানুষের ধারণা গড়ে ওঠে।

আলবার্ট আইনস্টাইন স্থান কাল ও গতির সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণাতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনলেন। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি অনেকগুলো মহাজাগতিক রহস্যের সমাধান করলেন এবং মাধ্যাকর্ষণের ধারণাকে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিলেন। তাঁর গাণিতিক সমীকরণগুলির মধ্যে কেন্দ্রীন শক্তি, কৃত্রিম উপগ্রহের চলাচল, রাডার, লেসার রশ্মি ও আণবিক ঘড়ি প্রভৃতি অনেক কিছুরই ইঙ্গিত ছিল। এমন কি তিনি সময়ের গতিময়তা আরোপ করেছিলেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী হ্যালডেন আইনস্টাইনকে যিশু খ্রীষ্টের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ইহুদি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। আইনস্টাইন অবশ্য প্রশংসা বাক্য একেবারেই পছন্দ করতেন না। বিশেষত তাঁদের প্রশংসা যাঁরা তাঁর প্রবর্তিত তত্ত্বের সঙ্গে একেবারেই পরিচিত ছিলেন না।

কুঞ্চিত কপাল, শ্বেতশুভ্র কেশদাম সমৃদ্ধ আইনস্টাইনের যে ছবিটি আমরা সচরাচর দেখে থাকি তা কিন্তু তাঁর প্রকৃত সত্ত্বার প্রতিনিধিত্ব করে না। এই ছবিটি

সেই আইনস্টাইনের যিনি তড়িৎ ও মাধ্যাকর্ষণকে একই সূত্রে বেঁধে দেবার ব্যর্থ প্রয়াসে আমৃত্যু (১৯৫) বার্লিন ও প্রিন্সটনে নিঃশব্দ পদচারণা করেছেন। যে আইনস্টাইনকে তাঁর উত্তর পুরুষেরা সম্মান জানিয়েছে সেই আইনস্টাইন কিন্তু ১৯১৯ সালের আইনস্টাইন যখন মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি বিজ্ঞানে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ এই সময়ের মধ্যে সমাপ্ত। ১৯০৪ থেকে ১৯১৭ সাল অর্থাৎ পঁচিশ থেকে আটত্রিশ বছরের মধ্যে তাঁর মাথায় বিশ্বসংক্রান্ত সকল নতুন ভাবনা চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। আইনস্টাইনের কাজের যুগান্তকারী অংশ দুটো হলো বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (১৯০৫)—যা অতি দ্রুতগতির ব্যাপারটিকে প্রাধান্য দেয় এবং সাধারণ আপেক্ষিকতা-বাদ (১৯১৫)—যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো মাধ্যাকর্ষণ।

আইনস্টাইন যখন তাঁর তত্ত্বটি উপস্থাপন করেছিলেন সে সময় থেকে কিন্তু আজ অনেকদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। পরবর্তী কালে সকল রকমের পরীক্ষায় এইটাই প্রমাণিত হয়েছে যে আমরা যে প্রকৃত বিশ্বে বাস করি তা আইনস্টাইন প্রস্তাবিত বিশ্বের সঙ্গে একেবারে মিলে যায়। এছাড়া আইনস্টাইনের সমীকরণে যে সমস্ত জিনিষ সুপ্ত অবস্থায় ছিল তাও সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। আমরা এখানে আইন-স্টাইন প্রস্তাবিত বিশ্বকে সাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সাধারণতঃ যেভাবে তার বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ আলোচনা করা হয় তাতে ঘড়ি, আলোক সংকেত প্রভৃতি নানান ধরণের জটিল তথ্যের অবতারণা বিষয়টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ফলে স্থিরতা ও শক্তি বা আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত মূল ধারণাগুলি অস্পষ্টই থেকে যায়। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ বছর বছর ধরে বহু বিজ্ঞানীরই বোধগম্য ছিল না—সাধারণ মানুষের কথা ত বাদ। এখন কিন্তু অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। আণবিক ঘড়ির যুগে এবং প্রস্তাবিত কৃষ্ণগহবর, আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত ধারণার আলোচনা সম্ভব ও সময়োপযোগী করে তুলেছে।

একথা প্রায়শই বলা হয়ে থাকে যে আইনস্টাইন সমস্ত কিছুকে আপেক্ষিক বলে ভাবতেন। প্রকৃত অর্থে এটা সত্য নয়। আপেক্ষিকতা কথাটি তাঁর তত্ত্বের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব করে না। আইনস্টাইন ঠিক এর বিপরীত কথাটি বলতেন—তাঁর মতে তাঁর তত্ত্বের যথোপযুক্ত নাম হবে স্থিরতা নীতি (invariance principle)। যা কিছু চরম, যা কিছু আপাতবৈষম্য থাকা সত্ত্বেও নির্ভর-যোগ্য তাদের তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। আপেক্ষিক গতির জন্য বা মাধ্যাকর্ষণের জন্য যে সমস্ত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তাদের সন্ধান করেছিলেন তিনি। 'আপেক্ষিকতা' কথাটির একটি মাত্র সার্থকতা আছে। পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে পর্যবেক্ষকের যে একটি ভূমিকা আছে আপেক্ষিকতা সেই কথাটিই প্রতিপন্ন করে।

আইনস্টাইন আধুনিক বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষককে তাঁর যথোপযুক্ত মর্যাদা দিয়েছিলেন।

সময় যদি বাঁকা পথ নেয় বা দূরত্ব যদি কোন সময় ছোট হয়ে যায় তবে স্থান কাল কি ভাবে নির্ভরযোগ্য ভাবে পরিমাপ করা যাবে? কোনটি সত্য কোনটি মায়া? কোন বস্তুর শক্তি কতখানি তা যখন পর্যবেক্ষকের ওপর নির্ভর করে তখন সেই বস্তুকে ও সেই বস্তুর ওপর সক্রিয় মাধ্যাকর্ষণকে বর্ণনা করা যাবে কি করে? সংক্ষেপে এই প্রশ্নটিই করতে হয়—প্রাকৃতিক নিয়মগুলি কি সকলের কাছে একই হবে—পর্যবেক্ষকের অবস্থান বা গতির ওপর নির্ভর করবে না? সম্ভবতঃ আইনস্টাইন নিজেও এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন—কখনও প্রশ্নটির বক্তব্যকে গ্রহণ করেছেন কখনও বা চেয়েছেন বর্জন করতে। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটির যথার্থ প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁর মনে যে নতুন উপলব্ধির উন্মেষ ঘটল এই বইটি তারই বিবরণ।

১৯৭০ সাল নাগাদ আপেক্ষিকতাবাদ বিজ্ঞান হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এর আগে কিন্তু অবস্থাটা অন্যরকম ছিল। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো লিখলেন ঃ—"এটা খুব অদ্ভুত ব্যাপার যে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব যা নিউটনের হাতে সৃষ্টি হয়ে আইনস্টাইনের হাতে পরিণতি লাভ করেছে তা একটি রাজকীয় একাকিত্বের সম্মুখীন হবে। এটি যেন বিজ্ঞানজগতে তাজমহলের মত দাঁড়িয়ে আছে—বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার চমকপ্রদ অগ্রগতিতে এর যেন কোন ভূমিকা নেই"। এই একাকিত্বের অবসান ঘটেছে। পদার্থ বিজ্ঞানের সকল ক্রিয়াকলাপের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বটি আর তেমন নিঃসঙ্গ নয়। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আপেক্ষিক জ্যোতির্পদার্থ বিদ্যা—বিজ্ঞানী হকিন্সের তত্ত্ব। সকলেই আজ মাত্রাতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণ (intense gravitation) ব্যাপারটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি আইনস্টাইন যে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন তার প্রেক্ষাপট আজ একেবারে বদলে গেছে।

আইনস্টাইন যেখানে থেমেছিলেন তার পরের অংশগুলি নিয়ে বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আজ নিরন্তর গবেষণায় মগ্ন। যতদূর চিন্তা করা যায়, যতদূর কার্যকরী ভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো যায় ততদূর পর্যন্ত এই সব বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের ধ্যানধারণার চুলচেরা বিশ্লেষণ করছেন। অচিরেই পাঠক নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপাতদৃষ্টিতেও আইনস্টাইনের চিন্তা ভাবনাগুলো ভুল প্রমাণিত করা যাবে না। পরীক্ষার পর পরীক্ষার সাহায্যে আইনস্টাইনের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোন কোন সময়ে কিছু বৈপরীত্য লক্ষিত হলেও তা অচিরে ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে অনেক ঘটনাই ভুল হতে পারে কিন্তু একটি ভাল তত্ত্বের মধ্যে ত্রুটি খুব একটা থাকে না। যাঁরা নিউটন বা আইনস্টাইনের উত্তর

সাধক তাঁদের এই সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া উচিত যে কোথায় এবং কখন নিউটন বা আইনস্টাইনের সমীকরণগুলি অসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখানে হয়ত তাদের বিফল হতে হবে কেন না দেখা যাবে আইনস্টাইনের সমকালীন বিশ্ব যা ছিল আজও তা ঠিক তেমনি আছে।

সুতরাং আইনস্টাইন যা বলেছিলেন তা পুরোনো হয়ে গেছে ভেবে তাঁর তত্ত্বটি বোঝার চেষ্টা থেকে বিরত থাকাটা সমীচীন হবে না। অপরদিকে আইনস্টাইনের তত্ত্বটি বুঝতে গিয়ে কেউ যদি পায়ের তলায় মাটি না পান তবে তিনি শতাব্দীর একটি সেরা জিনিষের রসাস্বাদনে বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমান বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী যে বিশ্বে আমরা বসবাস করি তার ভিত্তিই রচিত হয়েছে আইনস্টাইনের তত্ত্বের সাহায্যে। আইনস্টাইন এমন একটি পরিণত শিল্পকলা সৃষ্টি করে যাননি যার ওপরে তাঁর উত্তর সাধকদের আর হস্ত চালনা করতে হবে না। বরং পুরো ব্যাপারটি ঠিক বিপরীত। তিনি একটি চিন্তাসমৃদ্ধ কাঠামো তাঁদের জন্য তৈরী করে গেছেন এবং কয়েকটি বিশেষ তত্ত্ব দিয়ে গেছেন যা তাঁর সকল ধারণা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে কোন আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সাহায্য করবে। এইটাই হলো আইনস্টাইনের বিশ্ব।

আইনস্টাইনের ধারণার কার্যকারিতার একটি আধুনিক ও চমকপ্রদ উদাহরণ হলো M ৮৭ ছায়াপথটি। এই ছায়াপথের মধ্যে যে সব নক্ষত্র আছে তাদের যে প্রচণ্ড আলোড়ন লক্ষ্য করা যায় তার ব্যাখ্যা আইনস্টাইনের তত্ত্বের সাহায্যেই সম্ভব। M অক্ষরটি চার্লস মেসিয়ার নামের আদ্যক্ষর। আজ থেকে দুশো বছর আগে প্যারিস সহরের একটি চূড়ায় বসে তিনি কমেটদের নিয়ে অনুসন্ধান করতেন। কমেট ছাড়া আকাশে অন্যান্য বস্তু যাতে তাঁর অনুসন্ধানকে ব্যাহত করতে না পারে তার জন্য তাদের একটি ম্যাপ তৈরী করলেন। তিনি ১৭৮৪ সালে এ ধরণের বস্তুদের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এই তালিকার মধ্যে আজকের দেখা অনেক চিত্তাকর্ষক বস্তু আছে। কমেটদের সম্বন্ধে গবেষণার চেয়েও তিনি যে তার তালিকাটির জন্য বেশী বিখ্যাত হবেন একথা তিনি হয়ত নিজেই জানতেন না। শেষ পর্যন্ত নিউটনের বিশ্বের একজন কর্মঠ অধিবাসী হিসাবে মেসিয়ার তাঁর আশ্চর্যজনক কমেটদের নিয়েই পুনরায় অনুসন্ধানে নিমগ্ন হন।

১৯৭০ সালের শেষের দিকে আরিজোনাতে একদল জ্যোতির্বিদ ১৫০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট টেলিস্কোপের সাহায্যে M ৮৭ ছায়াপথের অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। ভিরগো কনসটিলেসনের মধ্যে এই M ৮৭ মেসিয়ার কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল। ঐ জ্যোতির্বিদদের দলের মধ্যে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ছিলেন। এই সব বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের বিশ্বের অধিবাসী। তাঁরা যে নতুন আবিষ্কারে চমৎকৃত

হলেন তা কিন্তু কোন কমেট নয়। M ৮৭ এর হৃদয়ে তাঁরা এক অভূতপূর্ব জিনিষের সন্ধান পেলেন যার নাম কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল। আইনস্টাইন ১৯১৫ সালে যখন মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলি প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর সমীকরণের মধ্যে কৃষ্ণ-গহ্বরের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিহিত ছিল। ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর হলো শূন্যে এমন কতগুলি বস্তু যার মধ্য থেকে কোন বস্তু বেরিয়ে আসতে পারে না। ১৯৭৮ সালে আরিজোনার বিজ্ঞানীরা M ৮৭-এর হৃদয়ে এ ধরণের কৃষ্ণ গহ্বর বা ব্ল্যাক হোলের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করলেন। এই কৃষ্ণগহ্বর একটি ভীতিপ্রদ জিনিষ। এরা সূর্য থেকে প্রায় বিলিয়নগুণ বেশী ভারী এবং অনেকগুলো তারার সমষ্টিকে একবারে গ্রাস করে নিতে পারে।

যে ছায়াপথে অসংখ্য তারা ও আমাদের অতিপরিচিত সূর্যের অবস্থান সেই রকম M ৮৭ অসংখ্য তারকাখচিত একটি ছায়াপথ। কিন্তু M ৮৭ ছায়াপথটি আরও অনেক বড় এবং অনেক বেশী গোলাকার। ভিরগো নামে ছায়াপথের সমষ্টির মধ্যে M ৮৭ একটি সুপ্রসিদ্ধ সদস্য। এখন পর্যন্ত যা হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে M ৮৭ প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। এর মানে হলো আজ রাত্রে M ৮৭ থেকে যে আলো টেলিস্কোপে এসে ঢুকেছে তা পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর আগে প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০০ মাইল গতিবেগ নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। তখন আমাদের পূর্বপুরুষেরা হয়ত আদিমগুহাবাসী ছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানী দূরত্ব মাপার জন্য এই যে আলোর পরিভ্রমণের সময়কাল ব্যবহার করতেন তাতেই স্থান ও কালের মধ্যে মিলন সেতু রচিত হয়েছিল। এই মিলন যজ্ঞে পৌরহিত্য করেছিলেন স্বয়ং আইনস্টাইন। ১৯১৭ সালে আইনস্টাইন যে মহাজাগতিক সমীকরণগুলি বার করেছিলেন তাতে এই তথ্যটি নিহিত ছিল যে সমগ্র বিশ্ব সম্ভবতঃ আকারে ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। এতে ছায়াপথগুলি দ্রুতগতিতে পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে দেখা গেল আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত প্রায় অভ্রান্ত—M ৮৭ প্রায় সেকেন্ডে ৭০০ মাইল গতিবেগে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

অল্পসংখ্যক কিছু ছায়াপথে জ্যোতির্বিদেরা প্রচন্ড আলোড়ন লক্ষ্য করে থাকেন। এই বিশেষ ধরণের বস্তুদের মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি আছে M ৮৭। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে বেতার জ্যোতির্বিদ্যা (Radio astronomy) শাস্ত্রটির দ্রুত বিকাশ ঘটতে থাকে। দেখা গেল M ৮৭ বেতার তরঙ্গের একটি অতি শক্তিশালী উৎস। আরও গভীরভাবে লক্ষ্য করে জ্যোতির্বিদরা দেখতে পেলেন ঐ ছায়াপথ থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন গুণ লম্বা জেটের মত নীল রঙের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দুই দশক পরে যখন রকেট ও উপগ্রহ পৃথিবীর আবহমন্ডলের বাইরে যেতে সুরু

ক্রমান্বয়ে তার আগের চেয়ে বেশী দূরত্ব যেতে হবে। এরফলে তরঙ্গগুলি ছড়িয়ে পড়ে ও কম্পন সংখ্যা কমে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দের তীক্ষ্ণতা কমে যায়।

এই ধরণের এফেক্ট বা ক্রিয়া আলোর বেলাতেও দেখা যায়। যেমন বিভিন্ন তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট শব্দের কম্পন সংখ্যা ভিন্ন সেইরকম বিভিন্ন কম্পন সংখ্যার আলোও ভিন্ন ভিন্ন। আলো শব্দের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগতিতে চলে। আলোর গতির সঙ্গে তুলনা করলে দ্রুততম গতিসম্পন্ন ট্রেনকেও স্থির বলে মনে হবে। তাই একটি ট্রেনের গতির সঙ্গে সঙ্গে রঙের পরিবর্তন দর্শকের কাছে সহজে ধরা পড়বে না। কিন্তু নক্ষত্রদের বেলাতে এধরণের রঙের পরিবর্তন সহজে ধরা যাবে।

একটি প্রিজমের মাঝ দিয়ে সাদা আলো সাতটি রামধনুর রঙে ভেঙ্গে যায়। রঙগুলি হলো যথাক্রমে লাল, কমলা, হলুদ, নীল এবং শেষে বেগুণী। নীল আলোর কম্পন সংখ্যা লাল আলোর কম্পন সংখ্যার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন আলোকময় বস্তু যদি কারুর দিকে এগোতে থাকে তবে তার কাছে মনে হবে যেন আলোর কম্পন সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। কম্পন সংখ্যা বাড়ার জন্য বস্তুটি নীল বলে প্রতীয়মান হবে। পদার্থবিদরা ও জ্যোতির্বিদরা এই প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন ব্লু-শিফট্। অপরদিকে যে আলোকময় বস্তু দূরে সরে যাচ্ছে তখন সেই সরে যাওয়া আলোকময় বস্তুটি লাল দেখাবে। নীল বা লাল শব্দদুটি খুবই সাবধানে ব্যবহার করা দরকার কারণ যদি উৎস ও দর্শকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি খুব বেশী না হয় তবে এ ধরণের রঙের পরিবর্তন খালি চোখে দেখা যাবে না।

ডপলার এফেক্ট ও মাধ্যাকর্ষণের জন্য আলোর রঙের পরিবর্তন বা অন্যান্য বিকিরণের কম্পন সংখ্যার অনুরূপ পরিবর্তনের কথা এই বইটিতে বারে বারে উল্লিখিত হবে। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণভাবে লাল রঙকে গরম এবং নীল রঙকে শীতল রঙ বলে বলা হয়। পদার্থবিদের কাছে ব্যাপারটি একেবারে উলটো। নীল আলোর কম্পন সংখ্যা বেশী। এর ফলে এর শক্তিও বেশী যা বেশী তাপমাত্রাতেই সম্ভব। লালের কম্পন সংখ্যা কম। ফলে এর শক্তিও কম এবং মোটামুটি শীতল অবস্থা নির্দ্দেশ করে। কোন বস্তু গরমে লাল হয়েছে বললে যে তাপমাত্রা বোঝায় বস্তুটি গরমে নীল বললে বেশী তাপমাত্রা বোঝায়। আরও ব্যাপক ভাবে বলতে গেলে রেড শিফট বলতে সংক্ষেপে কম্পন সংখ্যা তথা শক্তি কমা বোঝায়; অপরদিকে ব্লু-শিফট্ মানে হলো কম্পন সংখ্যার বৃদ্ধি।

ডপলার এফেক্টের প্রকৃত মূল্যায়ণ আইনস্টাইনের কাছে খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। তিনি দেখলেন আলোর ব্যবহার একেবারে শব্দের মতন নয়। শব্দ তরঙ্গ, প্রবাহিত হতে গেলে সব সময় বাতাসের মতন একটি মাধ্যমের প্রয়োজন

হয়। শব্দের ক্ষেত্রে ডপলার এফেক্টের পরিমাণ নির্ভর করে শব্দের উৎস শ্রোতার দিকে যাচ্ছে কিনা বা শ্রোতা শব্দের উৎসের দিকে যাচ্ছে কিনা তার ওপর। উনবিংশ শতাব্দিতে এমন একটি ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল যে আলোক তরঙ্গ ইথার নামে এক ধরণের মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ডপলারের সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে আলোর ক্ষেত্রেও ডপলার এফেক্টের পরিমাণ নির্ভর করে আলোর উৎস (যেমন একটি নক্ষত্র) দর্শকের এগুচ্ছে না দর্শক আলোর উৎসের দিকে যাচ্ছে তার ওপর।

আইনস্টাইনের বিশ্ব কিন্তু গণতান্ত্রিক। কোন রকম তফাৎ সেখানে চলে না। এখানে যে জিনিষটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তাহলো নক্ষত্র এবং দর্শকের মধ্যেকার আপেক্ষিক গতি। সংশোধনটি খুব ছোট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের কারণ হলো নীল আলো লাল আলোর চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং রঙের পরিবর্তন মানেই হলো শক্তির পরিবর্তন এবং সমগ্র বিশ্বই শক্তির দ্বারা চালিত।

পদার্থবিজ্ঞানে শক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা কিন্তু সাধারণ মানুষ শক্তি বলে যা বোঝায় তার থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়। একজন শক্তিশালী লোক কঠিন পরিশ্রম করতে পারে—নানা কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। অনেক সময়ে একটি দেশে শক্তির অভাব ঘটে—কি ভাবে কলকারখানা চালানো যায় বা বাড়ী গরম রাখা যায় সেই চিন্তাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। একজন পদার্থবিদের কাছে শক্তির অর্থ হলো জগতে কোন কিছুর মধ্যে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা। কোন একটি বস্তুকে চালিত করা (গতি শক্তি), কোন বস্তুকে গরম করা (তাপশক্তি) গাছপালা বৃদ্ধি (রাসায়ণিক শক্তি) এধরণের পরিবর্তনের উদাহরণ। যতই শক্তির পরিমাণ বেশী হবে ততই পরিবর্তনগুলিও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এক ধরণের শক্তিকে অন্য একটি রূপে রূপান্তরিত করা যায়। একটি গাড়ীতে ইঞ্জিন জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই তাপশক্তি সিলিণ্ডারের মধ্যে রাখা গ্যাসের চাপ বাড়িয়ে পিষ্টনকে চালিত করে এবং আমরা গতিশক্তি লাভ করি। প্রকৃতি শক্তি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হিসাব রাখে। প্রকৃতিতে মোট শক্তির পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে না। বড়জোর রকমফের ঘটতে পারে।

আইনস্টাইন এ সমস্ত জানতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ডপলার আলোর এফেক্টের ওপরে তাঁর সংশোধন যা কম্পন, সংখ্যার তথা শক্তির খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটাবে তা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিতে পারে। এমন একটি ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য তিনি বিশ্বের মধ্যে এমন একটি শক্তির উৎসের কথা বললেন যার কথা সেই আমলের বিজ্ঞানীদের চিন্তার বাইরে ছিল।

করলো তখন দেখা গেল আকাশের বিভিন্ন দিক থেকে রঞ্জনরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমাদের ছায়াপথে এই রঞ্জনরশ্মির অনেক উৎস থাকলেও এর বাইরে M ৮৭ রঞ্জন রশ্মির শক্তিশালী উৎস।

সব দিক থেকে দেখলে M ৮৭ খুবই সক্রিয় হলেও শক্তি নির্গতকারী অন্যান্য ছায়াপথের তুলনায় শান্ত। এর কারণ হলো এই বিশেষ ধরণের ছায়াপথের নক্ষত্র-গুলি তাদের দেহের জ্বালানীর থেকে যে শক্তি উৎপাদন হয় তার চেয়েও বেশী শক্তি নির্গত করে। এই সব বিস্ফোরণশীল ছায়াপথগুলিই সম্ভবত অধুনা পরিচিত কোয়াসার। ১৯৬০ সালের প্রথম দিকে এদের আবিষ্কার করা হয়। কোয়াসারগুলি বহুদূরবর্তী ক্ষুদ্রকায় বস্তু যার থেকে প্রচণ্ড শক্তি বেরিয়ে আসছে। এই পরিমাণ শক্তি জোগাচ্ছে কে? তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা এর জন্য নানা রকমের তত্ত্বের অবতারণা করলেন। এর মধ্যে আছে (১) তারার মধ্যে পরস্পরের সংঘর্ষ, (২) তারাদের মধ্যে অবস্থিত কণা ও প্রতীপ কণাদের (Antiparticle) মধ্যে সংঘর্ষ। এই দুই বিক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়। শেষ পর্যন্ত আইন-স্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব সমস্যার সমাধান করতে এগিয়ে এলো। ১৯৭০ সাল নাগাদ অনেক জ্যোতির্বিদই স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে বিস্ফোরণশীল ছায়াপথ এবং কোয়াসারের শক্তির উৎস হলো কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাক হোল।

এ ব্যাপারে মূল ধারণাটি হলো ছায়াপথের অন্তরে এমন একটি বস্তু আছে যা নক্ষত্রদের গ্রাস করে ফেলতে পারে। একটি ছিদ্রের দিকে জল যেমন অতি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায় সেই রকম একটি ছায়াপথের অন্তরে অবস্থিত যদি কোন নক্ষত্র বা কোন গ্যাস ঐ বস্তুর কাছে এসে পড়ে তখন পাক খেতে খেতে তার দিকে ধাবিত হয়। এই পতনোন্মুখ বস্তুগুলি অতলে হারিয়ে যাবার আগে ক্রমান্বয়ে সুতীব্র শক্তি নির্গত করতে থাকে। এ ধরণের একটি প্রক্রিয়া এই ঘূর্ণিবাত্যার মধ্য থেকে জেটের মত বস্তু (matter) বার করে দিতে থাকে। ক্ষুদ্রকায় কোয়াসারদের এই বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো যে তারা অতি দূরবর্তী বিস্ফোরণশীল ছায়াপথ যাদের মধ্যেকার আলোড়নের তীব্রতার দরুণ যে তারা পার্শ্ববর্তী অন্যান্য তারাগুলি তুলনায় অনেক সুপরিস্ফুট।

আরিজোনার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতে চেষ্টা করলেন M ৮৭ ছায়াপথে তারাগুলো কত দ্রুত চলছে। যে কোন ছায়াপথের একটি নক্ষত্র ছায়াপথের কেন্দ্রের চারিপাশে ঘুরে বেড়ায় ঠিক যেমন পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘোরে। আমরা ও আমাদের সূর্য ছায়াপথের কেন্দ্রের চারিপাশে সেকেণ্ডে ১৭০ মাইল গতিবেগ নিয়ে আবর্তিত হচ্ছি। যদি ছায়াপথের কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভর সঞ্চিত থাকে তাহলে কেন্দ্রের কাছাকাছি যে সব নক্ষত্রেরা আছে তাদের বৃত্তাকার

গতিবেগ অনেক বেশী হবে। কেন্দ্রের কাছাকাছি নক্ষত্রদের গতিবেগ জানতে পারলে কেন্দ্রে অবস্থিত ভরের ওজন পরিমাপ করা যাবে।

এই ধরণের গতিবেগ নির্ণয়ের ব্যাপারটি এতই সূক্ষ্ম ছিল যে ১৯৭৩ সালে ইলেকট্রনিক আলো গ্রাহক যন্ত্র আবিষ্কারের আগে তা সম্ভব ছিল না। এই যন্ত্রে একটি ফোটন স্পর্শকাতর (sensitive) কোন তল থেকে একটি ইলেকট্রন বার করে দেয়। আইনস্টাইনের "আলোক তড়িৎক্রিয়া" (photo electric effect) আলোর চরিত্র ও শক্তির মধ্যে যে সম্পর্ক তার সম্বন্ধে আধুনিক ভাবনাচিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করল। তাঁর তত্ত্বটি কাজে লাগিয়ে আলোগ্রাহক যন্ত্রটি তৈরী হলো।

M ৮৭-র মধ্যে জ্যোতির্বিদরা বিশেষ কয়েকটি কম্পন সংখ্যার আলোর অনুপস্থিতির সন্ধান করতে লাগলেন। যদি নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে আসা আলো রামধনুর মত বর্ণালীতে ভেঙে ফেলি তাহলে তার একধারে লাল ও অন্যধারে নীল হবে। তখন বর্ণালীর অংশ জুড়ে বিশেষ বিশেষ স্থানে কালো বা উজ্জ্বল আলোকরেখা দেখতে পাব। রেডিওর ডায়ালে যেমন ভাবে স্টেশন রেখা দিয়ে নির্দেশিতও থাকে এও অনেকটা সেই রকম। নক্ষত্রদের মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পরমাণু আছে তাদের মধ্যে বিশেষ একটি পরমাণুই কেবল এ ধরণের কম্পন সংখ্যার আলো ছাড়তে পারে বা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু M ৮৭-র কেন্দ্রের চারিপাশে নক্ষত্রদের দ্রুত ঘূর্ণায়মাণ অবস্থার দরুণ উপরোক্ত আলোকরেখাদের কম্পন সংখ্যা পাল্টে যায়। ক্যালিফোর্ণিয়া ইনসটিটিউট অব টেকনোলজির বিজ্ঞানীরা সমগ্র গ্যালাক্সির একটি চিত্ররূপ খাড়া করার চেষ্টা করেন। M ৮৭ এর মাঝের অংশে যে নক্ষত্রগুলি আছে তারা প্রায় সেকেন্ডে ২৫০ মাইল গতিবেগ নিয়ে ঘুরছে। এ ধরণের গতিবেগকে বজায় রাখতে গেলে গ্যালাক্সির মাঝখানের অংশের ভর সূর্যের ভরের চেয়ে ৫০০ গুণ বেশী হওয়া দরকার। যদি গ্যালাক্সির মাঝখানের ভর এত বেশী হতে হয় তবে তার মাঝখানে বিরাট সংখ্যক নক্ষত্র থাকতে হবে এবং এর ফলে গ্যালাক্সির অন্তরস্থল খুবই উজ্জ্বল হবে। যদি ধূলিকণা দৃষ্টিপথ ব্যহত না করে তবে আশা করা যায় ঐ আলো সূর্যাস্তের আলোর মত রক্তিমাভ হবে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা M ৮৭ গ্যালাক্সির অন্তরস্থলে উজ্জ্বল তারকা সমষ্টির বা বিচ্ছুরিত রক্তিমাভা দেখতে পেলেন না। তার পরিবর্তে তাঁরা সেখানে একরকমের নিষ্প্রভ নীল আলো দেখতে পেলেন। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে M ৮৭-র অন্তরস্থলে একটি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব ধরে নেওয়া না হলে পরীক্ষালব্ধ ফল অন্তরস্থলের নির্গত ভরের পরিমাপকে প্রতিষ্ঠা করে না।

M ৮৭ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেল তার মাঝের অংশের ভর এমন একটি জায়গা জুড়ে আছে যে জায়গার ব্যাস হলো ৭০০ আলোকবর্ষ। এই অংশের

মধ্যে লক্ষকোটি তারা দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বর তত্ত্বটি যদি ঠিক হয় তাহলে সমগ্র ভর প্রকৃত পক্ষে এমন একটি গোলকের মধ্যে থাকতে হবে যার ব্যাস প্রায় মাত্র এক আলোকদিন হবে। ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে ২০০ ইঞ্চি টেলিস্কোপের সাহায্যে M ৮৭-কে আরো সামনের থেকে দেখা হল বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে বেতার টেলিস্কোপের সাহায্যে। M ৮৭-র কেন্দ্রস্থলের ভরকে আরও সূক্ষ্মভাবে দেখার চেষ্টা হলো। এইভাবে আইনস্টাইনের তত্ত্ব আধুনিক গবেষণাকে উজ্জীবিত ও পরিচালিত করতে থাকল।

যদি কেউ M ৮৭-তে বা বিস্ফোরণশীল কোনো বস্তুতে শক্তির উৎস খুঁজে পাবার চেষ্টা করে তাহলে তার কাছে হাত দিয়ে গণণা করার মত একটি মহাজাগতিক নিয়ম আছে। আইনস্টাইন ভর ও শক্তির মধ্যে যে সম্পর্কটি খুঁজে পেয়েছিলেন তার ব্যবহার করে ভরের সমষ্টি থেকে যতখানি শক্তি পাওয়া যাবে তা পরিমাপ করা যাবে। তাঁর দেওয়া গাণিতিক সূত্রটি হল $E=mc^2$ (E=শক্তি, m=ভর, c=আলোর গতিবেগ)। এই সূত্রটি তাঁর আবিষ্কারের বিরাশী বছর পরেও একইরকম ভাবে আশ্চর্যজনক ও ভীতিপ্রদ।

১। উচ্চগতিতে বস্তুর আপাত শক্তির পরিবর্তন ঘটে।

২। একটি আলোকোজ্জ্বল বস্তু গতিশক্তি ছেড়ে দেয়।

৩। আইনস্টাইনের মতে আলো ভারী বস্তু।

৪। ভর ও শক্তি সমপর্যায়ভুক্ত।

৫। বস্তু প্রকৃত পক্ষে জমাটবাঁধা শক্তি।

কোন একটি জিনিষকে দু'জন পর্যবেক্ষক দু রকমভাবে দেখতে পারে। এই দুই পর্যবেক্ষকের মধ্যে যে সম্পর্কটি আছে তা বার করার কৌশল আপেক্ষিকতাবাদ পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যায় সম্প্রসারিত করেছে। সামাজিক ব্যাপারে প্রত্যেক লোক তার কাজকর্ম অপরের কাছে কিভাবে প্রতিভাত হচ্ছে সে সম্বন্ধে খুবই সচেতন। একাজে মস্তিষ্কের বেশ বড় অংশই নিয়োজিত থাকে। মানুষ তার ব্যাক্তিসত্ত্বা সম্বন্ধে সজাগ। অন্য কিছু সম্বন্ধে তার অনুভূতি তাকে সব সময় পথদুর্ঘটনা বা অন্যলোকের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে সাহায্য করে। বস্তু ও শক্তির জগতেও আমরা অনুরূপ প্রশ্ন তুলতে পারি। একটি তারার নিকট-বর্তী কোন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে সূর্য কিরূপে প্রতিভাত হবে? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হলো সূর্যকে তখন একটি অতি সাধারণ নক্ষত্র মনে হবে। আরও চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটবে যদি ঐ বিদেশী জ্যোতির্বিদ্ উচ্চগতিতে সূর্যের দিকে ধাবিত হন। পৃথিবীর দিকে ধাবমান কোন একজন পদার্থবিদের কাছে মনে হবে যেন সাদা সূর্য ডপলার প্রক্রিয়ার (Doppler effect) দরুণ নীলাভ হয়ে যাচ্ছে।

সামাজিক জীবন এবং জড়বস্তু জগতের মধ্যে একটি তফাৎ আছে। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীরা কে তাদের দেখছে তার ওপর নির্ভর করে তাঁরা তাদের অভিব্যাক্তি বা ক্রিয়াপদ্ধতি পরিবর্তন করে। জড়বস্তুর কিন্তু এ ধরণের কোন ক্ষমতা নেই। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি যদি না বিশেষ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহলে বলা যেতে পারে যে ভৌত জগৎ পর্যবেক্ষণের ফলে, কোন ভাবে পরিবর্তিত হবে না। কিন্তু কিভাবে যে পর্যবেক্ষকের কাছে প্রতিভাত হবে তা নির্ভর করে পর্যবেক্ষকের ওপর।

যদি কোন মহাকাশচারী উচ্চগতিতে পৃথিবীর পাশ দিয়ে উড়ে যায় তবে তার মনে হবে পৃথিবী বিপরীত দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছে এবং সে নিজে স্থির

অবস্থায় আছে। তার বিচারে পৃথিবীর প্রচণ্ড গতিশক্তি থাকবে। মহাকাশচারীর যে বন্ধু পৃথিবীতে আছে তার কাছে কিন্তু ওপরের ব্যাপারগুলো অযৌক্তিক মনে হবে। তাহলে পৃথিবীর প্রচন্ড গতিশক্তি আছে অপর দিকে পৃথিবীর কোন গতিশক্তি নেই এই দুটো বক্তব্যই একযোগে সত্য। মহাকাশচারীর বক্তব্য এবং পৃথিবীতে অবস্থিত বিজ্ঞ জনের মতবাদ সমভাবে সংগত।

যখন বিশ্বের বর্ণনার মধ্যে বৈষম্য দেখা দেয়, তখন একটি বিপত্তির উৎপত্তি হতে পারে। এরকম ধারণা হতে পারে যে বস্তু ও শক্তি নিয়ে পদার্থবিজ্ঞানে যে সমস্ত নিয়মগুলি আছে, বিভিন্ন গতিতে চলমান লোকদের কাছে তারা ভিন্ন ভিন্ন মনে হবে। একজন নভোচারী পৃথিবীর ধর্মগুলি ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করতে শুরু করবে। কোন ব্যক্তিবিশেষের বিশেষ কোন চিন্তাধারার বা দৃষ্টিকোণ পৃথিবীর চরিত্রকে পালটাতে পারে না। নভোচারীর মতামত যাই হোক্ না কেন পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে সুস্থিতভাবে ঘুরে চলবে। পদার্থবিজ্ঞানের ধ্যানধারণা পালটাতে পারে কিন্তু বাস্তব জগৎ তার নিয়ম থেকে বিচ্যুত হবে না। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলো এমনভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারা উচিত যাতে তাদের সাহায্যে যেসব ভবিষ্যৎবাণী করা হবে তারা যেন পদার্থবিদের গতি অবস্থার (state of motion) ওপর নির্ভর না করে। এককভাবে যে যা দেখছে তা ঠিক হলেও প্রতিটি দ্রষ্টব্য বিষয়ের মূল বিষয়গুলির সম্বন্ধে সকলের একমত হওয়া উচিত।

ওপরের কথাগুলিই ছিল আলবার্ট আইনস্টাইনের গবেষণার মূল বিষয়। তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে গিয়ে তাঁকে বাধ্য হয়েই সময় সম্বন্ধে সাধারণ ধারণার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। কিন্তু তার সকল আবিষ্কারের মধ্যে $E=mc^2$ সমীকরণটির মধ্যে মনকে বিব্রত করার মত বহু ধারণা তির্যকভাবে আত্মগোপন করে আছে। আইনস্টাইনকে বুঝতে গেলে ডপলার প্রক্রিয়ার (যা আলোর রঙকে পরিবর্তিত করে দেয়) চেয়ে বেশী কিছু জানতে হবে।

সমুদ্র যাত্রায় জাহাজের সম্মুখগতি সম্বন্ধে উদাসীনতা নিউটন যুগের প্রচলিত প্রথা। কিন্তু ভ্রমণের চমকপ্রদ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে দৃঢ়মূল ধারণা জন্ম নিলো রেলওয়ে ট্রেন চালু হবার পর। ট্রেনের যাত্রীরা এটা অনুভব করল ট্রেনটি নির্দিষ্ট একটি গতি প্রাপ্ত হবার পর (এমন কি ঘণ্টায় ষাট মাইলের মত উচ্চগতি) সামান্য ঝাঁকুনি ছাড়া সামনের দিকে কোন গতি তারা বুঝতে পারে না। একটি স্টেশনে কোন যাত্রীর পক্ষে যে ট্রেনে সে বসে আছে সে ট্রেনটি চলছে না পাশের রেললাইনে দাঁড়ানো ট্রেনটি চলেছে সে ব্যাপারে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে দ্বিধায় পড়তে হয়। এখানেই আত্মগোপন করে আছে আপেক্ষিকতাবাদের নিয়মগুলির মূলমন্ত্র। এটি হলো একটি সরলরেখায় সুসমগতিকে স্থির অবস্থার থেকে আলাদা করা যায় না।

যখন দুটি বস্তু A এবং B সুসম গতিবেগ নিয়ে পরস্পরের পাশ দিয়ে যায় তখন A B-র পাশ দিয়ে যাচ্ছে বলা যায় কিংবা বলা যায় B A-র পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

আরও সূক্ষ্মভাবে, যখন মানুষ চলমান ট্রেনের শব্দ বা ট্রেনের বাঁশি শুনতে পায় তখন গতির সঙ্গে সঙ্গে সে শব্দের তীক্ষ্নতা পরিবর্তিত হয়ে যায়। যখন শব্দ সৃষ্টিকারী বস্তুটি এগিয়ে আসে তখন তীক্ষ্নতা বাড়ে আর যখন শব্দসৃষ্টিকারী বস্তুটি দূরে সরে যায় তখন তীক্ষ্নতা কমে যায়। আমাদের মত সাধারণ মানুষ এধরণের একটা ঘটনা ঘটতে দেখলে তাদের এমন কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেব। কিন্তু পদার্থবিদ্ ডপলারের কাছে এর তাৎপর্য অনেকখানি। এধরণের ঘটনার পুঙখানুপুঙখ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে ঘটনা শব্দ তরঙ্গের বেলাতে ঘটে আলোকতরঙ্গের বেলাতেও অনুরূপ ঘটনাই ঘটে থাকে। শব্দের তীক্ষ্নতা বা আলোর কম্পন সংখ্যা পরিবর্তনের পরিমাণের পরিমাপ জেনে সামনের দিকে এগিয়ে আসা বা দূরে সরে যাওয়া বস্তুর গতিবেগ বার করা সম্ভব। উচ্চগতিতে চলমান নক্ষত্রদের বেলাতেও ডপলারের সিদ্ধান্ত সমানভাবে প্রযোজ্য। এই আবিষ্কার ডপলারকে অমরত্ব দান করেছে।

১৮৪২ সালে ডপলার এফেক্ট আবিষ্কৃত হয়। আজকাল ডপলার এফেক্টের বহু ধরণের ব্যবহার। উচ্চগতি ধরার কাজে, ডাকাতি হয়েছে কিনা বোঝানোর কাজে এই এফেক্টের ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতীব্র তাপীয় গতির ফলে এটম থেকে বেরিয়ে আসা একটি আলোর রেখার সরণ ঘটে যাকে আমরা ডপলার সরণ বলে থাকি। এই ডপলার সরণ পরিমাপ করে আমরা তাপমাত্রা মাপতে পারি। ডপলার এফেক্টের দরুণ আলোর কম্পন সংখ্যা পরিবর্তিত হয় বলেই আমরা বুঝতে পারি যে দূরবর্ত্তী গ্যালাক্সি বা কোয়াসাররা আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আইনস্টাইনের জন্মের প্রায় পঁচিশ বছর আগে ডপলারের মৃত্যু হলেও তিনি আপেক্ষিকগতি পরিমাপ করার একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপায় বের করেছিলেন।

ডপলার এফেক্টের কারণটি খুবই সরল। একজন দর্শক ট্রেনের বাঁশির আওয়াজ শুনতে পায় তার কারণ হলো চাপের ফলে সৃষ্ট একটি কম্পন সংখ্যা বিশিষ্ট তরঙ্গ সুসম গতিতে বাঁশি থেকে তার কানে এসে পেঁছায়। যদি একটি ট্রেন দর্শকদের দিকে এগুতে থাকে তাহলে কিন্তু শব্দের গতিবেগের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না কিন্তু প্রত্যেকটি তরঙ্গকে কানে পেঁছুতে তার আগের তরঙ্গের চেয়ে কম দূরত্ব যেতে হবে। এর ফলে তরঙ্গগুলি ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট হবে এবং ট্রেনটি স্থির থাকলে প্রতি সেকেন্ডে যে তরঙ্গগুলি এসে পেঁছুত তার চেয়ে বেশী হারে এসে পেঁছবে। এর ফলে কম্পন সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং শব্দের তীক্ষ্নতা বেড়ে যাবে। যখন ট্রেনটি দর্শকের থেকে দূরে সরে যাবে তখন প্রতিটি তরঙ্গকে

ক্রমান্বয়ে তার আগের চেয়ে বেশী দূরত্ব যেতে হবে। এরফলে তরঙ্গগুলি ছড়িয়ে পড়ে ও কম্পন সংখ্যা কমে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে শব্দের তীক্ষ্ণতা কমে যায়।

এই ধরণের এফেক্ট বা ক্রিয়া আলোর বেলাতেও দেখা যায়। যেমন বিভিন্ন তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট শব্দের কম্পন সংখ্যা ভিন্ন সেইরকম বিভিন্ন কম্পন সংখ্যার আলোও ভিন্ন ভিন্ন। আলো শব্দের চেয়ে অনেক বেশী দ্রুতগতিতে চলে। আলোর গতির সঙ্গে তুলনা করলে দ্রুততম গতিসম্পন্ন ট্রেনকেও স্থির বলে মনে হবে। তাই একটি ট্রেনের গতির সঙ্গে সঙ্গে রঙের পরিবর্তন দর্শকের কাছে সহজে ধরা পড়বে না। কিন্তু নক্ষত্রদের বেলাতে এধরণের রঙের পরিবর্তন সহজে ধরা যাবে।

একটি প্রিজমের মাঝ দিয়ে সাদা আলো সাতটি রামধনুর রঙে ভেঙ্গে যায়। রঙগুলি হলো যথাক্রমে লাল, কমলা, হলুদ, নীল এবং শেষে বেগুণী। নীল আলোর কম্পন সংখ্যা লাল আলোর কম্পন সংখ্যার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন আলোকময় বস্তু যদি কারুর দিকে এগোতে থাকে তবে তার কাছে মনে হবে যেন আলোর কম্পন সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। কম্পন সংখ্যা বাড়ার জন্য বস্তুটি নীল বলে প্রতীয়মান হবে। পদার্থবিদরা ও জ্যোতির্বিদরা এই প্রক্রিয়াটির নাম দিয়েছেন ব্লু-শিফট্। অপরদিকে যে আলোকময় বস্তু দূরে সরে যাচ্ছে তখন সেই সরে যাওয়া আলোকময় বস্তুটি লাল দেখাবে। নীল বা লাল শব্দদুটি খুবই সাবধানে ব্যবহার করা দরকার কারণ যদি উৎস ও দর্শকের মধ্যে আপেক্ষিক গতি খুব বেশী না হয় তবে এ ধরণের রঙের পরিবর্তন খালি চোখে দেখা যাবে না।

ডপলার এফেক্ট ও মাধ্যাকর্ষণের জন্য আলোর রঙের পরিবর্তন বা অন্যান্য বিকিরণের কম্পন সংখ্যার অনুরূপ পরিবর্তনের কথা এই বইটিতে বারে বারে উল্লিখিত হবে। দৈনন্দিন জীবনে সাধারণভাবে লাল রঙকে গরম এবং নীল রঙকে শীতল রঙ বলে বলা হয়। পদার্থবিদের কাছে ব্যাপারটি একেবারে উলটো। নীল আলোর কম্পন সংখ্যা বেশী। এর ফলে এর শক্তিও বেশী যা বেশী তাপমাত্রাতেই সম্ভব। লালের কম্পন সংখ্যা কম। ফলে এর শক্তিও কম এবং মোটামুটি শীতল অবস্থা নির্দ্দেশ করে। কোন বস্তু গরমে লাল হয়েছে বললে যে তাপমাত্রা বোঝায় বস্তুটি গরমে নীল বললে বেশী তাপমাত্রা বোঝায়। আরও ব্যাপক ভাবে বলতে গেলে রেড শিফট বলতে সংক্ষেপে কম্পন সংখ্যা তথা শক্তি কমা বোঝায়; অপরদিকে ব্লু-শিফট্ মানে হলো কম্পন সংখ্যার বৃদ্ধি।

ডপলার এফেক্টের প্রকৃত মূল্যায়ণ আইনস্টাইনের কাছে খুব প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। তিনি দেখলেন আলোর ব্যবহার একেবারে শব্দের মতন নয়। শব্দ তরঙ্গ, প্রবাহিত হতে গেলে সব সময় বাতাসের মতন একটি মাধ্যমের প্রয়োজন

হয়। শব্দের ক্ষেত্রে ডপলার এফেক্টের পরিমাণ নির্ভর করে শব্দের উৎস শ্রোতার দিকে যাচ্ছে কিনা বা শ্রোতা শব্দের উৎসের দিকে যাচ্ছে কিনা তার ওপর। উনবিংশ শতাব্দিতে এমন একটি ভুল ধারণা প্রচলিত ছিল যে আলোক তরঙ্গ ইথার নামে এক ধরণের মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ডপলারের সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে আলোর ক্ষেত্রেও ডপলার এফেক্টের পরিমাণ নির্ভর করে আলোর উৎস (যেমন একটি নক্ষত্র) দর্শকের এগুচ্ছে না দর্শক আলোর উৎসের দিকে যাচ্ছে তার ওপর।

আইনস্টাইনের বিশ্ব কিন্তু গণতান্ত্রিক। কোন রকম তফাৎ সেখানে চলে না। এখানে যে জিনিষটি সবচেয়ে প্রয়োজনীয় তাহলো নক্ষত্র এবং দর্শকের মধ্যেকার আপেক্ষিক গতি। সংশোধনটি খুব ছোট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের কারণ হলো নীল আলো লাল আলোর চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং রঙের পরিবর্তন মানেই হলো শক্তির পরিবর্তন এবং সমগ্র বিশ্বই শক্তির দ্বারা চালিত।

পদার্থবিজ্ঞানে শক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা কিন্তু সাধারণ মানুষ শক্তি বলে যা বোঝায় তার থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়। একজন শক্তিশালী লোক কঠিন পরিশ্রম করতে পারে—নানা কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারে। অনেক সময়ে একটি দেশে শক্তির অভাব ঘটে—কি ভাবে কলকারখানা চালানো যায় বা বাড়ী গরম রাখা যায় সেই চিন্তাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। একজন পদার্থবিদের কাছে শক্তির অর্থ হলো জগতে কোন কিছুর মধ্যে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা। কোন একটি বস্তুকে চালিত করা (গতি শক্তি), কোন বস্তুকে গরম করা (তাপশক্তি) গাছপালা বৃদ্ধি (রাসায়ণিক শক্তি) এধরণের পরিবর্তনের উদাহরণ। যতই শক্তির পরিমাণ বেশী হবে ততই পরিবর্তনগুলিও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এক ধরণের শক্তিকে অন্য একটি রূপে রূপান্তরিত করা যায়। একটি গাড়ীতে ইঞ্জিন জ্বালানীর রাসায়নিক শক্তিকে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করে। এই তাপশক্তি সিলিন্ডারের মধ্যে রাখা গ্যাসের চাপ বাড়িয়ে পিস্টনকে চালিত করে এবং আমরা গতিশক্তি লাভ করি। প্রকৃতি শক্তি সম্পর্কে পুঙখানুপুঙখভাবে হিসাব রাখে। প্রকৃতিতে মোট শক্তির পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে না। বড়জোর রকমফের ঘটতে পারে।

আইনস্টাইন এ সমস্ত জানতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ডপলার আলোর এফেক্টের ওপরে তাঁর সংশোধন যা কম্পন, সংখ্যার তথা শক্তির খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটাবে তা বিশ্বকে নাড়িয়ে দিতে পারে। এমন একটি ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য তিনি বিশ্বের মধ্যে এমন একটি শক্তির উৎসের কথা বললেন যার কথা সেই আমলের বিজ্ঞানীদের চিন্তার বাইরে ছিল।

ঠিক মত রেডশিফ্‌ট বা ব্লু শিফ্‌ট নির্ণয় করার জন্য আইনস্টাইন যে-সমস্ত ফরমুলা আবিষ্কার করেছিলেন তারা খুব একটা দুর্বোধ্য নয়। তবে চেষ্টা করলে গাণিতিক ফরমুলা বাদ দিয়েও বিষয়গুলো বোঝা যেতে পারে। একটি নক্ষত্র যদি দর্শকের থেকে আলোর গতিবেগ নিয়ে দূরে সরে যায় তবে তার থেকে বেরিয়ে আসা আলোর রেড শিফটের পরিমাণ হবে সর্বোচ্চ। তখন আলোক তরঙ্গগুলি বড় বড় হয়ে যাবে আর এতে কম্পন সংখ্যা এবং শক্তির পরিমাণও কমে যাবে। অপর দিকে যদি নক্ষত্রটি আলোর গতিবেগ নিয়ে দর্শকের দিকে এগিয়ে আসে তাহলে আলোর ব্লু শিফটের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী হবে। এক্ষেত্রে তরঙ্গগুলি একটি আরেকটির ওপরে এসে পড়বে। তাদের কম্পনসংখ্যা ও শক্তি বেড়ে যাবে। নক্ষত্রটি দর্শকের কাছে পেঁছুবার আগেই তীব্র রশ্মিতে দর্শক ভস্মীভূত হয়ে যাবে।

শক্তির দিক থেকে দেখলে ডপলার এফেক্ট খুব সুসম নয়। যদি একটি নক্ষত্র আলোর গতিবেগ নিয়ে দর্শকের থেকে দূরে সরে যায় তাহলে দর্শকের কি ক্ষতি? বিশ্বের অসংখ্য তারাদের মধ্যে একটির আলো হয়ত তার দৃষ্টির সামনে থেকে সরে যাবে। কিন্তু যদি একটি আলোর গতিবেগ নিয়ে সামনে এগিয়ে আসে তবে তা এত উজ্জ্বল হয়ে উঠবে যা অসংখ্য তারার সম্মিলিত ঔজ্জ্বল্যের চেয়ে বেশী। ব্লু শিফটের বেলায় উৎপন্ন শক্তি রেড শিফটের শক্তি ক্ষয়ের চেয়ে অনেক বেশী।

তুলনামূলক কম গতির বেলাতেও ডপলার এফেক্ট থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে আলোর এক দশমাংশ গতিবেগ নিয়ে কোন নক্ষত্র এগিয়ে এলে তার শক্তি শতকরা ১০.৫৫ ভাগ বাড়বে অপর দিকে নক্ষত্রটি সরে যেতে থাকলে শতকরা ৯.৫৫ ভাগ শক্তি হারাবে। একটি লোকের পাশ দিয়ে আলোর এক দশমাংশ গতিবেগে নিয়ে একটি নক্ষত্র যদি দ্রুত চলে যায় বা একটি লোক যদি ঐ গতিবেগ নিয়ে একটি স্থির নক্ষত্রের পাশ দিয়ে যায় তাহলে তার মনে হবে নক্ষত্রটি ০.৫ ভাগ শক্তি নির্গত করছে।

এই ব্যাপারটি বেশ কৌতূকজনক। এর মানে দাঁড়াবে একটি নক্ষত্র (বা কোন আলোর উৎস) থেকে নির্গত শক্তির পরিমাণ যে নক্ষত্রটিকে দেখছে এবং নক্ষত্রের সাপেক্ষে গতিবেগ নিয়ে চলছে তার ওপর নির্ভর করবে। এই কথাগুলোই আমাদের সেইখানে নিয়ে যায় যেখানে আইনস্টাইন সমেত সকল পদার্থবিদরা বিশ্বাস করেন যে এককভাবে এটা আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি। এই গুরুত্বপূর্ণ ফলটি হলো ভরশক্তির সমতুল্যতা।

Ann der-Physik নামক একটি জার্নালে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইন একটি ছোট নিবন্ধ প্রকাশ করেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল মোটামুটিভাবে এই রকম : কোন বস্তুর জাড্যতা কি তার শক্তির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে? এই নিবন্ধেই

ভর শক্তি সমতুল্যতার সম্বন্ধে আইনস্টাইনের নিজস্ব চিন্তা ভাবনার প্রকাশ ঘটেছিল। তিনি ধারণা করতে চেষ্টা করলেন যে অতি উচ্চ গতিবেগ নিয়ে চলমান একটি দর্শকের কাছে একটি আলোর উৎস কি রূপ নিয়ে প্রতিভাত হবে।

একটি স্বাভাবিক ও সুবিধাজনক জায়গা থেকে দেখলে মনে হয় সূর্য সকল দিকে সমপরিমাণ আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। এখন ধরা যাক একজন নভোচারী খুব উচ্চগতি নিয়ে সূর্যের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। তার কাছে মনে হবে ডপলার এফেক্টের দরুণ আলোর কম্পন সংখ্যা পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সূর্যের কাছে গেলে তাকে নীলাভ এবং দূরে সরে এলে লাল দেখাবে। কিন্তু আগেই লক্ষ্য করা হয়েছে এক্ষেত্রে শক্তির ব্যাপারে একটা বৈষম্য দেখা দেবে। যদি নভোচারী নীল ও লাল আলোর শক্তির গড় নিয়ে সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা শক্তির হিসাব করেন তবে তা তিনি স্থির অবস্থায় ও সূর্যকে তার ডপলার এফেক্ট বিহীন প্রকৃত রঙে দেখলে যে শক্তির পরিমাপ করতেন তার থেকে ভিন্ন হবে। উচ্চ গতি সম্পন্ন নভোচারীর বিচারে সূর্য অনেক বেশী শক্তি ছড়াচ্ছে যা কিন্তু পৃথিবীতে স্থির কোন নভোচারীর কাছে মনে হবে না। এক্ষেত্রে দ্রুতগতি সম্পন্ন নভোচারী যা দেখছে আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গীতে তা খুবই যুক্তিসঙ্গত।

সূর্য যদি দ্রুতহারে শক্তি ছেড়ে দেয় তাহলে এই বেশী পরিমাণ শক্তি আসবে কোথা থেকে? সূর্য নভোচারীর সাপেক্ষে খুব দ্রুত বেগে ছুটে যাচ্ছে। ওই গতিই শক্তির উৎস হতে পারে। একটি গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তি ছেড়ে দেবার সহজতম উপায় হলো ধীরে ধীরে গতিশক্তি হারিয়ে ফেলা। কিন্তু নভোচারীর গতিবেগ সুসম। সুতরাং সূর্য তার স্বাভাবিক জায়গা থেকে বিচ্যুত না হয়ে নভোচারীর সাপেক্ষে গতিবেগ পরিবর্তন করতে পারে না। আমরা যদি তারাদের দিকে কেবল তাকিয়েই তাদের স্থানচ্যুত করতে পারতাম তাহলে এই বিশ্ব বিশৃঙ্খলায় ভরে যেত।

একটি গতিশীল বস্তু অন্যভাবেও তার শক্তি ছাড়তে পারে। এটা হলো তার ভর কমিয়ে। সূর্যের শক্তি ও তার ভর নভোচারীর সাপেক্ষে আপেক্ষিক গতিবেগের ওপর নির্ভর করে। সুতরাং আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সূর্য নিশ্চয় তার ভর হারাচ্ছে। ওপরের কথাগুলো পুনরায় আলোচনা করলে দাঁড়ায়ঃ দ্রুতগতি নভোচারী সাপেক্ষে সূর্যের গতি তার শক্তিক্ষরণের আপাত পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। আপাত গতিশক্তির জন্য সূর্য থেকে অতিরিক্ত আলো সরবরাহ করতে হবে। সূর্যের আপাত গতি পরিবর্তিত হতে পারে না। সুতরাং সূর্যের ভরেরই পরিবর্তন ঘটে। সংক্ষেপে বলতে গেলে নভোচারীর অভিজ্ঞতাকে যথার্থ প্রমাণ করে অতিরিক্ত আলো সরবরাহ করতে গেলে সূর্যকে তার ভর হারাতে হবে।

ওপরের কথাগুলো দিয়ে এটাই বলতে চাওয়া হয়েছে যে সূর্য থেকে সবরকম আলো বেরিয়ে আসার ফলে তার ভর কমে যাচ্ছে। নভোচারী যখন সূর্যের সাপেক্ষে ক্রমশ স্থির হয়ে আসছে তার সাপেক্ষেও ওপরের কথাগুলো সত্য। আইনস্টাইনের কাছে ওপরের কথাগুলো প্রমাণ করার জন্য সামান্য কিছু অংক করার প্রয়োজন। আমাদের বোঝার জন্য এই কথাটাই যথেষ্ট যে প্রকৃত আলো বা অতিরিক্ত আলো এ দুটি জিনিষের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। এই আলো এবং অতিরিক্ত আলো বিকিরণের জন্য সূর্যকে তার ভর হারাতে হবে। শক্তির পরিমাণের হিসাবকে সঠিক রাখতে গিয়ে যে পরিমাণ শক্তি সূর্য ছড়াবে তার সমানুপাতিক হারে ভরও হারাবে। প্রকৃতপক্ষে সূর্যের ঔজ্জ্বল্য পরিমাপ করে জ্যোতির্বিদেরা আইনস্টাইনের তত্ত্বের সাহায্যে গণণা করে দেখেছেন যে, আমাদের মাতৃ নক্ষত্র প্রতি সেকেণ্ডে চার মিলিয়ন টন ভর হারাচ্ছে। এই ক্ষয়প্রাপ্ত ভর কিন্তু বিশ্ব থেকে হারিয়ে যাচ্ছে না, সূর্য যে বিকিরণ ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদেরও একটা ভর আছে।

এইবারই এলো আইনস্টাইনের প্রতিভাদীপ্ত হস্তক্ষেপ। সঠিকভাবে বলতে গেলে তাঁর সকল মতবাদ এইটাই প্রমাণ করে যে আলোর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভর আছে—এটি একটি প্রয়োজনীয় কিন্তু একেবারে আশ্চর্যজনক সিদ্ধান্ত নয়। আগে আলোকে বিশুদ্ধ একটি শক্তি হিসাবেই ভাবা হত এবং আইনস্টাইনের বক্তব্য অনুযায়ী অন্যান্য শক্তির ক্ষেত্রেও তাঁর ধারণা সমভাবে প্রযোজ্য। এ ধরণের শক্তির মধ্যে আছে গতিশক্তি, তাপশক্তি রাসায়নিক শক্তি প্রভৃতি। উপরন্তু তিনি মনে মনে বুঝতে পারলেন যে, যদি শক্তির মধ্যে ভরের অবস্থান থাকে তাহলে ভরকেও শক্তি হিসাবে দেখতে হবে। সেক্ষেত্রে সাধারণ সকল বস্তু জমাটবাঁধা শক্তিমাত্র। ১৯০৫ সালে তিনি লিখলেন : "কোন বস্তু থেকে শক্তি বেরিয়ে আসা ও তা বিকিরণ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবার ব্যাপারটির মধ্যে দৃশ্যতঃ কোন তারতম্য নেই।" তাই আমরা আরও বৃহৎ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কোন বস্তুর ভরই তার শক্তি সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্দেশ করে। ......যে সমস্ত বস্তুর শক্তি সঞ্চয় বেশী পরিবর্তিত হয় (যেমন তেজস্ক্রিয় রেডিয়াম লবণ) তাদের ক্ষেত্রে তত্ত্বটিকে যাচাই করে নেওয়া খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার না।

পুরাতন পদার্থবিজ্ঞানে এই শক্তির উৎস সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যেত না। আইনস্টাইনই সর্বপ্রথম এই শক্তির উৎসের সন্ধান দিলেন। যদি সাধারণ বস্তু জমাট বাঁধা শক্তি হয় তাহলে নীতিগত ভাবে অন্ততঃ তাদের বিরাট শক্তির উৎস আছে যার থেকে শক্তি আহরণ করা যেতে পারে। রেডিয়াম লবণের তেজস্ক্রিয়তা বজায় রাখতে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সাহায্যে সামান্য পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়।

আইনস্টাইনের $E = mc^2$ ফরমুলাটি ভর ও শক্তির সমতুল্যতা প্রকাশ করে। এর মধ্যে E হলো শক্তি, m হলো ভর, c^2 আলোর গতিবেগের বর্গ। ভর ও শক্তির পদার্থবিদেরা যে প্রচলিত সম্পর্ক তৈরী করেছেন তাকে বজায় রাখতেই c^2 এর ব্যবহার। আমরা $E = m$ লিখে এককে সুবিধামত পরিবর্তিত করে নিতে পারি। c^2 কিন্তু একেবারে তাচ্ছিল্য করার মত নয়। প্রচলিত মান অনুযায়ী এটি খুবই বড়। এর উপস্থিতি আমাদের এই কথাই বলে যে সামান্য একটু ভরের মধ্যেও বিপুল পরিমাণ শক্তি আত্মগোপন করে আছে। এই ছোট একটি ফরমুলার মধ্যে বিশ্বের বহু ক্রিয়া ও সৃষ্টির রহস্য নিহিত আছে।

১। সব বস্তুর প্রচণ্ড স্থির শক্তি আছে।
২। সূর্য স্থির শক্তির সামান্য ছেড়ে দেয়।
৩। নিউক্লিয়ার বোমা, রিয়াকটর পৃথিবীতে অনুরূপ শক্তি নির্গত করে।
৪। ত্বরণ যন্ত্রে নিয়মমাফিক নতুন বস্তু তৈরী হয়।
৫। স্থির শক্তি বস্তু সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তি।

শক্তি সম্বন্ধে আইনস্টাইনের যে চিন্তাধারা তার সোজাসুজি ও সঠিক প্রতিষ্ঠা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আসেনি। তিনি তাঁর ভরশক্তির সমতুল্যতার সূত্রটি প্রস্তাব করেন ১৯০৫ সালে যখন তাঁর বয়স ছাব্বিশ বছর মাত্র। এর কয়েক বছর পরেই রাদারফোর্ড আবিষ্কার করেন যে পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে ভারী কেন্দ্রীন অবস্থান করে। এর পরে পদার্থ বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন পরমাণুর ওজন বার করার পদ্ধতি নিয়ে ও পরমাণুকে ভেঙে ফেলার জন্য ত্বরণ যন্ত্র আবিষ্কারের কাজে। ১৯৩২ সালে ককরোফ্ট ন্যামে একজন তরুণ বিজ্ঞানী একদিন কেমব্রিজে তাঁর সহযোগীদের জানালেন যে তিনি পরমাণু বিদারণ করতে সমর্থ হয়েছেন।

ককরোফ্ট ও ওয়ালটন পারমাণবিক কণাদের জন্য একটি তড়িৎ ত্বরণ যন্ত্র তৈরী করেন। এই ত্বরণ যন্ত্রে হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন বা প্রোটন দিয়ে লিথিয়াম ধাতুকে আঘাত করা হত। লিথিয়াম কেন্দ্রীনকে প্রোটন দিয়ে আঘাত করলে সেই প্রোটন-লিথিয়াম কেন্দ্রীনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এই কেন্দ্রীন দুটো নতুন হিলিয়াম কেন্দ্রীনে ভেঙে যায়। দুটো হিলিয়াম কেন্দ্রীনের ভর একসঙ্গে যোগ করলে একটি প্রোটনের ও লিথিয়াম কেন্দ্রীনের মিলিত ভরের চেয়ে সামান্য কম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় কিছু পরিমাণ ভর অন্তর্হিত হচ্ছে।

লক্ষ্যবস্তু থেকে বেরিয়ে আসা ও বিপরীতমুখী দুটি হিলিয়াম কেন্দ্রীনকে বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। টেলিভিসনের পর্দার মত প্রতিপ্রভার সৃষ্টি করে এমন বস্তু দিয়ে তৈরী পর্দার ওপরে হিলিয়াম কেন্দ্রীন আঘাত করলে আলোকরশ্মি বেরিয়ে আসে। হিলিয়াম কেন্দ্রীন বাতাসের মধ্য দিয়ে কতদূর যেতে পারে তা নির্ণয় করে ককরোফ্ট ও ওয়ালটন তাদের গতিশক্তি নির্ণয় করেছিলেন। দেখা গেল এই শক্তি অন্তর্হিত ভরের সমতুল শক্তির সঙ্গে ($E=mc^2$) খুব ভালভাবেই মিলে যাচ্ছে।

লোকে বলতে পারে যে কিছু পরিমাণ ভর লুপ্ত হয়ে তা হিলিয়াম কেন্দ্রীনের গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। আইনস্টাইনের বিশ্বে কিন্তু এ-ধরণের কথা-বার্তা কিছুটা অসংগত। আমরা টাকাকে যেমন সোনায় পরিণত করি বা সোনাকে টাকায় পরিণত করি ভর ও শক্তির রূপান্তরের ব্যাপারটা একেবারে সেরকম নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা একই জিনিষ—ভরশক্তি। কেমব্রিজের পরমাণু-বিদারণ পরীক্ষায় উড়ন্ত হিলিয়াম কণাদের অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য সেই ভরই থাকে যা তারা যেসব কণা দিয়ে তৈরী তাদের ভরের সমষ্টির সঙ্গে সমান। প্রচলিত ভরের সঙ্গে ভরশক্তি সংযুক্ত থাকে। তাদের গতি যত কমে আসে ততই ভরশক্তি কমে আসে। এজন্য তারা তাদের গতিশক্তিকে কাছাকাছি বিচরণ করা পরমাণুদের মধ্যে হস্তান্তরিত করে দেয়, যা তাদের অতিরিক্ত ভরও ভাগ করে নেয়। বর্ধিত শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়। হিলিয়ামের কেন্দ্রীনে পড়ে থাকা ভর শক্তিকে প্রায়ই স্থিতি ভর (rest mass) বলা হয়। প্রচলিত অর্থে ভর বা বস্তুর পরিমাণ বলতে যা বোঝায় স্থিতি ভর হল তাই। কিন্তু যেহেতু বস্তু হলো জমাট বাঁধা ভরশক্তি সেহেতু প্রচলিত ভরের জায়গায় স্থিরশক্তি শব্দটিই বেশী প্রযোজ্য। আর সকল প্রকার শক্তির সঙ্গে ভর সংশ্লিষ্ট। উদাহরণস্বরূপ একটি ইস্তিরি শীতল অবস্থার থেকে অপেক্ষাকৃত গরম অবস্থায় কিঞ্চিৎ বেশী ভারী। একটি গাড়ীর স্হির অবস্হায় যা ভর চলমান অবস্হায় ভর তার চেয়ে বেশী।

যদিও পূর্বসূরীরা কিছু কম বুঝতেন না বা তাঁদের পরিমাপ পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি ছিল না তবু আইনস্টাইনের আবির্ভাবের ক্ষণটি পর্যন্ত প্রকৃতি ওপরের সত্যগুলো গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছিল। সাধারণ দৃশ্যমান বস্তুদের 'স্হিরশক্তি' খুবই বেশী। আবার বিপরীত ক্রমে অধিক পরিমাণ শক্তির সংশ্লিষ্ট ভর খুবই সামান্য। সমগ্র মানবসমাজ প্রতিবছরে যে পরিমাণ শক্তি কাজে লাগায় তার ভর মাত্র কয়েক টন। একটি উষ্ণ ইস্তিরি একটি ঠাণ্ডা ইস্তিরির তুলনায় খুব সামান্যই ভারী। এপোলো মহাকাশযান চাঁদের দিকে ধাবিত হবার সময় তার ভর এক গ্রামের কয়েক হাজার ভাগ বেড়ে ছিল। মহাকাশযানটিকে চালনা করতে কতখানি শক্তি লাগবে তা নির্ণয় করতে অবশ্য যন্ত্রবিদ্‌দের উপরোক্ত ভরের বৃদ্ধিকে উপেক্ষা করেছেন।

সাধারণ মানুষ যেসব গতির সঙ্গে পরিচিত সেসব ক্ষেত্রে ভরের পরিবর্তন উপেক্ষনীয়। কিন্তু ত্বরিত পারমাণবিক গতিশক্তি 'স্হিরশক্তি'র পরিমাণের তুলনীয় হয়ে পড়ে। টেলিভিসনে ইলেকট্রনের যে রশ্মি পর্দায় ছবি ফুটিয়ে তোলে তারা প্রতিটি ইলেকট্রনের ভর কিছু শতাংশ বাড়াবার মত যথোপযুক্ত ত্বরিত হয়। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ইলেকট্রন ত্বরণ যন্ত্র স্ট্যানফোর্ডে অবস্হিত। এই যন্ত্রের

লম্বা নলের মধ্য দিয়ে যখন ইলেকট্রনরা বেরিয়ে আসে তখন তারা ঢোকার সময় যা ছিল তার চেয়ে ৪০,০০০ গুণ বেশী ভারী। গতিশক্তিই এই বর্ধিত ভরের পরিমাপ।

অক্সিজেনের মধ্যে হাইড্রোজেনকে জ্বালালে জল তৈরী হয় ও তার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু পরিমাণ আলো ও তাপ উৎপন্ন হয়। বস্তুর মধ্য থেকে শক্তি ও ভর বেরিয়ে গেছে। সুতরাং কোন রকম পরিমাপ না করেই বলা যায় যে আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সম্মিলিত ভরের চেয়ে জলের ভর কম। বিপরীত দিকে জলকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে ভেঙ্গে ফেলতে গেলে শক্তি দিতে হবে। এই সব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে ভরের পরিবর্তন এতই সামান্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর রসায়নবিদ্‌দের বিশ্বাস যে ভর সৃষ্টিও করা যায় না লয়ও করা যায় না তা খুব অযৌক্তিক ছিল না। যদি সূর্যের মধ্যেকার হাইড্রোজেন অক্সিজেনের সঙ্গে সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হয়ে প্রতি সেকেণ্ডে চার মিলিয়ন টন আলো বিকিরণ করত তাহলে সূর্য কেবল মাত্র আনুমানিক হাজার বছর জীবিত থাকত।

পৃথিবী সূর্যরশ্মির খুব সামান্য অংশই সংগ্রহ করে। তা সত্ত্বেও প্রায় ১৬০ টন আলো প্রতিদিন পৃথিবীর বুকে এসে পড়ে। সবুজ গাছপালা সূর্যরশ্মি শোষণ করে নেয় এবং সেই শক্তি কাজে লাগিয়ে জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে কার্বহাইড্রেট তৈরী করে। এই কার্বহাইড্রেট পৃথিবীর সকল কিছুর শক্তি জোগায়। যে পাঠক এই বইটি পড়ছেন তাঁর মস্তিষ্কের সকল কাজ চলছে রাসায়নিক ও তড়িৎ শক্তির সাহায্যে। এই তড়িৎ শক্তি, রাসায়নিক শক্তির প্রভাবে চোখের মধ্য দিয়ে অক্ষরগুলির প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে পৌঁছে দৃষ্টিশক্তি চিন্তাশক্তিতে পরিণত হয়ে যায়। সমগ্র মানব সমাজের মস্তিষ্কশক্তির সমতুল ভর প্রতি সেকেণ্ডে এক গ্রামের এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ।

আইনস্টাইনের শক্তি সম্বন্ধে মতবাদ বিশ্বে মানবজাতির অস্তিত্ব গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করে। মহাজাগতিক বলের সঙ্গেই জড়িত হয়ে আছে সকল শক্তির উৎস। এই সব বল হলো—তড়িৎচুম্বকীয় বল, আলোর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বা জৈবিক প্রক্রিয়ার মধ্যে যার প্রকাশ ঘটে। এছাড়া আছে কেন্দ্রীন বল, কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় যার প্রকাশ ঘটে। সর্বোপরি আছে মাধ্যাকর্ষণ। এদের সকলের বেলাতেই $E=mc^2$ সূত্রটি প্রযোজ্য।

সূর্য সকল প্রাণশক্তির মূলে। সূর্যের এই আলোর উৎসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় $E=mc^2$ সমীকরণটি একটি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। পুরাকালে সূর্যশক্তির উৎস মানুষের কাছে ধাঁধাঁ বলে প্রতিভাত হত। উনবিংশ শতাব্দী

পর্যন্ত এই রকম মানসিকতাই প্রচলিত ছিল। চার্লস ডারউইন ও ভূবিজ্ঞানীরা অনুমান করতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব প্রায় কয়েক শত বিলিয়ন বছর পুরানো। কিন্তু হেলমোটজ বা লর্ড কেলভিনের মতন পদার্থ বিজ্ঞানীরা এমন উৎসের সন্ধান পাননি যা এত দীর্ঘদিন ধরে সূর্যকে শক্তি জোগাতে পারে। তাঁদের ধারণা ছিল সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রদের তাপ মাধ্যাকর্ষণ থেকে আসছে। মাধ্যাকর্ষণ বস্তুকে সংকুচিত করে শক্তির জোগান দেবে। বিকিরণের হার থেকে হিসাব করে কেলভিন বললেন সূর্যের জীবৎকাল তিরিশ মিলিয়ন বছরের বেশী নয়।

বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে আবিষ্কার ও কেন্দ্রীন বিদ্যা বিশেষজ্ঞ কর্তৃক বিক্রিয়াতে ভরের সামান্য পরিবর্তনের পরীক্ষালব্ধ প্রমাণ সৌরশক্তি উৎস সন্ধানে সফলতা আনল। সৌরশক্তি সম্বন্ধে নতুন ব্যাখ্যা সূর্যের বয়স ও তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে পরিমিত পৃথিবীর বয়স (কয়েক বিলিয়ন বছর) ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হলো। সূর্যশক্তির নতুন ব্যাখ্যাতে দেখা গেল বিশ্বের অতিপরিচিত এবং সব থেকে হালকা হাইড্রোজেন কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার অংশ নিয়ে এই শক্তি জোগাচ্ছে।

একটি সদ্যোজাত নক্ষত্রের কেন্দ্রে মাধ্যাকর্ষণ খুব উচ্চ তাপমাত্রার সৃষ্টি করে যাতে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীন (প্রোটন) সংযুক্ত হয়ে যেতে পারে। ক্রমাগত তাপ কেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় প্রোটন একটি হিলিয়াম কেন্দ্রীন সৃষ্টি করে। হাইড্রোজেনের পর হিলিয়ামই হলো পরবর্তী ভারী বস্তু। ককরোফট ওয়ালটনের পরীক্ষার মতো এখানেও যাদের দিয়ে নতুন বস্তু তৈরী হলো তাদের সম্মিলিত ভর নতুন বস্তুর ভরের চেয়ে কিছু বেশী। একটি হিলিয়াম কেন্দ্রীনের ভর যে দুটি কেন্দ্রীনের সংযুক্তির ফলে হিলিয়াম কেন্দ্রীনটি তৈরী হয়েছে তাদের মিলিত ভরের চেয়ে কম। অন্যভাবে বলতে গেলে যে ভাবে মাধ্যাকর্ষণ একটি বিরাটগ্যাসীয় পিণ্ডকে সংকুচিত করে তাপ উৎপাদন করে ঠিক তেমনিভাবে কেন্দ্রীন বল কেন্দ্রীনের বিভিন্ন অংশগুলিকে সংযুক্ত করে দেয় এবং তাতে তাপশক্তি বেরিয়ে আসে।

সূর্যে হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করতে যে পরিমাণ ভর ক্ষয় হচ্ছে তা প্রায় প্রতি হাজার টন হাইড্রোজেন জ্বালানীতে সাতটন। হাইড্রোজেনের 'স্থিরশক্তি'র এটি একটি সামান্য অংশ কিন্তু এতেই যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তা রসায়ন বা মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে সম্ভব না। নতুন তত্ত্বের আলোকে খুবই তৃপ্তিজনকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে সূর্যের জীবৎকাল পৃথিবীর বর্তমান বয়সের প্রায় দ্বিগুণ।

কেমন করে রাসায়নিক মৌলিক বস্তুগুলি সৃষ্টি হলো তার একটা বিবরণ পাওয়া যায় জ্যোতির্পদার্থবিদ্‌দের কাছ থেকে। আমাদের দেহে হাইড্রোজেনের

চেয়ে ভারী যে সমস্ত পরমাণু আছে তারা সেইসব নক্ষত্রে আগেই সৃষ্টি হয়েছিল যেসব নক্ষত্র সূর্য বা পৃথিবী সৃষ্ট হবার আগেই মৃত হয়ে গেছে। এইসব মৌলিক বস্তুগুলি প্রথমে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে ও পরে যখন সৌরমণ্ডলী সৃষ্টি হয় তখন তারা আবার হিলিয়ামকে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করে কার্বন ও অক্সিজেন তৈরী করে। এই ধরণের ভারী বস্তু তৈরী হবার প্রক্রিয়া চলতেই থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত সিলিকন জ্বলানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে লোহা উৎপাদন করে। লোহা পর্যন্ত বস্তু লয় হতে হতে শক্তি বেরুতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক হাজার টন প্রাথমিক হাইড্রোজেন থেকে প্রায় দশ টন আলো এবং তাপ উৎপাদিত হয়। লোহা হলো সব থেকে সুস্থিত মৌলিক বস্তু এবং এর থেকে কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার সাহায্যে আর কোন শক্তি বার করা যায় না। সোনা বা ইউরেনিয়াম যারা লোহার থেকে ভারী তাদের তৈরী করতে গেলে শক্তি দিতে হয়। এতে নক্ষত্রের শক্তি ক্ষয় হয়। সোনা বা ইউরেনিয়াম বেশী পরিমাণে তখনই উৎপাদিত হতে পারে যখন কোন স্থবির নক্ষত্রের মধ্যে হঠাৎ কোন বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার এক প্রলয় বয়ে যায়। এই কারণে অক্সিজেন বা লোহার তুলনায় সোনা এবং ইউরেনিয়াম পরিমাণে অনেক কম। এইখানেই আত্মগোপন করে আছে খুব ভারী বস্তুদের অসুস্থিত চরিত্রটি। তেজস্ক্রিয়তা ও কেন্দ্রীন বিভাজনের মধ্যে অসুস্থিত চরিত্রটি ফুটে ওঠে এবং এই দুটি প্রক্রিয়া ইউরেনিয়ামের থেকে ভারী বস্তুকে জীবিত থাকতে দেয় না। যেহেতু তৈরী হবার সময় কেন্দ্রীনদের শক্তি দিতে হয় সেই কারণে ভরশক্তি রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সব মৌলিক বস্তুগুলি ভারী হয়ে পড়ে।

ভারী মৌলিক বস্তুদের বেলাতে অতিরিক্ত ভর বা 'স্থিরশক্তি' এতই বেশী যাতে কেন্দ্রীনগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যেতে পারে। ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম এবং ঐ ধরণের তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছোট ছোট অংশ বার করে দেয়। এই সব ছোট ছোট অংশের মধ্যে সবচেয়ে ভারী হলো আলফা কণা বা হিলিয়াম কেন্দ্রীন। এরা এই ছোট ছোট অংশ ছাড়তেই থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত পর্যাপ্ত স্থিতিশক্তি বেরিয়ে গিয়ে সুস্থিত হচ্ছে। শেষপর্যন্ত এই সব তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি সীসা বা বিসমাথে পরিবর্তিত হয়ে যায়। সীসা বা বিসমাথই হলো সবচেয়ে ভারী সুস্থিত মৌলিক-বস্তু। তেজস্ক্রিয়তার সকল নির্গত শক্তি পৃথিবীর বুকে ভূকম্পন বা আগ্নেগিরির সৃষ্টি করে।

কিছু কিছু ভারী মৌলিক বস্তুর কেন্দ্রীন আরও নাটকীয় ভাবে ভেঙে যেতে পারে বিশেষ করে যদি তাদের বাইরের থেকে শক্তি দিয়ে বিচলিত করা যায়। বিশেষ করে ইউরেনিয়ামের অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্য আইসোটোপ ইউরেনিয়াম—২৩৫ কে

স্বল্প শক্তি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে তা দুটো বড় বড় টুকরোয় ভেঙে যায়। নিউট্রন হলো তড়িতাধান বিহীন এবং প্রোটনের সঙ্গী। প্রোটন নিউট্রনের সম্মিলনে কেন্দ্রীনের সৃষ্টি। বিভাজন প্রক্রিয়া চলার সময় আরও নতুন নিউট্রন বেরিয়ে আসে। এই সব নতুন নিউট্রনরা শৃঙ্খল প্রক্রিয়ায় আরও ইউরেনিয়াম ২৩৫-কে ভাঙতে শুরু করে। একই ধরণের কেন্দ্রীন বিভাজন লক্ষ্য করা যায় প্লুটোনিয়ামের বেলাতে। ইউরেনিয়াম ২৩৮-কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে রিয়াকটর কেন্দ্রে প্লুটোনিয়াম সৃষ্টি করা হয়।

কেন্দ্রীন বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে কেন্দ্রীন শক্তি একটি মূল ভূমিকা নিল। এর কারণ হলো ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের স্থির শক্তি অকস্মাৎ ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে, যদিও এতে কেবলমাত্র প্রতি হাজার টনে একটন কেন্দ্রীন ভর লয় হচ্ছে। এই শক্তি এতখানি প্রাধান্য পাচ্ছে তার কারণ হলো দূরের অন্য কোন শক্তি রূপান্তরিত হবার বিরাট হারের জন্য। আইনস্টাইন যখন $E=mc^2$ সমীকরণটি লেখেন তখন কিন্তু তিনি এতখানি জানতেন না। এটি আরও আশ্চর্যের ব্যাপার যে কোন লোক একটি আলোক উৎসর পাশ দিয়ে চলে গেলে আলোর উৎসটি কিরকম দেখাবে সে সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে আইনস্টাইন এমন একটি জিনিষ আবিষ্কার করে ফেললেন যা নভোচারীদের বুঝতে সুবিধা করে দিল কিভাবে একটি নক্ষত্র কাজ করে। কেন্দ্রীনের মধ্যে কতখানি শক্তি নিহিত আছে তা বিজ্ঞানীরা বার করতে সক্ষম হলেন। শেষ পর্যন্ত এই শক্তি কি ভাবে বোমা বা রিয়াকটারের মাধ্যমে ছেড়ে দেওয়া যায় তার উপায়ও উদ্ভাবন করে ফেললেন। ১৯৪৫ সালে হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম দিয়ে নির্মিত পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটল আর তারই সঙ্গে সমীকরণটির কার্যকারিতা প্রমাণ হয়ে গেল।

পরবর্তীকালে হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানবজাতি প্রথম কেন্দ্রীন সংযোজন বা ফিউসন পদ্ধতিকে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগাতে ব্রতী হলো। হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে রাখা একটি ইউরেনিয়াম বোমা সূর্যের কেন্দ্রে যতখানি তাপমাত্রা ততখানি তাপমাত্রা তুলতে সাহায্য করে। এতে হালকা মৌলিক বস্তুগুলি আরও প্রজ্বলিত হবে এবং তাতে সরাসরি বিস্ফোরণের মাত্রা বেড়ে যায়। অন্যদিকে ইউরেনিয়ামে আরও ভালভাবে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এবং তাতে ধ্বংস লীলার তীব্রতা আরও যায় বেড়ে। যাঁরা পারমাণবিক বোমা তৈরি করেছিলেন তাঁরা সাধারণ হাইড্রোজেন থেকে পাওয়া প্রোটনকে ফিউসনের কাজে লাগাননি। তার পরিবর্তে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন ভারী হাইড্রোজেন বা লিথিয়ামকে। কিন্তু কিছু পদার্থবিজ্ঞানী ফিউসন পদ্ধতিকে কল্যাণকর কাজে লাগাবার চেষ্টায় ব্রতী হলেন। তাঁদের চেষ্টা হলো কি করে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে তাপকেন্দ্রীন বিক্রিয়া কার্যকর করা

যায়। এ ব্যাপারে সাফল্য বিশ্বের শক্তির সমস্যাকে সমাধান করার প্রতিশ্রুতি রাখে। অবশ্য হাইড্রোজেন বোমা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিয়েও পৃথিবীর সকল শক্তি সমস্যা মিটিয়ে দিতে পারে। ভালো মন্দ যাই হোক মানবসভ্যতার ভবিষ্যত সম্পূর্ণভাবে জড়িয়ে আছে $E=mc^2$ সমীকরণটির ওপর।

আইনস্টাইন তাঁর সমীকরণটি লেখার পরও অনেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি যে একটি সাধারণ বস্তুর মধ্যে প্রভূত শক্তি নিহিত—'এই কথাটির মধ্যে কি এমন তাৎপর্য থাকতে পারে। 'স্থির-শক্তি' আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে কয়েকটি চরম জিনিষের মধ্যে অন্যতম। কোন জিনিষের স্থিরশক্তি তার নিজের গতিশক্তি বা পর্যবেক্ষকের গতিশক্তির ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু শক্তির উৎস হিসাবে স্থির শক্তির কথা অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। কেন না সবচেয়ে সক্রিয় কেন্দ্রীন বিক্রিয়াও স্থির শক্তির এক শতাংশ কাজে লাগাতে পারে। বাকী নিরানব্বই শতাংশের তাহলে কি হবে?

স্থির শক্তি যা প্রচলিত অর্থে কোন বস্তুর ভর, অন্য কোন শক্তিতে সহজে রূপান্তরিত হতে পারে না। এ ব্যাপারটি কিন্তু খুবই আশাপ্রদ। যদি মানুষ ইচ্ছা করলেই আইনস্টাইনের সূত্র অনুযায়ী এক হাজার মেগাটনের একটি হাইড্রোজেন বোমা ফাটাতে পারত তাহলে সমাজের চেহারাটাই পালটে যেত। স্থিতি শক্তি ব্যাপারটা যে নিছক কল্পনা নয় তা প্রমাণিত হয়ে গেল যখন পরীক্ষামূলকভাবে ভর সৃষ্টি করা সম্ভব হলো। পারমাণবিক কণা নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত পদার্থ-বিদেরা দেখলেন যে পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন আলো প্রকৃত অর্থে গামা রশ্মি, নতুন কণা সৃষ্টি করতে পারে। আলোর শক্তি সেখানে ভরে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। নতুন কণা তৈরী করতে ন্যূনতম যে শক্তি দরকার তা কণাটির স্থিরশক্তির ওপর নির্ভর করে আছে। আইনস্টাইনের সমীকরণের সাহায্যেই এই স্থির শক্তির পরিমাণ নির্ণিত হবে।

প্রকৃত পক্ষে ওপরের কাহিনীটি আরেকটু বেশী সমৃদ্ধ। কেন না আগে শূন্য ছিল এমন কোন স্থানে নতুন বস্তু সৃষ্টি হতে পারে। প্রকৃতিকে একসঙ্গে দুটি কণা সৃষ্টি করতে হয়। এই বিশ্বে স্থিতিশীল কণাদের সংখ্যা অকারণে পরিবর্তিত হতে পারে না। একটি কণার সঙ্গে তার বিপরীত কণা সৃষ্টি করে উপরোক্ত সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি গামা রশ্মি (যার শক্তি দুটি ইলেকট্রনের যৌথ ভরের সমান) থেকে একটি ইলেকট্রন ও একটি প্রতীপ ইলেকট্রন (পসিট্রন) তৈরী হতে পারে। একটি কণার প্রতীপ কণা সহজাতভাবে কণাটির সমপর্যায়ের, কেবল তড়িতাধান সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন একটি কণা ও তার প্রতীপ কণার সঙ্গে মিলিত হয় তখন তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে লয় প্রাপ্ত

হয়। বিশ্ব থেকে কণা দুটি অন্তর্হিত হয়ে যা পড়ে থাকে তা হলো একটি গামা রশ্মি। ভর সৃষ্টি হবার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়া এটি।

প্রতীপ বস্তুর উপস্থিতির কথা প্রথম বলেন ব্রিটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ডিরাক। আইনস্টাইনের তত্ত্বকে ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে গিয়ে তিনি প্রতীপ বস্তুর ধারণাটি পান। ডিরাকের এই অবিশ্বাস্য ধারণা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল ১৯৩২ সালে। আবিষ্কৃত হলো ইলেকট্রনের প্রতীপ কণা পসিট্রন। প্রথমে যেসব মহাজাগতিক রশ্মি বহির্বিশ্ব থেকে পৃথিবীতে এসে পেঁছায় তাদের থেকে পসিট্রনের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত ত্বরণ যন্ত্রগুলি এত শক্তিশালী করা হলো যে ভারী এ্যান্টিপ্রোটন তৈরী করা সম্ভব হল। এ্যান্টি-প্রোটন হলো হাইড্রোজেন পরমাণু কেন্দ্রীনের অর্থাৎ প্রোটনের বিপরীত কণা। ১৯৫৫ সালে সেগ্রে ও চেম্বারলীন ক্যালিফোর্ণিয়াতে এ্যান্টিপ্রোটন আবিষ্কার করেন।

১৯৭০ সাল নাগাদ বস্তু ও প্রতীপ বস্তু তৈরীর ব্যাপারটি নিয়মমাফিক কাজ হয়ে দাঁড়ায়। বড় ত্বরণ যন্ত্রের প্রতিটি স্পন্দনে আইনস্টাইনের ফরমুলা নিত্য প্রতিষ্ঠা পেলো। এইসব ত্বরণ যন্ত্র পরিচিত কণাই সৃষ্টি করে তা নয়, এইসব যন্ত্রে অনেক ভারী বস্তু তৈরী হয়—যাদের মধ্যে বিচিত্র গুণাবলীর সমারোহ ঘটেছে। এইসব বিচিত্র গুণাবলীর নাম দেওয়া হয়েছে 'ষ্ট্রেনজনেস', 'চারম', 'বিউটি' ইত্যাদি। এইসব কণারা বস্তুর সম্বন্ধে মূল প্রাকৃতিক নিয়মগুলি প্রকাশ করে। $E=mc^2$ সমীকরণ আজ আর কেবল সৌরশক্তির বা পারমাণবিক বোমার গোপন চাবিকাঠি নয়—সাধারণ ভাবে সকল সৃষ্টির মূলই হলো এই সমীকরণটি।

সুতরাং এখন বস্তুর স্থির শক্তির গভীর তাৎপর্যটি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হচ্ছে। প্রথমতঃ স্থিরশক্তি হচ্ছে বস্তু তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি। কোন বস্তুর সঙ্গে যদি তার প্রতীপ বস্তুর সংঘর্ষ ঘটে তাহলে পুরো স্থির শক্তি বেরিয়ে আসবে। যদি ঈশ্বরকে শূন্য থেকে আদমকে সৃষ্টি করতে হত তাহলে তাকে সেই পরিমাণ শক্তি সংহত করতে হত যার পরিমাণ দাঁড়াত এক হাজার মেগাটন বোমা বিস্ফোরণে যে পরিমাণ শক্তি বেরয় তার সমান। এর দ্বিগুণ পরিমাণ শক্তি দরকার হত যদি ঈশ্বর একই সময়ে বিপরীত আদম সৃষ্টি করতেন।

এইখানে বিশ্বের ইতিহাস একটু আলোচনা করা যেতে পারে। এই বিশ্বের সৃষ্টি হয়েছিল এমন একটি অবস্থায় যাকে ইংরাজীতে বলা হয় বিগব্যাঙ্গ। এই সময়ে সৃষ্টি ও লয়ের প্রচণ্ড লীলা খেলায় প্রচুর সংখ্যক কণা ও প্রতীপ কণা সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্ব যত ঠাণ্ডা হতে লাগল এবং পারিপার্শ্বিক শক্তির পরিমাণ কমতে

লাগল ততই লয় প্রক্রিয়া প্রাধান্য পেতে শুরু করল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ভরের এক বিলিয়ন অংশ পড়ে রইল। এই এক বিলিয়ন অংশ হলো কণা ও প্রতীপ কণাদের মধ্যে বিক্রিয়া হয়ে যা পড়ে রইল তাই।

আমাদের দেহের সকল পরমাণু সেই থেকে নানাভাবে যুক্ত বা বিযুক্ত হয়েছে কিন্তু মূল অংশগুলি—প্রোটন ও ইলেকট্রন সৃষ্টি হয়েছিল অকল্পনীয় এক চুল্লীতে। যদি পাঠক সৃষ্টির রহস্য অবলোকন করতে সেই সময় উপস্থিত থাকতেন তা হলে তার মনে স্থির শক্তির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকত না। তিনি স্বচক্ষে দেখতে পেতেন আলোকরশ্মি ভরে আবার ভর আলোকরশ্মিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে এবং তা ঘটেছে আইনস্টাইনের সূত্র মেনে। আজকের বিশ্ব অনেক ঠাণ্ডা। নতুন বস্তুর সৃষ্টি এখন প্রায় দুর্লভ ঘটনা। সৌভাগ্যক্রমে প্রতীপ বস্তুর উপস্থিতিও খুব সামান্য। এর ফলে সকল বস্তু তাদের শক্তি লুকিয়ে রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

বস্তু এবং আলোকরশ্মির মধ্যে এই রূপান্তর সৃষ্টির চুল্লীতে ধরা পড়ে। আলোকরশ্মিতে শক্তি আছে যা ভরের সমতুল। সৃষ্টির আদি পর্বে অর্থাৎ বিগব্যাঙ্গ কালে এই শক্তি বস্তুকণাদের ভরের সমান ছিল। কণা ও আলোকরশ্মি একে অপরে রূপান্তরের সময় বিশ্বের মোট ভরশক্তি একবিন্দুও পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু আলোর কোন স্থিরশক্তি নেই। আলোকে কখনই স্থির অবস্থায় আনা যাবে না। কোন কিছুতে শোষিত হয়ে আলোক শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। জন্মের সাথে সাথে আলোর গতিবেগ অসীম ত্বরণ নিয়ে বাড়তে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য চরম গতিবেগ নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। অপর দিকে যে কোন বস্তু আলোর তুলনায় খুব ধীর গতিতে চলবে এবং অল্প অল্প করে গতিবেগ পরিবর্তন করবে। এর থেকেই স্থিতিভর ধারণার সৃষ্টি।

চূড়ান্ত জলপ্রপাত

১। যে বস্তু নীচের দিকে পড়ছে তা সামান্য স্থিরশক্তি হারায়।
২। মাধ্যাকর্ষণ আলোকে থামিয়ে দিতে পারে ও কৃষ্ণ গহ্বরের সৃষ্টি করতে পারে।
৩। কোন জিনিষ কৃষ্ণগহ্বরে ঢুকলে তা অনেকখানি স্থিরশক্তি মুক্ত করে।
৪। মরনোন্মুখ নক্ষত্রেরা তীব্র মাধ্যাকর্ষণের সৃষ্টি করে।
৫। মাধ্যাকর্ষণের ফলে মুক্ত স্থিরশক্তি বিরাট মহাজাগতিক ঘটনাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারে।

কণাদের যেমন প্রতীপ কণা আছে মনুষ্যদেহেরও প্রতীপ মনুষ্যদেহ থাকতে পারে, যার সঙ্গে মিলন হলে শক্তি বেরুবে। অনুরূপভাবে আমরা ভাবতে পারি যে মনুষ্যদেহ দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন একটি কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে পড়ে যায় তাহলে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে শক্তি বেড়িয়ে আসতে পারে। কৃষ্ণগহ্বরকে মাধ্যাকর্ষণের বাঁধন হিসাবে ভাবা যেতে পারে যে বাঁধনে বস্তুরা বাঁধা পড়ছে। কৃষ্ণ গহ্বরকে এইভাবে দেখলে $E=mc^2$ সমীকরণের প্রকৃত অর্থ অন্যভাবে বোঝা যেতে পারে।

মাধ্যাকর্ষণের দরুণ পতনশীল বস্তু থেকে শক্তি আহরণ করার ধারণাটি খুবই পরিচিত। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, যে সমস্ত দেশে বেশী পাহাড় পর্বত আছে তারা জলপ্রপাত থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা নদীর জলস্রোত জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইনটিকে ঘোরায়। জল যত উঁচু থেকে পড়বে ততই শক্তি আহরণের পরিমাণ বেড়ে যাবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই নদী সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে খুব একটা উঁচু থেকে পড়ে না। জলকে অনেক সময় গভীর গহ্বরে ফেলা যায় এবং সেখান থেকে প্রভূত শক্তি লাভ করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যে কোটারা ডিপ্রেসন বা মৃত সমুদ্র এর উদাহরণ।

এই প্রক্রিয়ার সীমা কি? একটি উন্মাদ যন্ত্রবিদের কথা ধরা যাক। মনে করা যাক জলের উচ্চতায় তিনি সন্তুষ্ট নন। তাঁর ইচ্ছা জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনকে বাড়াবার জন্য পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত একটি নলকূপ খনন করা। নীতিগতভাবে ঐ দীর্ঘ পথ বরাবর জল পাঠালে অনেক শক্তি পাওয়া যেতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তেমনটি ঘটবে না। এর কারণ হলো যতই সে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে ততই মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণ কমতে থাকবে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রে তার মান শূন্য

হয়ে যাবে। এ ধরণের একটি ঘটনা যন্ত্রবিদের পরিকল্পনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

একটি অদ্ভুত ধরণের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসতে পারে। তিনি ভাবতে পারেন যে চূড়ান্ত জলপ্রপাতকে জল সরবরাহ করার জন্য জলের উৎসটিকে ঠিক রেখে যদি পর্বতদের আয়তন সংকুচিত করে দেওয়া যায় তাহলে তার কর্মসিদ্ধি হবে। এরও কিন্তু কতকগুলি ব্যবহারিক অসুবিধা আছে। যন্ত্রবিদ্ যদি কোন উপায়ে ৮০০০ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট পৃথিবীকে সংকুচিত করে এক ইঞ্চিরও কম ব্যাস বিশিষ্ট গোলকে রূপান্তরিত করতে পারেন তবে তার মাধ্যাকর্ষণ অনেকক্ষণ স্থিতিশীল থাকবে। পৃথিবীর এই ছোট সংস্করণের সামনে মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণও খুব বেশী হবে। প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রবিদ্ একটি কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি করেছেন। এখানে মাধ্যাকর্ষণের তীব্রতা এত বেশী যে এর কাছ থেকে আলোও ছাড়া পাবে না। এখন যদি যন্ত্রবিদ্ জল ঢালতে শুরু করেন তাহলে তাঁর সকল চেষ্টা সফল হবে। প্রতিটি জলবিন্দু আলোর গতিবেগ নিয়ে ত্বরিত হবে, স্থির শক্তির প্রায় সম্পূর্ণ অংশই কাজে লাগানো সম্ভব হবে। প্রতিটি জলবিন্দুই তখন একশ টন বিস্ফোরকের সমান শক্তি অর্জন করবে।

সবচেয়ে ভালো ফলের জন্য যন্ত্রবিদের উচিত হবে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী রোজার পেনরোজের পরামর্শ নেওয়া। ১৯৬০ সালে তিনি কৃষ্ণগহ্বরের মূল চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন। তিনি এমন একটি যন্ত্রের পরিকল্পনা করেন যা উন্নত মানের সভ্যতাকে তার সমস্ত প্রয়োজনীয় শক্তি জোগাবে। এই যন্ত্রের মূল কথা হলো সমস্ত আবর্জনা একটি কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে ফেলে দিতে হবে। একটি জিনিষই কেবল প্রয়োজন হবে যে কৃষ্ণগহ্বরটি ঘূর্ণায়মান হতে হবে।

একটি ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বরের চারিপাশে একটি অংশ থাকে যেখানে কোন বস্তু পতিত হলে তা বেরিয়ে আসার একটি সম্ভাবনা থাকে। পেনরোজের যন্ত্রে মানুষ বালতি ভর্তি আবর্জনা কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে ফেলবে। এসবগুলি হয়তো চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু এটা হবার আগে বালতি আবর্জনা জমা করবে। এটা করতে গিয়ে এটি সমস্ত আবর্জনার স্থির শক্তির সমান গতি শক্তি অর্জন করবে। এই শক্তি এতই পর্যাপ্ত হবে যে তাতে কৃষ্ণগহ্বরের বাঁধন থেকে বালতিগুলো বেরিয়ে আসতে পারবে এবং তাদের পুরানো জায়গায় ফিরে যেতে পারবে। এইসব ফিরে আসা বালতিগুলো একটি ফ্লাইহুইলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং তাদের গতিশক্তি তাড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। বালতি ক্রমশঃ স্থির হয়ে আসবে এবং তাকে আবার কাজে লাগানো যাবে।

আবর্জনা যা কাজ করে জলও সেই কাজ করতে পারে। মানবদেহের স্থির শক্তির কথা মনে রেখে কৃষ্ণগহ্বরের বাসিন্দারা চাইবে তাদের প্রিয়জনের জাগতিক

দেহাবশেষ কৃষ্ণগহবরেই সমাহিত করতে। একটি বালতি পুনরুদ্ধারক্ষম কফিনের মত। একজন তার আত্মীয়স্বজনের জন্য কয়েক মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা কার্যকর শক্তি পেয়ে যাবেন। বর্তমান কালে এই পরিমাণ শক্তির দাম কয়েক বিলিয়ন ডলার। ওপরে যে কারিগরির কথা বলা হলো তারা কাল্পনিক ঠিকই কিন্তু সাধারণ বস্তুর স্থিতিশক্তি কাল্পনিক নয়। বস্তুকে কৃষ্ণগহবর বা ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করে স্থিরশক্তির অনেকাংশ বার করে নেওয়া যায় স্পষ্টতই প্রকৃতির এটা জানা আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিজ্ঞানীরা সৌরশক্তি ও সূর্যের জীবৎকাল সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী ছিলেন। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ যে মহাজাগতিক শক্তির উৎস সে সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। বস্তুকে সংকুচিত করে মাধ্যাকর্ষণ স্থির শক্তির বেশ কিছু অংশ নির্গত করতে পারে। $E=mc^2$ ও মাধ্যাকর্ষণের মধ্যেকার সম্পর্কটি জেনে সূর্য, বিস্ফোরণশীল নক্ষত্র ও গ্যালাক্সির ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব।

সূর্য এবং আকাশে যেসব নক্ষত্র স্থিরভাবে জ্বলছে তারা তাদের জীবনের মধ্য ভাগে। এরা এখনও হাইড্রোজেন জ্বালানী ব্যবহার করে চলেছে। কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার দরুণ কেন্দ্রে যে তাপ উৎপন্ন হয় তা নক্ষত্রের মধ্যে যে বস্তু আছে তাকে বাইরের দিকে প্রসারিত করে। যে মাধ্যাকর্ষণ সকল বস্তুকে কেন্দ্রের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করে এটি তার বিপরীত। দুটি বিপরীতমুখী বল শেষ পর্যন্ত একটি সমঝোতায় আসে। এর ফলে উদাহরণস্বরূপ সূর্যের ভরের গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়ে খুব একটা বেশী নয়। সূর্যের কেন্দ্রে অবশ্য ঘনত্ব খুব বেড়ে যায় এবং তার পরিমাণ দাঁড়ায় জলের ঘনত্বের একশো গুণ।

যখন সূর্যে বা অন্যান্য নক্ষত্রে কেন্দ্রীন জ্বালানীর পরিমাণ ফুরিয়ে আসবে তখন তার আয়তন খানিক বেড়ে যাবে, জ্বলে উঠবে আর তারপরেই মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সঙ্কুচিত হতে হতে শ্বেত বামনে পরিণত হয়ে যাবে। এ ধরণের শ্বেত বামনের অস্তিত্বের কথা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জানা আছে। আকাশে খুব উজ্জ্বল নক্ষত্রদের মধ্যে একটি হলো সিরিয়াস নক্ষত্র। এই নক্ষত্রের একটা স্তিমিত সঙ্গী আছে। এই সঙ্গীটি হলো প্রথম আবিষ্কৃত শ্বেত বামন। একটি শ্বেত বামনে মাধ্যাকর্ষণ বস্তুকে এতখানি সংকুচিত করে যে বস্তুর গড় ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়ে কয়েক বিলিয়ন গুণ বেশী হয়ে যায়। সূর্যের সমান ভর নিয়েও আকৃতিতে একটি শ্বেত বামন প্রায় পৃথিবীর সমান। এই পরিস্থিতিতে মাধ্যাকর্ষণ খুব বেশী হয় ও বস্তু ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট হয়ে শ্বেত বামন তৈরী করে। মুমূর্ষু নক্ষত্রের এই অন্তিম সংকোচনের দরুণ নির্গত শক্তি বস্তুর স্থির ভরের কেবল দশ হাজার ভাগের এক ভাগের সমতুল। এটা জীবনের আদি পর্বে হাইড্রোজেন জ্বালানী উদ্ভূত কেন্দ্রীন শক্তির চেয়ে অনেক কম।

যে সমস্ত নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে বেশী ভারী তারা সূর্যের চেয়ে অনেক তীব্রভাবে প্রজ্জ্বলিত। এদের জীবৎকাল অনেক কম। সুপারনোভার বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে আকর্ষণীয়ভাবে এদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই অবস্থায় নক্ষত্রেরা তাদের মিলিয়ন মিলিয়ন বছর অস্তিত্বে মোট যে পরিমাণ শক্তি নির্গত করেছে দুই এক দিনে তার চেয়ে বেশী শক্তি নির্গত করে। এ ধরণের চিত্তাকর্ষক বিস্ফোরণ দেখা গিয়েছিল ১০৫৪ সালে। চৈনিক জ্যোতির্বিদ্‌রা এই বিস্ফোরণ দেখেছিলেন। এই নক্ষত্রের টুকরোগুলি এখন দেখতে পাওয়া যায় এবং এরাই ক্র্যাব নেবুলাটি সৃষ্টি করেছে। এই বিস্ফোরণের মাঝখানে শ্বেত বামনের পরিবর্তে যা আছে তাকে বলা হয় পালসার। এই পালসার নিয়মিতভাবে প্রতি সেকেণ্ডে তিরিশ বার জ্বলে উঠছে। শুধু তাই নয় এর থেকে বেতার তরঙ্গরশ্মি ও দৃশ্যমান আলোক-রশ্মি বেরিয়ে আসছে।

পালসারকে 'নিউট্রন নক্ষত্র' বলা হয়। এ ধরণের নক্ষত্রে, মাধ্যাকর্ষণ নক্ষত্রের ভরকে এমন একটি গোলকে সংকুচিত করেছে যে গোলকের ব্যাস দশ মাইল মাত্র। এখানে ভরের ঘনত্ব খুব বেশী এবং সামান্য পরিমাণ ভরের ওজন অত্যন্ত বেশী। এ ধরণের নক্ষত্রকে 'নিউট্রন নক্ষত্র' বলার একটি কারণ আছে। এটি হলো তীব্র চাপের দরুণ এখানে বস্তু একটি অদ্ভুত অবস্থায় থাকে। এখানে মাধ্যাকর্ষণ তড়িৎ বলকে (যা পরমাণুর স্বাভাবিক আয়তন বজায় রাখে) অতিক্রম করে যায় এবং সমস্ত পরমাণুর কেন্দ্রীনগুলি এক সঙ্গে সংকুচিত করে। একটি পালসারের স্বরূপ ও প্রকৃতি আলোচনার একটি চমকপ্রদ বিষয়। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো যে ধ্বংস হয়ে গেলে একটি পালসার তার ভরের সমতুল স্থির শক্তির দশ শতাংশ ছেড়ে দেয়। এখানে মাধ্যাকর্ষণ যে কোন কেন্দ্রীন বিক্রিয়াকে অতিক্রম করে যায় এবং বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে যে শক্তি পাওয়া যায় তার বেশ কিছু অংশ ছেড়ে দিতে শুরু করে।

কতগুলি ক্ষেত্রে সঙ্গী কোন নক্ষত্র থেকে পালসারের দেহত্বকে ভর ঝরে পড়ে। পতনের প্রচণ্ডতা এত বেশী যে এতে বস্তুগুলি প্রজ্জ্বলিত হয়। গরমে শুধু লালাভ হয় তা নয়, সাদা হয় এবং এত তাপিত হয় যে রঞ্জন রশ্মিও বের হতে থাকে। লয়প্রাপ্ত নক্ষত্র থেকে যেমন বেতার ও আলোক তরঙ্গ বেরিয়ে আসে সেই-রকম রঞ্জন রশ্মিও নিয়মিতভাবে বেরিয়ে আসে। এর কারণ হলো পালসারের মধ্যে খুব শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র আছে যা বস্তুর পতনকে নিয়ন্ত্রিত করে ও নিজ দেহে উষ্ণ স্থানের সৃষ্টি করে। যেহেতু পালসার নিজ অক্ষের চারিপাশে ঘুরছে সেই কারণে উষ্ণ স্থানগুলি বারংবার আবির্ভূত এবং অন্তর্হিত হয়।

আর যেসব নক্ষত্র থেকে রঞ্জন রশ্মি বের হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

হলো সিগনাস x—১। এটি নিয়মিতভাবে উদ্দীপিত হয় না যদিও এর বিকিরণ ভয়ানকভাবে বাড়ে কমে। সন্দেহ করা হয় যে এরাই কৃষ্ণগহবর। সিগনাস x—১ এর বেলাতে দৃশ্যমান সঙ্গী নক্ষত্র (যার নাম হলো HD ২২৬৮৬৮) থেকে ভর এই কৃষ্ণগহ্বরে ঝরে পড়ে বলে মনে হয়। একটি কৃষ্ণগহ্বরের ভর সূর্যের ভরের চেয়ে ছয়গুণ বেশী হয়। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে যখন একটি বৃহদাকার নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটে তখন মাধ্যাকর্ষণ ও ইমপ্লোসিভ বিক্রিয়ার ফলে নক্ষত্রের বহিরাবরণ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়। ভেতরের অংশটি থেকে একটি কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি হয়। তাত্ত্বিকভাবে এমন কি ব্যবহারিকভাবেও মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রীন বলের (যা কেন্দ্রীনকে সুস্থিত রাখে) পরিমাণকে অবিশ্বাস্যভাবে ছাড়িয়ে যায় এবং নক্ষত্রের ভেতরের অংশকে অতিমাত্রায় সংকুচিত করে ফেলে। আমেরিকার বিশিষ্ট আপেক্ষিকতাবাদ বিজ্ঞানী হুইলার 'কৃষ্ণগহবর' নামকরণটি করেন। যদি পাঠক চূড়ান্তভাবে লয়প্রাপ্ত নক্ষত্রের খুব কাছে যান তাহলে তিনি সেটিকে দেখতে পাবেন না। তার পেছনের নক্ষত্রগুলি মুছে যাবে। এর ফলে আকাশে একটি কৃষ্ণ-গহবরের সৃষ্টি হবে।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব থেকে দেখা যায় যে একটি কৃষ্ণগহবর সূর্যের চেয়ে ছয়গুণ ভারী হবে এবং তার ব্যাস হবে বাইশ মাইল মাত্র। কৃষ্ণ-গহবরকে দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু এ ধরণের ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্র চূড়ান্ত জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। পেনরোজের কৃত্রিম কৌশল ছাড়াও ঘূর্ণয়মান কৃষ্ণগহবরের মধ্যে পতনশীল বস্তু তার স্থির শক্তির চল্লিশ শতাংশ নির্গত করতে পারে। এই শক্তি রঞ্জনরশ্মি বা অন্য বিকিরণের আকারে বেরিয়ে আসে। যখন একটি কৃষ্ণগহবরের মধ্যে ক্রমাগত বস্তু এসে পড়ে তখন এর চারিপাশ খুব উজ্জ্বলভাবে জ্বলে ওঠে। চিরতরে হারিয়ে যাবার আগে মুমূর্ষুর আর্ত চিৎকারের মতন পড়ন্ত বস্তু শক্তি জোগায়।

তত্ত্বের দিক থেকে খুব ভাঁরী 'কৃষ্ণগহবর' হওয়া সম্ভব। বিশ্বসৃষ্টির শুরুতে (বিগব্যাঙ্গ সময় কালে) এরা সৃষ্ট হতে পারে অথবা পরবর্তীকালে অনেকগুলো নক্ষত্রের ভর একসঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণগহবরের সৃষ্টি করতে পারে। ৮৭ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে যে কৃষ্ণগহবর আছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে তার ভর সম্ভবত কয়েক বিলিয়ন সূর্য একত্র করলে যা ভর হবে তার সমান। এ ধরণের একটি কৃষ্ণগহবরের সামনে ঘূর্ণয়মান নক্ষত্র বা গ্যাস বিকিরণ ছাড়াও উত্তপ্ত বস্তুর জেট নিক্ষেপ করতে পারে যা M ৮৭ তে দেখা গিয়েছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এ ধরণের একটি মহাজাগতিক শক্তির উৎসের প্রয়োজন ছিল। ১৯৬০ সালে যখন কোয়াসার আবিষ্কৃত হলো তখন তার ঔজ্জ্বল্যের

পরিমাণ দেখে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা হতচকিত হয়েছিলেন। বেতার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিস্তৃত রেডিও গ্যালাক্সি থেকে এবং খুব ছোট নক্ষত্র বা আধা নক্ষত্রর মত বেতার উৎস থেকে প্রভূত পরিমাণ শক্তি নির্গত হতে দেখে বিচলিত হয়েছিলেন। নক্ষত্র বা আধা নক্ষত্রের মত এই সব বেতার উৎসকে কোয়াসার বলে। অবশ্য ১৯৬৩ সালের আগে পর্যন্ত কোয়াসারের ভয়ংকর চরিত্রটি পুরোপুরি অনুধাবন করা যায়নি। এই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার বেতার জ্যোতির্বিদেরা এরকম একটি কোয়াসারের সন্ধান পান। একই সময়ে একজন ডাচ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ঐ দৃশ্যমান বস্তুটি নিয়ে গবেষণা করেন এবং দেখতে পান যে কোয়াসার বস্তুটি অনেক দূরে অবস্থিত। সুতরাং খুব ছোট আয়তন থেকে বেরিয়ে আসা বেতার ও আলোক শক্তির পরিমাণ খুবই বেশী।

ডাচ বিজ্ঞানী স্মিডের ভাষায়ঃ একটা চরম অবিশ্বাস নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম। আমার স্ত্রীকে বললাম "সাংঘাতিক ব্যাপার", আজ অসম্ভব কোন ঘটনা ঘটেছে। মনে হলো বিশ্বের সমস্ত জোড়গুলো খুলে গেছে। ব্যাখ্যা করা যায় না এমন পরিমাণ শক্তির সম্মুখীন হয়ে কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ প্রকৃতিতে রহস্যময় কোন বলের কথা ভাবতে শুরু করলেন। কিন্তু প্রমাণিত হলো এ ধরণের শক্তির জন্য কোন নতুন ধরণের বলের উপস্থিতির দরকার নেই। মাধ্যাকর্ষণ বিরাটকায় পরিণত কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে পতনশীল নক্ষত্র থেকে স্থির শক্তি বার করে নেয়। এই বেরিয়ে যাওয়া স্থির শক্তির সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কোয়াসারের তৃপ্তিজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পেতে পারেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোয়াসার হলো ছোট ভয়ংকর ভাবে বিস্ফোরণশীল গ্যালাক্সির মধ্যবিন্দু এবং তা উজ্জ্বলতায় সাধারণ নক্ষত্রদের ম্লান করে দেয়।

ধারণা করা যেতে পারে যে অনেক বা প্রায় সব গ্যালাক্সির (আমাদের ছায়াপথ সমেত) মাঝখানে বিরাটকায় কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব আছে। সেক্ষেত্রে কোয়াসার বা অন্যান্য শক্তির নির্গমন সাধারণ গ্যালাক্সির বেলাতে তুলনামূলক ভাবে কম। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন যে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি কৃষ্ণগহ্বর পারিপার্শ্বিক থেকে নক্ষত্র এবং গ্যাস গ্রাস করে নিচ্ছে প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর ধরে। শেষপর্যন্ত এর গ্রাস করার মত কিছু থাকে না কারণ কাছের সব জিনিষকেই সে গ্রাস করে নেয়। নিরাপদ দূরত্বে থাকার ফলে কিছু নক্ষত্র এর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যায়।

সূর্য এবং পৃথিবী ছায়াপথের প্রান্তে অবস্থান করে। আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে একটি কোয়াসারকে মনে হবে যে সাগিটারিয়াস কনস্টেলেসনের মধ্যে একটি স্থায়ী প্রভা। এর রঙ নীল এবং ঔজ্জ্বল্যে পূর্ণ চন্দ্রের মতন। এটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে ছায়াপথ চিরকালই এরকম চিত্তাকর্ষক ছিল কিনা। নক্ষদের গতিবিধি সংক্রান্ত অনুসন্ধান গ্যালাক্সির কেন্দ্রে কৃষ্ণগহ্বরের ভরের

একটা উচ্চসীমা আরোপ করে। এর উচ্চসীমা হলো সূর্যের ভরের পাঁচ মিলিয়ন গুণ অথবা M ৮৭-র ভরের হাজার ভাগের এক ভাগ। বর্তমানে ছায়াপথের কেন্দ্রে বেতার শক্তির একটি সুসংহত উৎস আছে। ধরা যেতে পারে এটি একটি কৃষ্ণগহ্বর যার আহার্য প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী কৃষ্ণগহ্বর সম্বন্ধে সন্দেহবাদী। এদের চিন্তায় কৃষ্ণগহ্বরের ধারণা প্রকৃতিতে তাঁদের মালিকানা বোধের ওপর হস্তক্ষেপ। এইসব বিজ্ঞানীরা এটা মানেন যে মাধ্যাকর্ষণ বস্তুকে বিচূর্ণ করতে পারে এবং রঞ্জন রশ্মি নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকে প্রভূত পরিমাণ শক্তি উদ্গীরণ করতে পারে। তাঁরা কিন্তু এটা বলেন যে লয় বা একত্রে সংযুক্ত হবার ব্যাপারটা এতদূর হওয়া দরকার নেই যাতে কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি হতে পারে। নিজ অক্ষ বরাবর ঘূর্ণায়মান ভারী নক্ষত্র অনেককাল পর্যন্ত লয় প্রক্রিয়াটিকে আটকে রাখতে পারে এবং এরপরে মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত কিছু আছে যা শেষ পর্যন্ত নক্ষত্রটিকে কৃষ্ণগহ্বর হতে দেবে না। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের ধারণাটিকে তখনই বাতিল করা যায় যদি ধরে নেওয়া যায় আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বটি ভ্রান্ত।

বিপরীত ক্রমে যদি কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় সকলের পছন্দসইভাবে তাহলে চূড়ান্ত অবস্থায় সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণিত করা যাবে। আইনস্টাইনের তত্ত্ববাদ দিয়ে মাধ্যাকর্ষণের অন্যান্য তত্ত্বগুলি সকল কৃষ্ণগহ্বরের একই রকম চরিত্র আশা করবে। অদূর ভবিষ্যতে কৃষ্ণগহ্বর সম্বন্ধে বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ জ্যোতির্বিদদের এমন সব তথ্য জোগাতে পারে যার থেকে বলা যাবে কৃষ্ণগহ্বর আইনস্টাইনের তত্ত্ব মেনে চলে, না অন্য কোন তত্ত্ব মানে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে বিভিন্ন তত্ত্ব পতনশীল বস্তু থেকে বিকিরণের দ্রুততম হার কিভাবে পরিবর্তিত হবে বা দৃশ্যমান বিকিরণের ওপরে মাধ্যাকর্ষণের কি প্রভাব তার সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভবিষ্যত বাণী করবে।

একটি সক্রিয় কৃষ্ণগহ্বর আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের পূর্ব আস্বাদন দেয়। যখন প্রাথমিকভাবে ভর ও স্থির শক্তির মধ্যে নিহিত শক্তি সংহত হয়ে গ্রহ, নক্ষত্র বা কৃষ্ণগহ্বরের মতো বিরাট ভরের একটি বস্তু তৈরী করে তখন সে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ভর বা শক্তিকে প্রভাবিত করে। মাধ্যাকর্ষণজনিত প্রভাবের দরুণ এক শক্তি অন্য শক্তির সঙ্গে বিক্রিয়া করে বেশ বিশালভাবে। বিক্রিয়ার চরিত্রটাই এমন যে তীব্র মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের নিকটবর্তী হচ্ছে এমন বস্তুর ভরের স্থিরশক্তির মান কমিয়ে দেয়। যেহেতু শক্তি সৃষ্টি করা যায় না লয়ও করা যায় না সেহেতু সেই হারিয়ে যাওয়া স্থিরশক্তি শক্তির অন্য কোন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। এই শক্তি পর্বতের গা বেয়ে আসা জলের গতি শক্তি অথবা কৃষ্ণগহ্বরে পতনোন্মুখ গ্যাসের রঞ্জন-

রশ্মির শক্তি হতে পারে।

আইনস্টাইনের তত্ত্বে যে ভাবে স্থির শক্তির মান কমে আসে তা সম্ভব হয় সময়ের ওপরে মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজক প্রভাবের ওপরে। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা সেই ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করব যাতে করে আলো'র সম্বন্ধে আইনস্টাইনের আবিষ্কারকে অনুধাবন করতে পারি। এই আবিষ্কার শক্তি ও সময়ের মধ্যে একেবারে ভিন্ন ধরণের সম্পর্ক নির্দেশ করে।

১। পরমাণুর মধ্যেকার বিন্যাসের পরিবর্তন নির্দিষ্ট শক্তির আলোর বিকিরণ করে।

২। আইনস্টাইন আবিষ্কার করেন আলো কণার সমষ্টি।

৩। আলোর কণাদের শক্তি কম্পনের হারকে নির্দিষ্ট করে।

৪। আলো পরমাণু থেকে একই ধরণের আলো বার করতে পারে।

৫। বিকিরণ উদ্দীপিত করে লেসার ও আণবিক ঘড়ি তৈরী করা যায়।

কিভাবে একটি পারমাণবিক ঘড়ি চালিত হয় তা আপেক্ষিকতাবাদ বোঝার জন্য না জানলেও চলবে। আইনস্টাইন যখন তাঁর তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন তখন পারমাণবিক ঘড়ির অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু পারমাণবিক ঘড়ি যে দুটি নীতির ওপর ভিত্তি করে চলে সে দুটি তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। সত্যি বলতে কি আইনস্টাইনকে পারমাণবিক ঘড়ির জনক বলা যেতে পারে। বর্তমানকালে সময় নির্ধারণের ব্যাপারে পারমাণবিক ঘড়ি সর্বাধুনিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত।

এই বিশ্বে প্রতিটি পরমাণু প্রকৃতি নির্মিত ঘড়ি হিসাবে কাজ করতে পারে। এর কারণ হলো পরমাণু নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যার আলো গ্রহণ করতে পারে বা ছাড়তে পারে। সময় নিদ্ধারণের ব্যাপারটি সবসময় নিয়মিতভাবে ঘটে যাওয়া কতগুলি ঘটনার ওপর নির্ভর করে। উদাহরণ হলো দিন রাত্রি হওয়া, দোলকের দোলন, কোয়ার্জ কেলাসের কম্পন ইত্যাদি। আলোর বেলাতে কম্পন হলো তড়িৎক্ষেত্রের। দৃশ্যমান আলোর কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেন্ড পাঁচ মিলিয়ন বিলিয়ন। আলোর মত বিকিরণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট মহাজাগতিক রামধনু আছে। এই রামধনুর একপাশে আছে কম কম্পনসংখ্যা বিশিষ্ট (যা সেকেণ্ডে মাত্র কয়েকটি কম্পন সম্পাদন করে) বেতার শক্তি ও অপর পাশে আছে গামারশ্মি যার কম্পন সংখ্যা দৃশ্যমান আলোর কম্পনের চেয়ে বিলিয়নগুণ বেশী। এসত্ত্বেও সকল ধরণের শক্তি একই গতি নিয়ে চলে এবং তাদের সাধারণ চরিত্রও এক। আপেক্ষিকতাবিদেরা যখন "আলোর" কথা বলেন তখন তাঁরা ব্যাপক অর্থে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গই বোঝান কেবলমাত্র দৃশ্যমান আলো নয়।

একটি নির্দিষ্ট পরমাণু থেকে কোনো নির্দিষ্ট 'অবস্থায় যে আলো বেরিয়ে

আসবে তার কম্পন সংখ্যা সুনির্দিষ্ট। 'অবস্থা' বলতে পরমাণুর মধ্যস্থিত অংশ-গুলির সজ্জার পুনর্বিন্যাস। এ ধরণের পুনর্বিন্যাস ঘটতে পারে আলো গ্রহণ করলে বা ছাড়লে। যেহেতু অংশগুলির সজ্জার বিন্যাস কয়েকটি নির্দিষ্ট রূপেই গ্রহণ করতে পারে সেইহেতু আলোর শক্তিও সুনির্দিষ্ট। আইনস্টাইন আবিষ্কার করেন আলোর কম্পনসংখ্যা একমাত্র শক্তির ওপর নির্ভর করে।

আইনস্টাইন অসামান্য প্রতিভা সম্পন্ন পদার্থবিদ্ ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের শুরুতে তিনি সুইজারল্যান্ডের বার্ণশহরে পেটেন্ট অফিসার হিসাবে কাজ করতেন। বিভিন্ন ধরণের আবিষ্কার নিয়ে তাঁকে নাড়াচাড়া করতে হতো। এতে তাঁকে অনেক ব্যবহারিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হত। তা সত্বেও তিনি পর্যাপ্ত সময় পেতেন নিজস্ব ভাবনাচিন্তা নিয়ে ডুবে থাকতে এবং তাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনা করতে। ১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতাবাদ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা সুপরিণত হবার আগে এবং $E=mc^2$ সমীকরণটি প্রস্তাব করার আগে তিনি আরেকটি প্রবন্ধ রচনা করেন যার জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণ করেন যে আলো কণার সমষ্টি।

জারমানিতে ১৯০০ সাল নাগাদ পরীক্ষকেরা 'আলোক-তড়িৎ' ক্রিয়ার ব্যাপারটি নিয়ে বেশ খানিকটা সমস্যায় পড়েছিলেন। আলো বিশেষ করে অতিবেগুনি রশ্মি যখন কোনো ধাতব পাতের ওপরে এসে পড়ে তখন তা ধাতুর মধ্যস্থিত ইলেকট্রন বার করে দেয়। এ ব্যাপারে একটা স্বাভাবিক চিন্তাধারা হলো যে যদি আলোকরশ্মি স্তিমিত করে দেওয়া হয় তাহলে ধাতব পাত থেকে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনের শক্তিও কম হবে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখা গেল যে এ ধরনের কোনো ব্যাপার ঘটছে না। আলোর তীব্রতা কমালে বেরিয়ে আসা ইলেকট্রনের সংখ্যা কমে গেল ঠিকই কিন্তু তাদের শক্তির কোনো তারতম্য ঘটল না। যেসব পদার্থবিজ্ঞানী বিশ্বাস করতেন যে আলোর তরঙ্গ মাত্র তাঁদের কাছে পুরো ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো। এ ব্যাপারটা যেন একটি শান্ত সমুদ্রে তরঙ্গ বন্দর তটে আছড়ে পড়ে সেখানকার একটি নৌকোকে শূন্যে প্রায় একশো ফিট ওপরে তুলে দিল। অন্যদিকে আলো কণাদের সমষ্টি ধারণাটা সুষ্ঠু বলে মনে হলো কেননা প্রত্যেকটি কণা বুলেটের মত স্বাভাবিক ভাবে তার সমস্ত শক্তি একটি ইলেকট্রনের ওপরে সংহত করবে।

পরবর্তী পরীক্ষায় আরও দেখা গেল উচ্চ কম্পনাংক বিশিষ্ট আলো ধাতব পাত থেকে ইলেকট্রন বার করছে বেশী শক্তি নিয়ে—অন্যদিকে কম কম্পনাংকের আলো যে ইলেকট্রন বার করছে তাদের শক্তি কম। আইনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে আলোক কণা দ্বারা বাহিত শক্তি কেবলমাত্র কম্পনাংকের সমানুপাতিক। প্রতি সেকেণ্ডে পূর্ণ দোলনকালের সংখ্যাই কম্পনাংক। যদি একটি আলোক কণার

কম্পনাংক দ্বিগুণ করা হয় তাহলে তার শক্তিও দ্বিগুণ হবে। ডাচ পরমাণুবিজ্ঞানী নিলস্ বোরের এই অতিপ্রয়োজনীয় সূত্রটির প্রয়োজন ছিল। এর ওপর ভিত্তি করেই তিনি দেখান যে পরমাণু কর্তৃক আলো গ্রহণ ও বর্জন পরমাণুর অংশগুলির পুনর্বিন্যাসের ফলেই সম্পাদিত হচ্ছে।

একটি বস্তুর সকল পরমাণুই একরকম। প্রকৃতি অসংখ্য এই এক-ধরণের পরমাণু নির্মাণ করে এমন নিপুণভাবে যে মানুষের তৈরী কোন কারখানায় তা সম্ভব নয়। শুধুমাত্র পৃথিবীর বেলাতে যে ওপরের কথাগুলি প্রযোজ্য তা নয় সমস্ত বিশ্বজুড়েই এর সত্যতা। সুতরাং একজন নভোচারী মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত কোন গ্রহে একটি নির্দিষ্ট পরমাণুর যে নির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটছে তা সহজেই বুঝতে পারে। একই রকম ভাবে বিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত কোয়াসারের মধ্যে কোন পরিবর্তন নভোচারীদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। কোন গ্রহ বা কোয়াসার থেকে বেড়িয়ে আসা আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে একজন পর্যবেক্ষক উজ্জ্বল এবং কালো রেখার এক সুশৃংখল বিন্যাস দেখতে পাবেন। উজ্জ্বল রেখাগুলি পরমাণু থেকে আলো বেরিয়ে আসার জন্য এবং কালো রেখাগুলো হলো পরমাণু কর্তৃক আলো শোষণের ফলে। প্রত্যেক মানুষের আঙ্গুলের ছাপ আলাদা তেমনি প্রত্যেক পরমাণুর বর্ণালীর বিন্যাস নির্দিষ্ট। পরমাণুর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে নভোচারীরা দূরবর্তী কোন বস্তুরা কি দিয়ে তৈরী এবং সেখানকার সাধারণ অবস্থা কেমন সে সম্বন্ধে একটি ধারণা করতে পারেন। বর্ণালীর কোন একটি রেখার কম্পন সংখ্যা পৃথিবীতে পরিমাপ করলে যা হবে একজন চলমান নভোচারীর কাজে তা মনে হবে না। দুয়ের মধ্যে পার্থক্য থেকে যে কেউ চুম্বকত্বের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে বা ডপলার এফেক্টের পরিমাণ থেকে বলে দিতে পারে যে নক্ষত্রটি পৃথিবীর সাপেক্ষে কত গতিবেগ নিয়ে চলছে বা নক্ষত্রের উষ্ণতা কত।

সমস্ত আলোর উচ্চ কম্পনাংকের অর্থ দাঁড়াল যে নীতিগত ভাবে প্রতিটি সেকেণ্ডকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করা যায় এবং তার ফলে খুব অল্প সময়সীমা মাপা যায়। ব্যবহারিক ঘড়ি হিসাবে পরমাণুদের একটি নিদারুণ অসুবিধা আছে। একবার একটি পরমাণু একটি আলোক কণা গ্রহণ করে বা বর্জন করে একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসে নিজেকে সাজিয়ে নেয় তবে সেই অবস্থায় সে বেশী সময় কাটায় না। শেষ পর্যন্ত পরমাণুটি তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে প্রক্রিয়াটি পুনরায় অনুষ্ঠিত করার অপেক্ষায় থাকে। এর ফলে অনেকগুলো পরমাণুর সম্মিলন থেকে আলো অনিয়মিতভাবে বেরিয়ে থাকে। প্রত্যেকটি আলো কণাকে একটি ছোট তরঙ্গ সমষ্টি হিসাবে ভাবা যেতে পারে যা চরিত্রগতভাবে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ

এবং যাদের সঠিক কম্পনাংক আছে এবং যা নিমেষের মধ্যে কোন স্থান অতিক্রম করে। সবচেয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় আলোক কণারা আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীনভাবে, এবং এমতাবস্থায় আলো পারস্পরিক সম্পর্কবিহীন।

সময় পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজন অবিচ্ছিন্ন আলোর তরঙ্গ। ব্যাপারটা অনেকটা বেতার শক্তির অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের মতন। একটি অলটারনেটিং ইলেকট্রিক কারেন্টের মাধ্যমে অনেকগুলি ইলেকট্রনকে বারে বারে ক্রমান্বয়ে চালনা করে যন্ত্রবিদেরা এই বেতার শক্তির সৃষ্টি করেন। আলোর বেলাতে এ ধরনের জিনিষ করতে গেলে আমাদের এমন সব পরমাণুদের সুনির্দিষ্ট সরবরাহ চাই যারা প্রত্যেকে একই রকম অবস্থায় আছে এবং যারা একই ধরণের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মুখোমুখি। এরপর এ ধরণের পরমাণুদের উপযুক্ত সময়ে আলো বিকিরণ করতে বাধ্য করতে হবে যাতে আলোর একক তরঙ্গগুলি সংযুক্ত হয়ে একটি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত আলোক তরঙ্গে পরিণত হয় যার প্রবাহ অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে থাকবে।

আইনস্টাইনের দ্বিতীয় বিরাট তাত্ত্বিক আবিষ্কার হলো—পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসা আলোর চরিত্র সম্পর্কিত। তাঁর এই তত্ত্বে জানা গেল পরমাণুদের থেকে বেরিয়ে আসা আলোকের মধ্যে পারস্পরিক সুসংহতি সহজেই সাধন করা যায়। ১৯১৬ সালে তিনি এই আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন। এই সময়ে তিনি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ও মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব সম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর মত হলো, যে একটি পরমাণু যা একটি নির্দিষ্ট পন্থায় নিজের বিন্যাস পাল্টাতে ও আলো বিকিরণ করতে প্রস্তুত তাকে ঐ কাজ করতে বাধ্য করা যায় যদি তার কাছাকাছি একটি আলোক তরঙ্গ আনা যায় যার কম্পন সংখ্যা ও পরমাণু থেকে যে আলো বেরুবে তার কম্পন সংখ্যা সমান। ইংরাজীতে প্রক্রিয়াটিকে বলে স্টিমিউলেটেড এমিসন অব রেডিয়েসন বা আলোকরশ্মির প্রভাবিত বিকিরণ। যেমনভাবে সৈন্যরা একই পদক্ষেপে মার্চ করে যায় ঠিক তেমনি আলোগুলিও তার সহযোগীদের সঙ্গে এক কদমে চলতে থাকে। রেডিও জ্যোতির্বিদেরা লক্ষ্য করেছেন যে নক্ষত্রের মধ্যে যে গ্যাসীয় মেঘমালা আছে তাদের কিছু কিছুর মধ্যে ওপরের প্রক্রিয়াটি নিজ থেকেই ঘটে যাচেছ।

'লাইট এ্যাম্পলিফিকেসন বাই স্টিমিউলেটেড এমিসন অব রেডিয়েশন' এই বাক্যটি আদ্যক্ষর নিয়ে 'লেসার' শব্দটি সৃষ্ট। ১৯৬০ সালের আগে পর্যন্ত পদার্থবিজ্ঞানীরা লেসার সৃষ্টি করতে পারেন নি, যদিও তাত্ত্বিকভাবে আইনস্টাইনের তত্ত্ব সেই রকম আলোক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল যা খুব বিশুদ্ধ, পারস্পরিক সংহতি পূর্ণ ও সুতীব্র। আবির্ভূত হবার কুড়ি বছরের মধ্যে লেসার বাজার মাত

করল—ধাতু গলানো থেকে শুরু করে চন্দ্রের দূরত্ব মাপার কাজে পর্যন্ত লেসার ব্যবহৃত হলো। প্রতিবিম্ব তৈরী করার ব্যাপারে নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হলো লেসারের সাহায্যে এবং কারিগরির নাম হলোগ্রাফি। প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাছে লেসার, আলোর দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্রের (কণা এবং তরঙ্গ) মধ্যে সঙ্গতিসাধন করে। কম্পমান কণাদের যদি এক কদমে চালনা করা যায় তাহলে তারা নিয়মিত তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

পারমাণবিক ঘড়ি লেসারের কিছু আগে তৈরী হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নির্ভরযোগ্য সময় রক্ষক হিসাবে এর আবির্ভাব ১৯৫৫ সালে যে বছর আইনস্টাইনের মহাপ্রয়ান ঘটে। যে নীতির উপর নির্ভর করে ছোট বেতার তরঙ্গ বা মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় পারমাণবিক ঘড়ি সেই নীতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। নির্দিষ্ট মানের পারমাণবিক ঘড়িতে সিজিয়াম নামক মৌলিক বস্তুর পরমাণুর একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহকে কাজে লাগানো। প্রবাহের প্রত্যেকটি পরমাণু এমন অবস্থায় চলে যাবার জন্য তৈরী, যার ফলে মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ বেরিয়ে আসবে। ঘড়ির মধ্যে যে গহ্বর আছে তাতে পরমাণুগুলি একে অপরের পরিবর্তন আনতে বাধ্য করে এবং যার ফলে একটি নির্দিষ্ট কম্পনাংকের অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ পাওয়া যায়। এই তরঙ্গগুলিকে একটি কোয়ার্জ কেলাসের কম্পনকে নিয়ন্ত্রিত করতে কাজে লাগানো হয়। এই কোয়ার্জ কেলাসের সুনিয়ন্ত্রিত কম্পন ও ইলেকট্রনিক পদ্ধতি দিনের সময়কে নির্দেশ করে। পারমাণবিক ঘড়ি বানাতে যে কেবল সিজিয়াম ব্যবহার করা হয় তা নয় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে রুবিডিয়াম ধাতুও ব্যবহার করা হয়। যে সমস্ত জায়গায় অতিসূক্ষ্ম সময়সীমা মাপার দরকার হয় সেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় হাইড্রোজেন। ১৯৬৭ সালে সিজিয়াম নির্মিত পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যেই বিশ্বের সর্বত্র সঠিক সময় নির্ধারণ শুরু হয়ে যায়। আজকের দিনে এক সেকেন্ড বলতে আমরা বুঝি সিজিয়াম ১৩৩ পরমাণু কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট বিন্যাসে যাবার সময় মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গের ৯ ১১২ ৬৩১ ৭৭০ টি কম্পন। সারা বিশ্ব জুড়ে সরকারী গবেষণাগারে ব্যবহৃত প্রায় আশিটি পারমাণবিক ঘড়ি থেকে নির্ধারিত সময় প্যারিস শহরের ইণ্টারন্যাশনাল টাইম ব্যুরোতে জমা পড়ে। সবচেয়ে যে ঘড়িটি সুস্থিত তার দ্বারা নির্ধারিত সময়গুলি গড় গণতান্ত্রিক সময় হিসাবে জগতকে জানিয়ে দেয়। সময় নির্ধারক হিসাবে পৃথিবীর ঘূর্ণনের এবং সূর্য ও নক্ষত্রদের আপাতত গতির চেয়ে পারমাণবিক ঘড়ি অনেক বেশী নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে ভূবিজ্ঞানীরা পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে দিনের দৈর্ঘ্যের খুব সূক্ষ্ম পরিবর্তন ধরতে পারেন। পারমাণবিক ঘড়ি জ্যোতির্বিদ্যা নির্ভর ঘড়ির মধ্যে পার্থক্য ঠিক করতে সরকারী সময়কে প্রায় এগুতে বা পেছুতে হয়।

আজ প্রায় হাজারেরও ওপর পারমাণবিক ঘড়ি সারা বিশ্বজুড়ে চালু আছে। সুতরাং আজ তারা গবেষণাগারে নিছক কৌতূহল উদ্দীপক যন্ত্রমাত্র নয়। এই পারমাণবিক ঘড়ি উষ্ণতা শৈত্য আঘাত সব কিছু সহ্য করতে পারে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নির্মিত একটি পারমাণবিক ঘড়ি টেবিলের ড্রয়ারের আকারে এবং ওজন প্রায় ৫৫ পাউন্ড। আজকাল অবশ্য ছোট আকারের পারমাণবিক ঘড়ি তৈরি হয়। পারমাণবিক ঘড়ির কৃপায় আজকাল অতি সূক্ষ্ম সময় নির্বাচনের ব্যাপারটি নিয়মমাফিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রয়োজনবোধে সময় নির্দ্ধারণের সূক্ষ্মতা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেওয়া যায় সিজিয়ামের বদলে হাইড্রোজেন ব্যবহার করে।

আইনস্টাইন ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, গতি ও মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা ঘড়িতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এ দু-ধরণের প্রতিক্রিয়াকে আলাদা করার ব্যবহারিক প্রয়োজন আছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, যে সমস্ত জাহাজ ও উড়োজাহাজ চালকদের জন্য বেতার যন্ত্র ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন প্রেরক যন্ত্র থেকে তার সংকেত প্রাপ্তির সঠিক সময়ের ওপর নির্ভর করে এবং এর সাহায্যেই তারা তাদের অবস্থান জানতে পারে। যদি বিশ্বের চারিপাশে ছড়িয়ে থাকা প্রেরকযন্ত্রগুলি সুসমন্বিত থাকে তাহলে এই প্রক্রিয়ায় মাপা দূরত্ব সঠিক হবে। কিন্তু আপেক্ষিকতাসংক্রান্ত তথ্যগুলি বিচারে না আনলে ভুল করার অবকাশ থেকেই যায়। তার ওপর নাবিক নিজেই ভ্রাম্যমান এবং তার ফলে সময় পরিমাপে আপেক্ষিকতাজনিত ত্রুটি ক্রমশঃ বাড়তেই থাকে। প্রতিবারে নির্দিষ্ট স্থানে ঘড়িগুলো বারে বারে সুসমন্বিত করে না নেওয়া হয় তাহলে ভুলের পরিমাপ বেশ তাৎপর্য পূর্ণ হয়ে ওঠে। আরও সাধারণ ভাবে বলতে গেলে জ্যোর্তিবিদ, ভূ-পদার্থবিজ্ঞানী, বিভিন্ন বেসরকারী সময়রক্ষকরা চাইবেন জগৎ জুড়ে একটি সুসমন্বিত সময়কাল সৃষ্টি করতে। কৃত্রিম উপগ্রহ তাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে কিন্তু অসুবিধাটি কেবল যে কারিগরির দিক থেকে তা নয় কিছু, কিছু তাত্ত্বিক অসুবিধাও আছে কেননা আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন যে গতির জন্য জায়গা থেকে জায়গায় সময়ের তারতম্য হতে পারে।

১৯৭১ সালে দু'জন আমেরিকান পদার্থবিজ্ঞানী জে. সি. হাফেলে ও রিচার্ড কিটিং একটি যুগান্তকারী পরীক্ষা চালান। তাঁরা একটি স্থান পরিবর্তনযোগ্য সিজিয়াম পারমাণবিক ঘড়ি (নিরাপত্তার ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য তারা চারটি ঘড়ি নিয়েছিলেন) এক যাত্রীবাহী জেট বিমানে করে পৃথিবীর চারিপাশে পরিভ্রমণ করান। তারা যাত্রার শুরু ও সমাপ্তিতে ওয়াশিংটনে নেভাল অবসারভেটারিতে রাখা একটি সুনির্দিষ্ট ঘড়ির সঙ্গে তাদের সিজিয়াম ঘড়িতে নির্দেশিত সময় মিলিয়ে দেখেন। দু-ধরণের যাত্রা পথ নেওয়া হয়েছিল—একবার পূর্বমুখ বরাবর আর

অন্যবার পশ্চিম মুখ বরাবর এবং দু-ধরণের যাত্রায় প্রতিবারই মোট তিনদিন সময় লেগে ছিল। পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা গেল যে দিনের সময়ের ব্যাপারে ঘড়িগুলো আর একরকম হচ্ছে না।

পূর্বমুখী ঘড়িগুলো ওয়াশিংটনের ঘড়িগুলোর তুলনায় ৫৯ ন্যানো সেকেন্ডে (এক সেকেন্ডের এক বিলিয়ন ভাগ) হারাচ্ছে অপর দিকে পশ্চিমমুখী ঘড়ি ২৭৩ ন্যানো সেকেন্ড বেড়ে যাচ্ছে। নিউটনের বিশ্বে এত নির্ভরশীল যন্ত্রে এ ধরণের তারতম্য কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না। পরমাণুগুলি কিভাবে সময়ের তারতম্য দর্শাতে পারে? কিন্তু হাফেলে ও কিটিং আইনস্টাইনের বিশ্বে যে জিনিষটি প্রত্যাশা করেছিলেন পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি সন্তোষজনক ভাবে তার সঙ্গে মিলে যায়। বিমানের ক্যাপ্টেন যে ভাবে যাত্রাপথ নির্দেশ করেছিলেন তার ওপর নির্ভর করে আপেক্ষিকতা বাদ কাজে লাগিয়ে তারা পূর্বদিকে চল্লিশ ন্যানো সেকেন্ডে লয় ও পশ্চিম দিকে ২৭৩ ন্যানো সেকেন্ডে লাভ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সময় রাখার ব্যাপারে দু ধরণের স্বতন্ত্র প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রথম ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হলো উচ্চতা বাড়ালে ঘড়ির লয় দ্রুত হয়ে যায় কারণ উচ্চতা বাড়লে মাধ্যাকর্ষণ কমে থাকে। উচুঁতে যে কোন দিকে চলমান আকাশ যানে এর প্রতিক্রিয়া একই রকমের। তবুও দুই দিকে সময়ে যে ভিন্নতা তা হলো আইনস্টাইনের তত্ত্বের আরেকটি সূক্ষ্ম ধারণার জন্য। এই সূক্ষ্ম ধারণাটি পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকে বা তার বিপরীত দিকে যাওয়ার ব্যাপারে ঘড়িদের চরিত্র সংক্রান্ত।

সময় রাখার ব্যাপারে আপেক্ষিকতাবাদের প্রকৃত প্রতিক্রিয়ার এটি একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। পূর্ববর্তী কালের পরীক্ষাগুলি বিষয়টি আরও সূক্ষ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সময় সম্বন্ধে আরো সব চমকপ্রদ তথ্যের মুখোমুখি হতে হবে। এর জন্য কিছু উৎসাহজনক কথা এখনই বলে রাখা ভাল। ১৫১৯-২২ সালে ফার্দিনাদ মেগেলালের পৃথিবী পরিক্রমা অভিযানে যারা শেষ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন তাঁরা বাড়ী ফিরে দেখেন কোনভাবে একদিন সময় কমে গেছে। এমন একটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে সবাই [illegible] পানোন্মত্ত ছিলেন—কিন্তু সময় রাখার ব্যাপারটি খুব যত্ন সহকারে হয়েছিল সেটিও অস্বীকার করা যায় না। পর্তুগীজ পণ্ডিতেরা মাথা খুঁড়লেন প্রকৃত ব্যাপারটি কি জানবার জন্য এবং অচিরেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে কি ঘটনা ঘটেছে, যদি কেউ পশ্চিম মুখ বরাবর পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে এবং যদি সে সূর্যোদয়ের সংখ্যা দেখে সময় গণনা করে তাহলে সে গৃহে বসে থাকা লোকদের তুলনায় একটি

সূর্যোদয় কম দেখবে। পর্যটকের সৌর ঘড়ি ধীরগতিতে চলে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে একটা দিন বাড়া বা কমা খুবই সাংঘাতিক ব্যাপার। তাঁরা বিশ্বাস করতেন তাঁদের দিন বাঁধা এবং তাঁদের মৃত্যুর দিন মৃত্যু-দূতের খাতায় ঠিক হয়ে আছে। আজকাল অনেক ভ্রমণকারীই মধ্য প্রশান্ত সাগরীয় ইন্টারন্যাশন্যাল ডেট লাইন অতিক্রম করেন। এখানে পশ্চিমের দিকে যাবার সময় একদিন হারায় যা পূর্বদিকে গেলে একদিন বেড়ে যায়। একথা স্বীকার্য যে সমস্ত ব্যাপারটি কিছুটা ভৌতিক। কিন্তু দীর্ঘ পরিচিত ও সরল ব্যাখ্যা রহস্যকে লঘু করতে সাহায্য করবে। সুতরাং আপেক্ষিকতাবাদের দ্বারস্থ হওয়াই ভাল।

ভারশূন্যতা

১। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে আলোচনা করে।

২। মুক্তভাবে পতনশীল একটি মানুষ কোন মাধ্যাকর্ষণজনিত বল অনুভব করে না।

৩। পরিক্রমারত মহাকাশযানের ভেতরের বস্তুগুলি ওজন শূন্য।

৪। পৃথিবী বিশ্বের মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত গতিতে পড়ছে।

৫। মাধ্যাকর্ষণ শূন্যে তার পদরেখা এঁকে দেয়।

আলবার্ট আইনস্টাইন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বটিকে আপেক্ষিকতাবাদের আলোকে নতুন ভাবে খাড়া করেছিলেন। ১৯১৯ সালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁর কয়েকটি ভবিষ্যৎ বাণীকে সত্য বলে প্রমাণিত করলেন এবং এতেই তিনি ভুবন বিখ্যাত হয়ে গেলেন। তিনি প্রতিভাধর আখ্যা পেলেন এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির চূড়ান্ত পরিণতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আপেক্ষিকতাবাদ মানুষের কাছে অবোধ্য ছিল। আইনস্টাইন এই দুরূহতা দূর করার কাজে ব্রতী হন। এই সময় এক পত্রিকার সংবাদদাতা তাঁর কাছে জানতে চান যে আপেক্ষিকতাবাদে কাজ করার পেছনে তাঁর কি অনুপ্রেরণা ছিল। একটি ছোট ঘটনার কথা বলে আইনস্টাইন এর উত্তর দিয়েছিলেন। বার্লিন শহরের একটি বাড়ির ছাদ থেকে একটি মানুষকে পড়তে দেখে তাঁর বিজ্ঞান চেতনার উন্মেষ ঘটে। মানুষটি সামান্য আঘাত পেয়ে বেঁচে যায়। আইনস্টাইন দৌড়ে লোকটির কাছে যান। লোকটি তাঁকে বলে যে পড়বার সময় সে কোন ভার অনুভব করেনি। লোকটির এই উক্তিই বিশ্বকে নতুন করে দেখবার প্রেরণা জোগাল আইনস্টাইনকে।

কিছু কিছু লোক মনে করে আইনস্টাইনের ঐ গল্পটি এক সাধারণ লোকের কাছে কৌতুককর উক্তি মাত্র। এই ধারণাটি বোধ হয় সত্যি নয় কেননা আইনস্টাইন তাঁর গল্পের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্বন্ধে আদৌ লঘু ছিলেন না। গল্পটির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর তত্ত্বের মূল বক্তব্যটি সার্থকভাবে তুলে ধরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আইনস্টাইনের একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধ পাওয়া গেছে যেখানে তিনি উপরোক্ত ঘটনাটি অন্যভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যদি কোন ছাদ থেকে একজন দর্শক মুক্ত ভাবে নিচে পড়ে তাহলে যতক্ষণ ধরে সে পড়ছে ততক্ষণ সে কোনো ভার অনুভব করবে না অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণের অনুভূতি থাকবে না।

ছাদ থেকে পড়ন্ত মানুষ অভিকর্ষ জনিত বল অনুভব করে না। বর্তমান পরিভাষায় লোকটি ভারশূন্য। আইনস্টাইনের তত্ত্বে পড়ে যাবার কোন ব্যাখ্যা দরকার হয় না কেননা মহাজাগতিক দিক থেকে দেখলে পড়াটা সবচেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা এবং তা যে কারুর, পক্ষেই ঘটতে পারে। শুধু যখন পতনকে রোধ করা দরকার তখনই কেবল বলের উৎপত্তি হয়। পায়ের তলায় আমরা যে বল অনুভব করি তা উপর দিকে ক্রিয়া করে, নীচের দিকে নয়।

পাঠক কিন্তু বলবেন যে, অভিকর্ষজনিত বল বাস্তব—অতিমাত্রায় বাস্তব। অভিকর্ষ আকাশের বুক থেকে বিমান নামিয়ে আনতে পারে। পর্বতচূড়া থেকে কোন পর্বত আরোহীকে নামিয়ে পাদমূলে চুর্ণ বিচূর্ণ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কেউ মাধ্যাকর্ষণকে অস্বীকার করতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ অতিপ্রবল, গ্রহ থেকে কিছু বিচ্যুত হতে দেয় না। সব দিক থেকেই মাধ্যাকর্ষণ একটি বল বিজ্ঞানীরাও নিশ্চিতভাবে এটাই বলে থাকেন। কেবলমাত্র প্রশ্ন হলো মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়া বুঝতে গেলে এই বর্ণনাই কি সবচেয়ে কার্যকর। একজন আরোহী পদস্খলন হবার আগে একটি বল অনুভব করে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারটি আসলে পৃথিবী থেকে ধার করা একটি উর্ধমুখী বল যার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে ব্যহত করা হয়। যখন কোন আরোহী উঁচুর থেকে নীচে পড়ে যায় তখন পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে ওপরে একটি বল ক্রিয়া করে। এই বল খুব অল্প সময়ের জন্য সক্রিয় থাকে। তার মাটিতে পড়ার মুহূর্তে সে একটা বল অনুভব করবে। এই বলের পরিমাণ এমন হবে যাতে সে পতনের গতিশক্তিকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু যে সময় ধরে সে পড়ছে সে সময়ে বাতাসের স্বল্প বিরোধিতা ছাড়া আর কোন বলই ক্রিয়া করে না। তার কাছে মনে হবে মাটি তার দিকে উঠে আসছে মিলিত হবার জন্য। আপেক্ষিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পতনশীল আরোহীর দুর্দশা বোঝবার এইটাই সর্বোত্তম উপায়।

কেবলমাত্র দুটি পা থাকার যে অসুবিধা তা সত্ত্বেও মানুষ মাধ্যাকর্ষণের বিরুদ্ধে সোজা এবং নিশ্চিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অনেক চেষ্টা করে, অনেক বুদ্ধি খরচ করে। এ ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা জন্মগত। ধরা যাক একটি শিশুর মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। শিশু নিজের থেকেই মায়ের চুল আঁকড়ে ধরে নিজেকে পড়ার হাত থেকে বাঁচাবে। পড়ে যাওয়ার ভীতি অনেক প্রাণীদের একটি সহজাত বৃত্তি। ১৯৬০ সালে আমেরিকার মনস্তাত্বিকরা কয়েকটি বিখ্যাত পরীক্ষা সম্পাদন করেন। গবেষণাগারে কৃত্রিম পর্বতচূড়া বানিয়ে নানা ধরণের প্রাণিদের তার ওপর দিয়ে উঠতে দেওয়া হলো। দেখা গেল উড়তে ও সাঁতার কাটতে পারে এমন কিছু প্রাণি ছাড়া আর সব প্রাণীই চূড়াটি দেখা মাত্র

থমকে দাঁড়াল। দেখা গেল জন্মাবার মাত্র ছাগল শিশু জীবনের প্রথম দিন থেকে ঐরকম আচরণ করল। মানব শিশুর বেলাতে দেখা গেল তাদের পড়ে যাবার ভীতিটা ঢুকেছে হামাগুড়ি দিতে শুরু করার পর থেকে।

মানুষের কানের ভেতর ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে খড়ির মত পাথরের টুকরো আছে। এই পাথরের টুকরোগুলি নিচে পৃথিবীর দিকে পড়তে থাকে এবং শেষ প্রকোষ্ঠগুলি দেওয়ালের চুলগুলিতে বাধা পায়। এই চুলগুলির গোড়ায় যে সব স্নায়ুতন্ত্র আছে তারা পাথরের টুকরোগুলির চাপে উত্তেজিত হয় এবং মস্তিষ্কে এই বার্তা পাঠায় যে "এই নীচে যাবার পথ।" যদি মাথাকে পাশের দিকে ঘোরানো যায় তাহলে অন্য চুলগুলি পাথরের টুকরোগুলি দ্বারা উত্তেজিত হবে। একমাত্র মহাকাশ যান ছাড়া সব জায়গাতেই নীচে পড়ে যাবার অনুভূতিটি মানুষের সাথে সাথেই থাকে।

কৃত্রিম উপগ্রহ যখন কক্ষপথে স্থাপিত হয় তখন তার ওপর আর কোন বল প্রয়োগ করতে হয় না। কেবল মাত্র পৃথিবীর আকর্ষণের প্রভাবেই তা কক্ষপথে চলতে থাকে। এই অবস্থায় উপগ্রহের ভেতরে মহাকাশচারীরা ভারহীন অবস্থা অনুভব করে। অর্থাৎ তাদের মনে হয় তাদের কোন ওজন নেই। পৃথিবী আমাদের mg বলে আকর্ষণ করলেও আমাদের সাধারণত g ত্বরণ হয় না কেননা ভূমির প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে আমরা আমাদের ভারকে প্রতিহত করি। এই প্রতিক্রিয়া আমাদের দেহের ওপর ক্রিয়া করে বলেই আমরা নিজেদের ওজন অনুভব করি। মুক্ত ভাবে পতনশীল বস্তু g ত্বরণে নামে। এই অবস্থায় বস্তুটির ওপর ভূমির প্রতিক্রিয়া থাকে না। এই অবস্থায় বস্তুটি ভারহীন। কৃত্রিম উপগ্রহ যখন কক্ষপথে চলতে থাকে তখন আরোহীর ওপর উপগ্রহের পাটাতন কোন বাড়তি প্রতিক্রিয়া 'বল' প্রয়োগ করে না। সুতরাং এক্ষেত্রেও আরোহী ভারহীনতা অনুভব করে। উপগ্রহের মধ্যে কোন বস্তু ছেড়ে দিলে তা ভাসতে থাকে।

মহাকাশে যে সমস্ত গবেষণাগার আছে—আমেরিকার স্কাইল্যাব বা রাশিয়ার সলিউট—সেখানে নভোচারীরা মাসের পর মাস ধরে এক ধরণের বিচিত্র জীবন-যাত্রার সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। এই বিচিত্র জীবনযাত্রা পরিচিত ভারশূন্যতা বা শূন্য-g' বা মুক্ত পতন। যে সময়ে তাদের মহাকাশ যানটি পৃথিবীর চারিপাশে হাজারবার পরিক্রমা করছে সেই সময়ে তাঁরা যে কোনভাবেই ঘুমাতে পারে। খণ্ডিত তরল গোলকের মত শূন্যে ভাসতে থাকে—শিথিল বস্তুরা কেবিনের মধ্যে ইতঃস্তত ছোটাছুটি করতে থাকে। মানুষেরা এসময় দৈহিকভাবে লম্বা হয়ে যায় ও শরীরের হাড়গুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। এ ধরণের অস্বাভাবিক জীবন আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। একটি মহাকাশ যানের ইঞ্জিনগুলি বন্ধ করে দিলে মুক্ত ভাবে পড়তে থাকবে এবং ওর ওপরে বা এর

মধ্যের কোন জিনিষের ওপর কোন বল ক্রিয়া করে না।

উনবিংশ শতাব্দিতে যখন জুলেভার্ণে ভেবেছিলেন কামানের গোলায় চেপে পৃথিবীর থেকে চন্দ্রে যাবেন তখন তাঁর ভারশূন্যতার কথা চিন্তা করার মত বুদ্ধি ও রসবোধ ছিল। কিন্তু তিনি এর অস্তিত্বের কারণ হিসাবে যা বলেছিলেন তা আইনস্টাইনের পূর্বে আপেক্ষিকতা সম্বন্ধে মানুষের চিন্তাধারার অসম্পূর্ণতাই ইঙ্গিত করে। কেননা ভার্ণে যে ভারশূন্যতার কথা ভেবেছিলেন তা ছিল সমগ্র যাত্রার সামান্য অংশ জুড়ে যেখানে চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সমান ও বিপরীত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র কারণ দিয়েই নয়, পরীক্ষার সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে জুলেভার্ণের ধারণাটিই ভুল। বাস্তব জীবনে চন্দ্রাভিমুখী এ্যাপোলো তার যাত্রাপথের সব অংশ জুড়েই ভারশূন্য। রকেট প্রজ্বলিত হওয়া বন্ধ হয়ে গেলে স্কাইল্যাব, সেলিয়ুট প্রভৃতি সমস্ত মহাকাশ যানের বেলাতে ওপরের কথাগুলি প্রযোজ্য। আইজ্যাক নিউটন ঐ ভুলটি করতেন না। তিনি বুঝতে পারতেন চন্দ্রযান ও তার অংশগুলি মুক্তভাবে পড়ছে। সেটি তখন মাধ্যাকর্ষণের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে কেননা যত তারা পৃথিবী ছেড়ে ওপরে উঠছিল ততই তাদের গতি কমতে কমতে যাচ্ছিল। জুলেভার্ণের গোলায় যে যাত্রী বসে আছে সে হয়ত পৃথিবীর টান বুঝতে পারবে না যেমন আমরা পৃথিবীর ওপরে সূর্যের টান বুঝতে পারি না। এসত্ত্বে পৃথিবী থেকে চাঁদে অদৃশ্য নোঙরের মতন ছড়িয়ে পড়া নিউটনের বলের ধারণা ভার্ণেকে ভুলপথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকেই গতি সম্বন্ধে সাধারণ বুদ্ধির উৎপত্তি। যখন ইচ্ছা হয় তখন মানুষ হাঁটে। তারা যে কোন যানবাহন বা জেট বিমান গন্তব্যস্থলের দিকে চালনা করে। তারা দেখতে পায় উপত্যকা দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে— যে কোন দিক থেকেই বাতাসের গতিবিধি। পাখীরা আকাশে উড়ছে। মাছেরা জলের মধ্যে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। মাকড়সা বা আরোহীরা দড়ি দিয়ে ওপর নীচ করছে, মহাকাশ যান চন্দ্রে পৌঁছে যাচ্ছে। মনে হয় যে প্রতিটি জিনিষ স্বাধীনভাবে পছন্দমত গতিবেগ নিয়ে নির্দিষ্ট দিকে ধাবিত হচ্ছে কিন্তু এসবই ভ্রান্ত অনুভূতি মাত্র। যদি মানতে রাজি থাকা যায় তবে একথাটা ঠিক যে একটি খাঁচায় ছুটোছুটি করছে এমন একটি ইঁদুরের যা অবস্থা একটা উড়োজাহাজেরও সেই অবস্থা।

ওপরে বর্ণিত ভ্রমণকারীদের একজনকে কিংবা সবাইকে বায়ুশূন্য চন্দ্রের পর্বত-চূড়ার ধারে নিয়ে আসা হলো। মুহূর্তের মধ্যে তাদের মাথা নিচের দিকে হয়ে যাবে এবং সংঘবদ্ধভাবে পড়তে থাকবে যেমনটি ঘটে ভারহীন মহাকাশযানে। তাদের গতিবেগ একই হারে পরিবর্তিত হবে এবং ঠিক একই সঙ্গে তারা নীচে পড়বে। তারা

তাদের পড়া সম্বন্ধে সচেতন কিনা বা ভারী কি হালকা কিনা এসব কোন কিছুই আসে যায়না। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে তৈরী অদৃশ্য এক এসকেলেটরে তারা এক সঙ্গে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। এসব তথ্য গ্যালিলও ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, নিউটন ধাঁধায় পড়েছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সাহায্যে কেন বায়ুশূন্য স্থানে সকল বস্তু একই গতিতে পড়ে তার একটি সরল ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

এদিকে আবার চন্দ্র নিজে নিয়মিতভাবে পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে এমনভাবে যেন একটি অদৃশ্য ট্রাম লাইন বসানো আছে। পৃথিবী ও তার সহচর চন্দ্র সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। সূর্য আবার তাঁর সকল সাথীদের নিয়ে সেকেণ্ডে ১৭৫ মাইল বেগে গ্যালাক্সির কেন্দ্রের চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি গ্যালাক্সি আবার অপর একটি গ্যালাক্সির চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। মহাশূন্যে মাধ্যাকর্ষণের ফলে আমরা যে পরিমাণ পথপরিক্রমা করি তার তুলনায় পৃথিবী বা চন্দ্রে আমরা ইচ্ছামত যে পথপরিক্রমা করি তা অনেক কম। মাধ্যাকর্ষণ সমগ্র বিশ্বকে চালনা করে। কিন্তু আইনস্টাইনের বক্তব্য অনুযায়ী মাধ্যাকর্ষণ বলের মাধ্যমে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে না। যুক্তির মাধ্যমে এর প্রতিষ্ঠা। স্থানকালের মাঝে সুবিধাজনক পদযাত্রার মধ্যেই এই অপরিহার্য যুক্তিগুলি আত্মগোপন করে আছে।

নিউটনের পুরানো মাধ্যাকর্ষণ বা আইনস্টাইনের নতুন মাধ্যাকর্ষণ কোনটাকে গ্রহণ করা হবে তা কোন বিশেষ পছন্দ বা উপলব্ধির ব্যাপার নয়—সম্পূর্ণ পরীক্ষা-নির্ভর। যদিও কিছু কিছু শর্তে তারা মাধ্যাকর্ষণের ফল সম্বন্ধে একেবারে এক ফল দেয় কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় তারা কোন কোন ঘটনার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে। উপরন্তু নিউটনের তত্ত্বে যে সব জিনিষ স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না আইনস্টাইনের তত্ত্ব তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যত বাণী করে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে অনেক মানুষ আজও নিউটন প্রদত্ত ফরমুলা-গুলিই ব্যবহার করে। কিন্তু নিউটনের তত্ত্ব নিশ্চিতভাবে অপ্রমাণিত হয়েছে এবং যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নির্ভুল।

অত্যন্ত মনযোগী একজন পাঠকের পক্ষেও তৎক্ষণাৎ আইনস্টাইনের ব্যাখ্যা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই অবস্থায় আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মূল ধারণাগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার সহায়তা করতে পারে। যদিও এতে সমস্ত অপরিচিত বিষয়গুলির আরও ব্যাখ্যা, বিশদ আলোচনা এবং পরীক্ষার সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন।

মাধ্যাকর্ষণ সময়কে মন্থর করে দেয়। পৃথিবী বা সূর্যের দেহে ঘড়ি কম শক্তি নিয়ে (অর্থাৎ ধীর গতিতে) চলে অথচ শূন্যে অবস্থিত ঘড়িগুলির গতি অতি দ্রুত।

একটি বস্তু যেমন একটি আপেল যদি পৃথিবী পৃষ্ঠের ওপরে থাকে তখন মনে হয় তার শক্তি কম কিন্তু উঁচুতে, যেমন গাছের ওপরে আপেলটির শক্তি অনেক বেশী।

মুক্তভাবে পতনশীল একটি আপেলের ওপর কোন বল ক্রিয়া করে না। সেই কারণে তা কোন শক্তি লাভ করতে বা হারাতে পারে না। কিন্তু আপেলটি যখন এমন একটি জায়গায় প্রবেশ করে যেখানে ঘড়ি স্লো যায় সেখানে তার শক্তি পরিবর্তিত হবে। সেই কারণে একটি আপেল পড়লে গতিবেগ বাড়বে। তারপর আপেলটি এক সময় মাটিকে আঘাত করবে। এতে তাকে গতিশক্তি ছেড়ে দিতে হবে।

পুরো কাহিনীটা কিন্তু অতখানি সরল না। আলোর গতিবেগ দূরত্ব ও সময়ের মধ্যে একটি মৌলিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। ঘড়ি স্থানকে প্রভাবিত না করে চলতে পারে না। এমনকি আলো পর্যন্ত বাঁকা পথে চলে। স্থান ও কালের বিচ্যুতি একে অন্যকে বর্ধিত করে এবং অদৃশ্য যাত্রাপথ রচনা করে। এই যাত্রাপথ বরাবর শক্তিবিহীন বস্তুগুলি ঘুরে বেড়ায় যেমন—চাঁদ পৃথিবীর চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংক্ষেপে, একটি ভারী বস্তু তার চারিপাশে সময় ও স্থানের বিচ্যুতি ঘটায়। এই বিচ্যুতিই তার নিকটবর্তী স্থানে অন্যান্য বস্তুদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে।

আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সারাংশে ঘড়ি ও সময়ের বারংবার উল্লেখ পাঠকদের মনে নিশ্চিতভাবে সময়ের চরিত্র সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তুলবে। মনের মধ্যে নানান প্রশ্নের উদয় হবে, লেখকের অভিজ্ঞতায় এই সব প্রশ্নগুলিই আপেক্ষিকতাবাদ বোঝার পথে বিরাট বাধা। একটি ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে তা বুঝতে গিয়ে যদি কিভাবে পরিবেশ দূষণ করে সেই প্রশ্নটি এসে পড়ে তাহলে আলোচনাটি বিঘ্নিত হয়। আপেক্ষিকতাবাদের আলোচনায় সময়ের প্রশ্নটিও অনেকটা সেই রকম। এটি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মূল মন্ত্রগুলি তুলে ধরে না। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্বগুলি কিভাবে পরীক্ষিত হচ্ছে তা আমরা আগে বলে নেব।

সময় সম্বন্ধে সাধারণ প্রশ্নগুলির আলোচনা স্থগিত রাখার উদ্দেশ্যকে সহায়তা করবে এই সত্যটি যে আলোচনার স্বার্থে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়রক্ষক হচ্ছে পারমাণবিক ঘড়ি। পরমাণু কি চরিত্র দেখায় বা তাদের সময় গণনার ব্যাপারটি কি ভাবে মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা প্রভাবিত হয় সে সব সম্বন্ধে পাঠকের মনকে সব সময় খোলা রাখতে হবে। পারমাণবিক ঘড়ির তারতম্য আমাদের সময়ের ধারণাকে বা সময় সংক্রান্ত অভিজ্ঞতাকে কি গভীর ভাবে প্রভাবিত করে তা আলাদা পরিচ্ছেদে আলোচিত হবে।

১। পারমাণবিক ঘড়ি সমতলে মন্থর যায় কিন্তু ওপরে থাকলে দ্রুত গতি হয়।

২। মাধ্যাকর্ষণ আলোকে গ্রাস করে কৃষ্ণ গহবরের সৃষ্টি করতে পারে।

৩। কৃষ্ণগহবরের সামনে সময় নিশ্চল।

৪। সময় মন্থর হয়ে গেলে আলো বা বস্তুর শক্তি কমে যায়।

৫। একটি পতনশীল আপেল স্থিরশক্তি হারিয়ে গতিশক্তি লাভ করে।

একটি আমেরিকান বিমান আমেরিকার চিসাপিক উপত্যকায় কুড়ি মাইল দীর্ঘ একটি ক্লান্তিকর চক্রাকার আবর্তনে পনেরো ঘণ্টা ধরে ঘুরেছিল। এই বিমানের মধ্যে এমন একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষা চালানো হচ্ছিল যার সাহায্যে মাধ্যাকর্ষণ ও সময়ের ওপরে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আইনস্টাইনের ভবিষ্যতবাণী প্রমাণ করা যায়। এই পরীক্ষার একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। এই কারণে যে এর দ্বারা সময়ের ওপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সকল সন্দেহের নিরসন ঘটেছিল। প্রকৃতপক্ষে বিশিষ্ট তাত্ত্বিকবিজ্ঞানী হুইলার এই পরীক্ষার সঙ্গে ১৫৯০ সালের গ্যালিলিওর সেই বিখ্যাত পরীক্ষাটির তুলনা করেছিলেন যা দীর্ঘদিনের একটি প্রচলিত ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করেছিল। এই ধারণাটি হলো বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন গতিবেগ নিয়ে নিচে পড়ে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ সম্পূর্ণ করার কিছু আগে ১৯০৮ সালে আইনস্টাইন এই ধারণাটি প্রবর্তন করেন যে মাধ্যাকর্ষণ ঘড়ির সময়ের তারতম্য ঘটাবে। কিন্তু ১৯৭০ সালেও কিছু কিছু সমালোচক এর বিরোধিতা করতে সচেষ্ট ছিলেন। চিসাপিকের পরীক্ষা (যার মধ্যে ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে পাঁচটি পরিক্রমা সংশ্লিষ্ট) নিশ্চিতভাবে তাঁদের সবাইকে নীরব করে দিয়েছে।

পরীক্ষাটি খুব সরলভাবে দেখাতে সক্ষম হলো যে পর্যবেক্ষক কোন স্থানে আছে তার ওপর সময় নির্ভর করে। শুধু তাই নয় মাটিতে ঘড়ি মন্থর হয়ে যায় এবং বিমানে উড়ন্ত অবস্থায় দুর্বল মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে দ্রুত চলে। এই পরীক্ষায় অনেকগুলি সূক্ষ্ম পারমাণবিক ঘড়ি সমবেতভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এদের মধ্যে তিনটি ছিল সিজিয়াম ঘড়ি। তিনটি রুবিডিয়াম ঘড়ি। কম্পন, চাপের পরিবর্তন, উষ্ণতা ও চুম্বকত্ব প্রভৃতির হাত থেকে অতি সতর্কতার সঙ্গে এদের রক্ষা

করা হয়েছিল। প্রতিটি উড্ডয়ণের সময় একগুচ্ছ ঘড়ি বিমানের মধ্যে ছিল আর অপরগুচ্ছ ছিল মাটিতে।

প্রায় তিন মিনিট অন্তর লেসার রশ্মির সাহায্যে আকাশে ও মাটিতে রাখা ঘড়িগুলো দ্বারা নির্দেশিত সময় মাপা হলো। দুটি ঘড়ির মধ্যে সময় তুলনা করার জন্য আইনস্টাইন যে পদ্ধতির কথা বলেছিলেন তাই মেনে চলা হলো। যখন বিমানটি ৩০,০০০ ফিট ওপরে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছিল তখন বিমানের মধ্যেকার ঘড়িগুলোর সময় প্রতি ঘণ্টায় এক সেকেণ্ডের তিন বিলিয়ন ভাগ বাড়ছিল। রাডারের সাহায্যে বিমানের কক্ষপথ পরিমাপ করা হচ্ছিল যাতে গতির জন্য প্রয়োজনীয় ত্রুটি ঠিক করে নেওয়া যায়। বিমানটির গতি ঘড়িগুলোকে সামান্য পরিমাণে মন্থর করে দিচ্ছিল। এই মন্থর হয়ে যাবার কারণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। উচ্চতার জন্য ঘড়ির লয় বেড়ে যাওয়া আইনস্টাইনের ভবিষ্যতবাণীকে প্রমাণিত করল। সমস্ত ব্যাপারটি চোখের ভুল নয়, কেন না বিমানটি নামার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাগুলি অদৃশ্য হয়ে গেল না। প্রতিবার কক্ষপথ পরিক্রমার শেষে বিমানের ঘড়িগুলির মাটিতে রাখা ঘড়িগুলোর মধ্যে তুলনা করা হলো। দেখা গেল বিমানের ঘড়িগুলো এক সেকেণ্ডের ৫০ বিলিয়ন ভাগের একভাগ এগিয়ে আছে।

১৯৭৬ সালের জুন মাসে ভার্জিনিয়াতে উপরোক্ত পরীক্ষার অনুরূপ একটি পরীক্ষা শুরু হলো। একটি স্কাউট রকেট একটি হাইড্রোজেন মেজার পারমাণবিক ঘড়ি নিয়ে পৃথিবী থেকে শূন্যে পাড়ি দিল। সঙ্গের ঘড়িটি প্রায় ৬০০০ মাইল ওপরে ওঠার পর আটলাণ্টিক মহাসাগরে ফেলা হল। ঘড়ি থেকে বেরিয়ে আসা বেতার সংকেতে বহির্বিশ্বে গতিবেগের জন্য যে পরিবর্তনজনিত ত্রুটি তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করে নেওয়া হলো। দেখা গেল উঁচুতে যতই মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণ কমছে ততই ঘড়িটির লয় বৃদ্ধি পাচেছ। পৃথিবী থেকে ৬০০০ মাইল উঁচুতে সেকেণ্ডের এক বিলিয়ন ভাগ সময় দ্রুত লয় হয়ে গেল। এই পরিমাণ চিসাপিক পরীক্ষালব্ধ ফলের ৭০০ গুণ বেশী এবং আইনস্টাইনের ভবিষ্যতবাণীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উন্মাদ যন্ত্রবিদ মাত্র এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে পৃথিবীকে সংকুচিত করে তাকে একটি কৃষ্ণগহবরে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। পৃথিবী যদি একটি শূন্য গোলক হত যার বুকে আছে সাগর ও পাহাড় এবং কেন্দ্রে আছে কৃষ্ণ গহবর কিন্তু ভর আমাদের পৃথিবীর সমান, তাহলে সেই পৃথিবীর চারিপাশে মাধ্যাকর্ষণের যা বৈশিষ্ট্য হত আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী আমাদের এই পৃথিবীরও মাধ্যাকর্ষণের বৈশিষ্ট্যও সেইরকম।

আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্বটি রচনা করার স্বল্প কাল পরেই জার্মান বিজ্ঞানী

সোয়ারজ চাইল্ড তার একটি কার্যকর ব্যাখ্যা দেন। এটা করতে গিয়ে তিনি কৃষ্ণগহবর সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তার উদ্গাতা হিসাবে খ্যাত হন। যদিও এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে জ্যোতির্বিদেরা কৃষ্ণগহবর সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হন। কৃষ্ণগহবর আছে কি নেই সেটা তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আসে যায় না যেমনি কোন মানে হয় না ইউক্লিডকে এই প্রশ্ন করা যে কোন সম্পূর্ণ ত্রিভুজের অস্তিত্ব আছে কিনা। তর্কের খাতিরেই কৃষ্ণগহবরের সৃষ্টি। আইনস্টাইনের তত্ত্বের প্রধান বক্তব্যে সরাসরি পেঁছুতে গেলে আগে কৃষ্ণগহবরের ধারণাটি সম্বন্ধে পরিচিত হতে হবে। কোনো ভুল বোঝাবুঝি পরিত্যাগ করার জন্য একথা বলে রাখা ভাল যে সোয়ারজ চাইল্ড পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কৃষ্ণগহবরের চিন্তা করেছিলেন তা গাণিতিক কল্পনা মাত্র।

একটি কৃষ্ণগহবর সৃষ্টি করতে গেলে যা সবচেয়ে প্রয়োজন তা হলো আলোর ওপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ল্যাপলাস এমন ভারী নক্ষত্রের কথা ভেবেছিলেন যা নিজের সুতীব্র মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিজস্ব আলো আটকে দিতে পারে। যখন আইনস্টাইন দেখালেন যে $E=mc^2$ ফরমুলা অনুযায়ী আলোর ভর আছে তখন এটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল যে আলো মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা প্রভাবিত হবে যেমনটি ঘটে একটি পাথরকে ওপরে ছুঁড়ে দিলে। তীব্র মাধ্যাকর্ষণ কৃষ্ণগহবর সৃষ্টি করবে যার কাছ থেকে আলোও পর্যন্ত নিষ্কৃতি পাবে না।

কোন দূরবর্তী বস্তু যেমন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে গ্রহ বা নক্ষত্রের দিকে ধাবিত হয় তেমনিভাবেই তারা কৃষ্ণগহবরের দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবী বা সূর্যের মতন কৃষ্ণগহবরও গোলাকার এবং এর একটি কেন্দ্র আছে। এর ফলে মহাশূন্যের যে কোনো দিক থেকে এর চারিপাশে পরিভ্রমণ করা যায় এবং এর সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো যায়। গ্রহ বা সাধারণ নক্ষত্রের চেয়ে কৃষ্ণগহবরের তফাৎ হলো এই যে একবার কৃষ্ণগহবরের মধ্যে কোনো কিছু পড়লে তা আর বেরিয়ে আসতে পারে না। আলো যদি বেরিয়ে আসতে না পারে তাহলে আর কিছুই পারবে না এবং এটি তখন বিরাট ফাঁদের মতন হবে। এই ফাঁদটি কিন্তু কৃষ্ণ গহবরের একেবারে কেন্দ্রে নয়, তার থেকে কিছুটা দূরে।

একটি কৃষ্ণগহবরের ভর যদি পৃথিবীর সমান হয় তাহলে কেন্দ্র থেকে চাঁদের দূরত্বটি হবে এক ইঞ্চির তিন ভাগের এক ভাগ। সূর্যের সমান ভর হলে এই দূরত্ব গিয়ে দাঁড়াবে দুই মাইল। কেন্দ্রকে ঘিরে যে ভয়ংকর প্রভাবশালী গোলকটি আছে দুই মাইল হবে তারই ব্যাসার্দ্ধ। পদার্থ বিজ্ঞানী এই বিশেষ অংশের ত্বককে 'ঘটনা দিগন্ত' বলে আখ্যা দেন কেন না বাইরের থেকে দেখলে এই দিগন্তের পরে আর কোন ঘটনাই অবলোকন করা যাবে না। পৃথিবীর ত্বকে যেমন পর্বতমালা বা

সমুদ্র আছে সেখানে কিন্তু তেমন কিছুই নেই। কৃষ্ণগহ্বরের ত্বক মহাশূন্যে বিরাজমান, যদি কেউ তা অতিক্রম করে তবে সে আর ফিরে আসবে না।

চিন্তা করা যাক একটি সাহসী আলোক কণা কৃষ্ণগহ্বর থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। কণাটি থেমে যাবে যেমন করে মাছি, মাছি ধরার কাগজে আটকে যায়। যদি মাধ্যাকর্ষণ আলোকে প্রভাবিত না করে তাহলে আলোর কণাকে মনে হবে ক্রমাগত সরে যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্তে শক্তি হারাচ্ছে। একটি শক্তিহীন রকেট যেমন ফিরে আসে ঠিক সেইরকমভাবে আলোও কৃষ্ণগহ্বরের দিকে দিকে যাবে। কিন্তু বস্তুত পক্ষে আলোর কণাটি কিন্তু নির্বিকার। সে শক্তি হারাচ্ছে না বা লাভ করছে না—সামনে এগুচ্ছে না আবার পিছনের দিকে পড়েও যাচ্ছে না। মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপারে আইনস্টাইন ও নিউটনের দৃষ্টিভঙ্গীর মূলগত তফাৎ হলো যে, যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ আলোকে প্রভাবিত করে সেহেতু সময়কেও প্রভাবিত করে। চলমান সময় বলে কিছু নেই কেন না বহির্মুখী আলোর মত সময়ও কৃষ্ণগহ্বরের ধারে নিশ্চল হয়ে যায়।

ব্যাপক অর্থে আলো তথা কম্পন সংখ্যা সময় নির্ধারণের ব্যাপারে বিশ্বস্ত ভূমিকা নিয়ে থাকে যেমন পারমাণবিক ঘড়িতে। এছাড়াও আলো শূন্যে অতিদ্রুত গতিতে পরিভ্রমণ করে তার কম্পনকে সঙ্গে করে। এর অর্থ হলো যে কেউ অতি সহজে দূরে রাখা পারমাণবিক ঘড়ি কেমন সময় দিচ্ছে তা পরীক্ষা করতে পারেন। যে কেউ তার সহচরকে ডেকে তার দিকে এক সেকেন্ড অন্তর অন্তর আলোর ঝলক পাঠাতে বলতে পারেন। এই সেকেন্ডের পরিমাপ করা হবে পারমাণবিক ঘড়ির হৃৎস্পন্দনের সাহায্যে।

এখন কল্পনা করা যাক যে একজন নভোচর একটি কৃষ্ণগহ্বর থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থিত আছেন। সে কৃষ্ণগহ্বরের ত্বকে রাখা একটি পারমাণবিক ঘড়ি থেকে একটি সংকেত আসার জন্য অপেক্ষা করে আছে। বৃথাই তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে কেন না সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন সংকেতই তাঁর কাছে এসে পৌঁছুতে পারে না। সে এমন সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে ঘড়িটি বন্ধ হয়ে গেছে। সে এমন একটি সন্দেহও করতে পারে যে ঘড়িটি কৃষ্ণগহ্বর গ্রাস করে নিয়েছে। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বরের বাইরের অবস্থিত কোন পারমাণবিক ঘড়ির কথাই ভাবা ভাল। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব কৃষ্ণগহ্বরের ত্বকে হঠাৎ করে জাগরূক হয় না বরং তার দিকে এগুতে থাকলে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

দূরবর্তী কোন নভোচর দ্বারা চালিত একটি পারমাণবিক ঘড়ি কৃষ্ণগহ্বরের কাছে গেলে মন্থর হয়ে চলবে। ধরা যাক ঘড়িটি এমনভাবে তৈরী যাতে প্রতি সেকেন্ডে সে একটি সাদা আলোর সংকেত পাঠাতে পারে। নভচরের কাছে যদি

অপর একটি অনুরূপ ঘড়ি থাকে তাহলে দু ধরণের জিনিষ ঘটতে পারে। কৃষ্ণগহবরের কাছে অবস্থিত ঘড়ি থেকে সংকেতের হার কমে যাবে অর্থাৎ—যেমন প্রতি সেকেণ্ডে একটি না হয়ে প্রতি দু' সেকেণ্ডে একবার। দ্বিতীয় আলো সাদা না দেখিয়ে লাল বলে মনে হবে। আলোর রং কম্পন সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। আলোর সংকেত পাঠাবার হার অর্ধেক হয়ে গেলে আলোর কম্পন সংখ্যাও পালটে যাবে। সাদা আলো হচ্ছে নীল আলো ও লাল আলোর সংমিশ্রণ। এখানে নীল আলোর কম্পন সংখ্যা লাল আলোর দ্বিগুণ। এরকম কম্পন সংখ্যার পরিবর্তনের ফলে লাল আলো হয়ে যায় অদৃশ্য অতি লাল এবং নীল আলো হয়ে যায় লাল।

যখন আইনস্টাইন ঘোষণা করেন যে আলো কণার সমষ্টি তখন তিনি এটা ধরে নিয়েছিলেন প্রতিটি কণার শক্তি তার কম্পন সংখ্যার সমানুপাতিক। সুতরাং নভোযাত্রীর দৃষ্টিতে কৃষ্ণগহবরের কাছ থেকে যেসব আলোক কণা বেরিয়ে আসছে তারা শক্তি হারাচ্ছে। এখন নিউটনের ভাবধারায় বিশ্বাসী কোন বিজ্ঞানী যদি জানতেন (১) আলো একটি ভারী বস্তু (২) কোন আলোক কণার শক্তি কম্পন সংখ্যার ওপর নির্ভর করে তাহলে তিনি রঙের পরিবর্তনের ব্যাপারটি ভবিষ্যতবাণী করতে পারতেন। কৃষ্ণগহবর থেকে যত ওপরে উঠে আসবে (যেমন করে একটি রকেট নিউটনের মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করতে সংগ্রাম করে) ততই আলো শক্তি হারাবে এবং তত লাল হতে থাকবে।

মাধ্যাকর্ষণের নতুন ও পুরাতন দুটি তত্ত্বই এ ব্যাপারে একমত কিন্তু দুটির ব্যাখ্যা ভিন্ন। বার্লিনের একটি বাড়ীর ছাদ থেকে পড়ন্ত মানুষটির কথা ভাবা যেতে পারে। আইনস্টাইনের মতে লোকটি কোন মাধ্যাকর্ষণ জনিত বল, অনুভব করে না। অনুরূপভাবে কৃষ্ণগহবরের কাছ থেকে সরে আসছে এমন কোন আলোক কণা কোন মাধ্যাকর্ষণজনিত বল অনুভব করবে না—তার পথ পরিক্রমায় সে কোন শক্তি ক্ষয় করে না। তাহলে যদি আলো লাল দেখায় তবে তার কারণ হলো শুরুতেই তা লাল ছিল। এর কারণ হলো পরমাণু বা পরমাণু ঘড়ি কৃষ্ণগহবরের কাছে ধীর গতিতে চলে। নিউটনীয় তত্ত্ব থেকে এটা ভবিষ্যৎবাণী করা যাবে না যে পারমাণবিক ঘড়ি থেকে এক সেকেণ্ড অন্তর অন্তর আলোক বিচ্ছুরণ নভোচারীর কাছেও কম সংখ্যায় আসবে। আইনস্টাইনের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোর কম্পন সংখ্যার ও ঘড়ির সময়ের হ্রাস পাবার ব্যাপারটি অঙ্গাঙ্গীভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আমরা পরে দেখতে পাব যে আইনস্টাইনের তত্ত্বকে বিচার করার জন্য মানুষের সাধারণ হাতে তৈরী ঘড়ি পারমাণবিক ঘড়ির মতই ব্যবহার করা যাবে।

এর পর মনে করা যাক বিকিরণকারী পারমাণবিক ঘড়িগুলি কৃষ্ণগহবর থেকে

ক্রমান্বয়ে দূরবর্তী স্থানে স্থাপন করা হলো। দূরত্বের ক্রম অনুসারে ঘড়িগুলি ক্রমশঃ দ্রুতহারে চলতে থাকবে। এতে বিকিরণের হারও বাড়তে থাকবে এবং আলো ক্রমশঃ কম লাল হতে শুরু করবে। একটি কৃষ্ণগহবর ক্রমান্বয়ে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত যাদের আমরা 'সময়ের অঞ্চল' আখ্যা দেব। একটি পেঁয়াজের যে স্তরগুলি থাকে এই অঞ্চলগুলি অনেকটা সেইরকম। এক একটি এই ধরণের অঞ্চলে তার ভিন্ন ও নিজস্ব সময়কাল আছে।

এই ঘড়িগুলির সময় হার কি নিয়মে হয়। এর উত্তরে সবচেয়ে সরলভাবে যা বলা যায় যে ধরা যাক্ দূরবর্তী নভোচারীর ঘড়ি সম্পূর্ণ ঠিক অর্থাৎ শতকরা একশো ভাগ। সময়ের হার কমা তাহলে শতকরা হিসাবে করা যাবে। সময়ের হার এক শতাংশ কমে যাওয়া মানে হলো ঘড়িটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সাপেক্ষে শতকরা নিরানব্বই ভাগ হারে চলছে। কমার এই হার সংঘটিত হয় কৃষ্ণগহবরের কেন্দ্র থেকে তার ব্যাসের পঁচিশ গুণ দূরত্বে। পৃথিবীর সমান ভরের কৃষ্ণগহবরের ক্ষেত্রে এই ব্যাসের পরিমাণ প্রায় আঠারো ইঞ্চির মত। সময়ের হার শতকরা এক ভাগ কমাতে গেলে কৃষ্ণগহবরের খুব সন্নিকটে যেতে হবে।

কৃষ্ণগহবরের কাছে ঘড়িদের নিয়মগুলি খুবই জটিল হয়ে পড়ে কিন্তু দূরে গেলে তারাই আবার নিতান্তই সরল। কৃষ্ণগহবর থেকে দ্বিগুণ দূরে গেলে ঘড়ি অর্ধেক মন্থর হয়ে যায়। উদাহরণ হিসাবে পৃথিবীর আকারের একটি কৃষ্ণগহবর থেকে ছত্রিশ ইঞ্চি দূরে ঘড়ির মন্থর হয়ে যাওয়ার পরিমাণ এক শতাংশের অর্ধেক। আমাদের পৃথিবীর ত্বক কেন্দ্র থেকে ৩৬০ বিলিয়নটি কৃষ্ণগহবরের ব্যাসের যা পরিমাণ সেই পরিমাণ দূরে। এখানে ঘড়ির মন্থরতা দূরবর্তী নভোচারীর ঘড়ির তুলনায় এক বিলিয়ন ভাগের চৌদ্দভাগ—প্রতি বছরে প্রায় সেকেণ্ডের অর্ধেক। মহাশূন্যে চার হাজার মাইলের মতো গেলে মন্থরতা আবার অর্ধেক হয়ে যাবে। ঘড়ির সময়ের হারের মধ্যে তারতম্য খুবই সামান্য। আমাদের পৃথিবীর ত্বককে কৃষ্ণগহবরের চারিপাশে স্থাপন করলে মোটামুটিভাবে তা একটি সময়স্তরের মধ্যে পড়বে যদিও পারমাণবিক ঘড়ি হিমালয়ের চূড়ায় সমুদ্রতলের তুলনায় দ্রুত হারে চলে। মহাকাশ-যানে পারমাণবিক ঘড়ি নিয়ে যে সব পরীক্ষার কথা পরিচ্ছেদের শুরুতে বলা হয়েছে তারা আইনস্টাইনের সময় স্তরের বিস্তারিত ধারণার ওপর আলোকপাত করে।

আমাদের নভোচারী শূন্যে আমাদের থেকে অনেকদূরে কিন্তু এখন সে পৃথিবীর ত্বক থেকে আসা আলো দেখতে পাচ্ছে। যদিও কম্পনসংখ্যা কমে যাওয়া কৃষ্ণ-গহবরের সামনের তুলনায় অনেক কম তবুও লাল হবার ব্যাপারটি কিন্তু সামান্য পরিমাণ হবেই। একে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণজনিত লাল হওয়া বা আইনস্টাইনীয় লাল হওয়া। নভোচারী পৃথিবী থেকে দূরে সরে যেতে থাকলে যে ডপলার এফেক্ট

হবে ওপরের ব্যাপারটি অনেকটা তাই। তবে দুটোর ক্ষেত্রে কারণগুলি কিন্তু আলাদা। মাধ্যাকর্ষণ জনিত লাল সরণ আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য। পদার্থবিদেরা ও নভোচারীরা এটা ভালভাবে পরীক্ষার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই এফেক্টটি প্রতিষ্ঠা করতে তাদের পৃথিবী ছেড়ে যেতে হচ্ছে না। কেন না একটি চূড়ার শীর্ষের চেয়ে পাদদেশে ঘড়ি পরীক্ষাযোগ্যভাবে মন্থর।

১৯৫৯ ও ১৯৬৫ সালে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদেরা আলোক কণার ওপর মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। আলোককণা হিসাবে তারা কেন্দ্রীন থেকে বেরিয়ে আসা গামা রশ্মিকেই ব্যবহার করেছিলেন। বিজ্ঞানী রবার্ট পাউন্ড ও তাঁর সহযোগীরা উঁচুতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গামা রশ্মির শক্তির আপাত হ্রাস লক্ষ্য করলেন। এই আপাতশক্তি হ্রাসকেই আমরা লালের দিকে সরে যাওয়া বোঝাই। এ ধরণের প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ খুবই সামান্য কিন্তু তরুণ জার্মান বিজ্ঞানী মোজবাওয়ারের আবিষ্কারের ফলে প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করা সম্ভব হয়। মোজবাওয়ার আবিষ্কার করেন যে কেলাসের মধ্যে অবস্থিত পরমাণুর কেন্দ্রীন সুনির্দিষ্ট কম্পনসংখ্যা বিশিষ্ট বিকিরণ গ্রহণ করতে বা ছাড়তে পারে। কার্যত তারা এক একটি কেন্দ্রীন ঘড়ি।

ওপরে ও নীচে এধরণের দুটি ঘড়ি নেওয়া হলো যাতে একটি ঘড়ি গামারশ্মি ছাড়লে অপর ঘড়িটি তা গ্রহণ করতে পারে। এভাবে সমন্বিত করতে গিয়ে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকেরা দেখতে পেলেন যে তাঁদের একটি না একটি ঘড়িকে তুলনামূলকভাবে কম গতিবেগ নিয়ে সরাতে হচ্ছে। অন্য কথায় বলতে গেলে তারা ঘড়ি দুটোকে এক করার জন্য গামারশ্মিদের মধ্যে কম্পনসংখ্যার পার্থক্য ডপলার এফেক্টের সাহায্যে পরিপূরণ করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা এক মিলিয়ন বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ তারতম্য পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতে তাঁরা আইনস্টাইনের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী মাধ্যাকর্ষণজনিত লালের দিকে সরণ এক শতাংশের মধ্যে পরিমাপ করতে পেরেছিলেন।

পৃথিবীপৃষ্ঠে মাধ্যাকর্ষণের পরিমাণ বহির্বিশ্বের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু ভারী সূর্যের ত্বকে এর পরিমাণ আরও বেশী। পৃথিবী থেকে সূর্যকে দেখতে যেমন, নভোচারীর দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীও সেই রকম দেখতে। সূর্যের ত্বকে কোন ঘড়ি পৃথিবীর তুলনায় বছরে এক মিনিট মন্থর হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হবে। সূর্যের দেহ থেকে এক নির্ধারিত পরমাণু পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থিত টেলিস্কোপে একটু লাল হিসাবে প্রতিভাত হয় এবং এর কারণই হলো মাধ্যাকর্ষণজনিত লাল সরণ। ১৯৬২ সালে ফরাসী নভোচারীরা ঘোষণা করেন যে তারা এই বিক্রিয়াটির সন্ধান পেয়েছেন।

বৃদ্ধ হয়ে যাওয়া নক্ষত্র যাদের আমরা শ্বেতবামন বলি তাদের বেলাতে মাধ্যাকর্ষণ-এর পরিমাণ খুব বেশী। শ্বেতবামনের দেহে অবস্থান করলে একটি মানুষের ওজন কয়েক টন পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এইখানে লালের দিকে সরণের ব্যাপারটা খুব বেশী হবে যদিও খালি চোখে তা দেখা যাবার পক্ষে খুবই কম হবে। বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে নভোচারীরা শ্বেতবামন নক্ষত্রে লাল আলোর দিকে সরণ নির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করেছেন। মাধ্যাকর্ষণের দরুণ লালের দিকে সরে যাওয়া ও নক্ষত্রদের গতিবিধির জন্য ডপলার বিক্রিয়াজনিত লালের দিকে সরে যাওয়া, এ দুটি যাওয়ার পৃথকীকরণ খুবই কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বিশিষ্ট আমেরিকান জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রীনষ্টাইন তাঁর সঙ্গী বো কসেন-বার্গের সঙ্গে লণ্ডন থেকে কতকগুলি পত্র প্রকাশ করেন। এতে বারোটির বেশী শ্বেত বামনের বর্ণালীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। গড়পড়তা হিসাবে দেখা গেল যে আপাত দৃষ্টিতে পারমাণবিক সময় শ্বেতবামনের সন্নিকটে বছরে প্রায় একঘণ্টা মন্থর হয়ে যাচ্ছে।

একটি ভারীবস্তুর চারিপাশে সময়ের ভিন্ন ভিন্ন স্তর থাকাটা একটি প্রকৃত ঘটনা। আলোর লালের দিকে সরণও পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে বিচার করা যায়। পৃথিবীতে ফিরে আসলে দেখা যাবে সময় উঁচু জায়গার তুলনায় সমতলে অনেক মন্থর গতিতে চলে। একটি আপেল মাটিতে পড়লে কি হয় তা আমরা দেখতে সক্ষম। নিউটনের বক্তব্য ছিল যেহেতু মাধ্যাকর্ষণ বল আপেলটিকে টানছে সেইহেতু তা নীচের দিকে ত্বরিত হয়ে যাচ্ছে। আইনস্টাইনের বক্তব্য কিন্তু একেবারেই ভিন্ন।

তীব্র মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে পরমাণু, পারমাণবিক ঘড়ি এবং আলো এরা সবাই ধীরগতিতে কম্পিত হয়। শক্তি ও কম্পনসংখ্যার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকার দরুণ তারা মাধ্যাকর্ষণের আওতা থেকে দূরে বেশী শক্তিসম্পন্ন হয়। একটি আপেল অনেকগুলি পরমাণু দিয়ে তৈরী, গাছে থাকা অবস্থার চেয়ে মাটিতে থাকলে কম শক্তি নিয়ে থাকে। আইনস্টাইনের সমীকরণ $E=mc^2$ এর আলোকে গাছে আপেলটির স্থিরশক্তি কমে যায়।

চিন্তা করা যাক একটি আপেল গাছে ঝুলছে। এইবার ধরা যাক বোঁটা ছিঁড়ে যাওয়াতে আপেলটি পৃথিবীর কেন্দ্রে একটি কাল্পনিক কৃষ্ণগহ্বরের দিকে এগুতে শুরু করল। এটা করতে গিয়ে তাকে মন্থর সময়স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। আপেলটির সম্পর্কে এইটিই বলা চলে যে তার ওপর কোন বল ক্রিয়া করে না। অথচ সে ক্রমান্বয়ে গতি লাভ করতে থাকে। এরকমটি হবে কেন?

যেহেতু আপেলটির ওপরে কোন বল ক্রিয়া করে না সেহেতু সে শক্তিলাভ করতে

বা হারাতে পারে না। একটি মন্থর সময়স্তরের মধ্যে প্রবেশ করে সে তার স্থিতিশক্তি হারায়। সুতরাং সামগ্রিক শক্তি বজায় রাখতে তাকে অন্য শক্তি উৎপাদন করতে হবে। একটি আপেল তার রঙ পরিবর্তন করে তার শক্তি বজায় রাখতে পারে না। এর স্থিতিশক্তি ক্ষয় পরিপূরণের একটি মাত্র রাস্তা হলো মন্থর সময়স্তরের মধ্যে গতি বৃদ্ধি করে—ক্রমান্বয়ে তার গতি শক্তি বাড়তেই থাকবে। সমগ্র শক্তি বজায় রাখতে গিয়ে আপেলটি ক্রমাগত গতিবৃদ্ধি করতে ত্বরিত হবে। ত্বরণের হার নিউটনের ধারণা অনুযায়ী হবে ৩২ ফুট প্রতি সেকেণ্ডে।

স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির মোট যোগফল একটি পড়ন্ত আপেলের বেলাতে অপরিবর্তিত থাকবে। এ কথাটি বলার পেছনে অতি সরলীকরণের প্রয়াস আছে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু ব্যাপারটি অতটা সরল নয়—কারণ সব জিনিসটাই নির্ভর করবে, কে কোন শক্তি, কি ঘড়ির সাহায্যে পরিমাপ করছে। এ পর্যন্ত যা বলা হলো তাতে একটি কৃষ্ণ গহ্বরের কাছে বা পৃথিবীর কাছে পড়ন্ত বস্তুর স্থিতিশক্তির ক্রমিক নিঃসরণ কিভাবে ঘটছে তা বোঝা যাবে।

নির্দেশিত ভবিষ্যত

১। আলো ভারী এবং মাধ্যাকর্ষণের ফলে এর গতিপথ বেঁকে যায়।
২। আলোর গতিপথ বেঁকে যাওয়ার অর্থ হলো মাধ্যাকর্ষণ মহাশূন্যকে বক্র করে দেয়।
৩। শক্তিবিহীন বস্তু বক্র স্থানে সরল পথে যায়।
৪। মাধ্যাকর্ষণ আলোর ওপরে ক্রিয়া করে সময়ের দিক নির্দেশ করে।
৫। একটি ভারী ঘূর্ণায়মান বস্তু সঙ্গের স্থানকে টেনে নেয়।

যদি কোন মাধ্যাকর্ষণ জাতীয় নিয়ন্ত্রণকারী বল না থাকে তাহলে একটি পড়ন্ত আপেল কিভাবে বুঝবে সে কোন দিকে যাবে? এর পক্ষে বিভিন্ন দিকে গতিবেগ মাপার কোনো উপায় নেই। এমন কোন উপায়ও নেই যে বলে দেবে কোনটি নিচের দিক। কিন্তু দ্বিধাহীনভাবে সে অদৃশ্য এসকালেটরে চড়ে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়। পৃথিবীর মত একটি ভারী বস্তু স্থান ও কালকে বক্র করে দেয় এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই ব্যাখ্যাটি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে স্থানের বৈকল্যকে বোঝাতে বক্রতা শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

ওপরের কথাটির সবচেয়ে সরল অর্থ হলো যে আলো সরলরেখায় পরিভ্রমণ করে না। যেহেতু আলোর শক্তি আছে এবং যেহেতু তা মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা প্রভাবিত তাই আইনস্টাইনের তত্ত্বে আলো আর সব বস্তুর মত পৃথিবীর দিকে পড়বে। আলো এত দ্রুতগতিতে চলে যে আলোর উপরোক্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা খুবই শক্ত কাজ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে যদি পৃথিবীর দিগন্তের দিকে একটি লেসার রশ্মি মুক্ত করা যায় তাহলে তা শূন্যে বিলীন হয়ে যাবার আগে চার হাজার মাইল যাত্রাপথে এক ইঞ্চির এক তৃতীয়াংশ মাত্র নীচে পড়বে। আলোর এধরণের ব্যবহার জ্যামিতির প্রাচীন ধারণাকে বিশেষভাবে আহত করে।

একটি কৃষ্ণগহ্বরের কাছে আলোর বেঁকে যাওয়ার ব্যাপারটা এত বেশী স্পষ্ট যে তা চাক্ষুষ দেখা যায়। সাধারণভাবে বিচার করলে কৃষ্ণ গহবরের পেছনে ঢাকা পড়া বস্তুরা অপর দিকে দৃশ্যমান হবে। বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রধানত আলোর সরলরেখা গতির ওপর নির্ভর করে আছে। উদাহরণ স্বরূপ পৃথিবীতে যে দেওয়ালটিকে আমরা সোজা দেখি একটি কৃষ্ণগহবরের সামনে কিন্তু তা বাঁকা দেখা যাবে। জ্যামিতির প্রচলিত ধারণাগুলিকে আর কাজে লাগানো

যাবে না। এটা সহজ হতো যদি কেউ বলতে পারত যে আলোর দ্বারা অনুসৃত কোন রেখা বক্র তলে সরলরেখার সংজ্ঞা দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আইনস্টাইনের তত্ত্বে কিন্তু তেমনটি হয় না। আলো বেঁকে যাওয়ার অর্ধেক ঘটে সময়ের ওপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের জন্য। সুতরাং আলোর রেখা দেখে স্থানের বক্রতার অর্ধেক অংশমাত্র অনুধাবন করতে পারা যায়।

শূন্যস্থানের বক্রতার আরেকটি লক্ষণ আছে। একটি ভারী বস্তুর ত্বকের ক্ষেত্রফল তার ব্যাসার্ধ পরিমাপ করেও ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুযায়ী $4\pi r^2$ ফরমুলার সাহায্যে গণনা করলে যে ফল পাওয়া যায় তার চেয়ে কম হবে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে ক্ষেত্রফলের তুলনায় ব্যাসার্ধটি খুবই বড় এবং এই অতিরিক্ত ব্যাসার্ধ বস্তুটির ভরের সমানুপাতিক। পৃথিবীর বেলাতে এই অতিরিক্ত ব্যাসার্ধ এক ইঞ্চির ছশো ভাগের একভাগ। এর মানে হলো ভূত্বকের ক্ষেত্রফল আমরা যা হিসাব করব তার থেকে প্রায় ষাট একর কম। সূর্যের বেলাতে এই অতিরিক্ত ব্যাসার্ধ প্রায় পাঁচশত গজ এবং হারানো ক্ষেত্রফলের পরিমাণ প্রায় ৩.৪ বিলিয়ন বর্গ মাইল যা মোটামুটিভাবে আমেরিকা মহাদেশের সমান।

একটি রবারের আবরণ দিয়ে একটি তলের সৃষ্টি করে তার থেকে শূন্যস্থানের বক্রতার উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে। প্রথমে রবারের আবরণ বিস্তৃত করে তাতে বিভিন্ন ধরণের ওজন লাগিয়ে দেওয়া হলো। এইসব ওজন হলো আকাশের নক্ষত্র গ্রহ বা কৃষ্ণ গহবরের প্রতিনিধি। এইসব ওজনগুলি রবারের অংশটিকে বিকৃত করবে। আমরা তখনই বলি যে এই নমুনায় সমতল রবারের পাতটি আর সমতল থাকছে না এবং এই অবস্থায় এর দ্বারা ত্রিমাত্রিক স্থানের একটি দ্বিমাত্রিক সংস্করণ পাওয়া যেখানে খাঁজগুলি বক্রতা নির্দেশ করে।

এই ধরণের একটি নমুনা কল্পনার সহায়ক। যদি একটি মহাকাশযানকে বা চন্দ্রকে রবারের আস্তরণের ওপরে গড়িয়ে যাওয়া একটি বলবিয়ারিং-এর সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে তা একটি বক্রপথ অবলম্বন করবে ও ভারী বস্তুর দিকে বাঁক নেবে যেমন প্রকৃত কোন বস্তুর বেলাতে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে যা ঘটে। এটি সঠিকভাবে আরেকটি ধারণা দেয় যাতে মনে হয় যেন শূন্যস্হান ব্যাসার্ধ বরাবর একটি ভারী বস্তুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—একেই আমরা অতিরিক্ত ব্যাসার্ধ বলি। কৃষ্ণগহবরের ক্ষেত্রে এই বিকৃতির পরিমাণ খুবই বেশী। কিন্তু দুটি অসুবিধা আছে। একটি হলো যে মডেলটি, যা ঘটছে তার কেবল অর্ধেক অংশই প্রতীয়মান করে এবং দ্বিতীয়ত এতে সময়ের শ্লথ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি বোঝা যায় না।

বড় অসুবিধা হলো এই যে শূন্যস্হান, বিস্তৃত একটি রবারের অংশমাত্র নয়। মানসিকভাবে রবারের ধারণা থেকে প্রকৃত ত্রিমাত্রিক বক্রস্হানের কল্পনা করা খুবই

শক্ত কাজ। এমন কি গণিতবিদেরাও পর্যন্ত বক্রশূন্যস্থানের কল্পনা করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। যাই হোক আপেক্ষিকতাতত্ত্ববিদ্‌দের এই বক্রতা বোঝা বা পরিমাপ করা তুলনামূলকভাবে সহজ কাজ। রবারের পাতটি কল্পনার পক্ষে ভাল সহায়ক।

"আলোক বুদবুদ্‌" আরেকটি ভাল সহায়ক। এর সাহায্যে কিভাবে স্থান ও সময় কৃষ্ণগহবর কিংবা ভারী বস্তুর সামনে বক্র হয়ে যায় তা বোঝা যায়। একটি মহাকাশযানের কথা ভাবা যাক্‌ যার মধ্য থেকে চারিদিকে আলো বেরুতে পারে। মহাকাশযানটি তখন একটি তারার ক্ষুদ্র সংস্করণ। কোন মুহূর্তে আলো বেরিয়ে পরমুহূর্তে দূরবর্তী স্থানে পেঁাছে যাবে। এর ফলে মহাকাশযানের চারিপাশে একটি আলোর বুদবুদ সৃষ্টি হবে। উদাহরণ স্বরূপ, যদি মুহূর্ত বলতে এক সেকেণ্ডের এক মিলিয়নভাগ হয় তাহলে আলোর বুদবুদের ব্যাসার্ধ হবে মোটামুটি-ভাবে ৬৬০ গজ। আলো চারিদিকে বিচ্ছুরিত হবার সময়ে আলোক বুদবুদ্‌টি প্রকৃতপক্ষে আলোর গতিবেগ নিয়ে বড় হয়। যদি মহাকাশযানটি শূন্যস্থানে কোন ভারী বস্তুর সামনে না থাকে তাহলে আলোর বুদবুদ্‌টি এর চারিপাশকে সমভাবে ব্যাপ্ত করবে এবং মহাকাশযানটি আলোর বুদবুদের কেন্দ্রে থাকবে। কিন্তু এমন একটি সরল অবস্থাতেও আলোর বুদবুদের একটি প্রগাঢ় অর্থ আছে। এই আলোক বুদবুদ্‌ মহাকাশযান বা মহাকাশযাত্রীর পক্ষে সম্ভাব্য ভবিষ্যতকে সংজ্ঞায়িত করে। যেহেতু তারা আলোর গতিবেগের বেশী গতিবেগ নিয়ে চলতে পারবে না সেহেতু তারা তাদের নিজের আলোক বুদ্‌বুদের বাইরে যেতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ যদি দশ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত কোন নক্ষত্রে মহাকাশচারী যেতে চায় তাহলে সে দশবছরের আগে সেখানে পেঁাছুতে পারবে না। এই সময়টি হলো সেই সময় যে সময়ে আলোক বুদ্‌বুদটি বড় হয়ে হয়ে নক্ষত্রটিকে ঘিরে ফেলবে। পরের কোন দিন নক্ষত্রে পেঁাছুবার কোন প্রস্তাব নভোচারীর আলোক বুদ্‌বুদের বাইরে পড়বে এবং নক্ষত্রটি তার কাছে অনতিক্রম্য মনে হবে।

এখন ধরা যাক্‌ আমাদের মহাকাশযানটিকে একটি ভারী বস্তুর সামনে আনা হলো। মাধ্যাকর্ষণ আলোর বুদ্‌বুদটিকে কেন্দ্র থেকে স্থানচ্যুত করে। এর ফলে নভোচারীর ভবিষ্যত বিশ্বের একটি নির্দিষ্ট দিকের দিকে প্রভাবিত হয়ে যাবে। ভারী বস্তুর দিকেই এ ধরণের প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে। সময় ও স্থানের মধ্যে একটি আদান-প্রদান ঘটে যায়। এই ব্যাপারটি সময় সম্বন্ধে ধারণাকে ঘাড় শ্লথ হয়ে যাবার ব্যাপারটি যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার চেয়ে আরও সুতীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। একটি কৃষ্ণ গহবর কিন্তু ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করতে পারে। ধরা যাক মহাকাশযানটি একটি বৃহদাকার কৃষ্ণগহবরের বিপজ্জনক

ত্বককে অতিক্রম করছে। নভোচারী তখন চিরতরে কৃষ্ণগহ্বর দ্বারা আবদ্ধ হয়ে যাবে। তার ভবিষ্যত তখন কৃষ্ণ গহ্বরের মধ্যেই থাকবে কেন না সংজ্ঞা অনুযায়ী আলোক বুদ্‌বুদের মধ্যেকার আলো কখনই কৃষ্ণ গহ্বরের বাইরে আসতে পারে না। শতচেষ্টা করেও নভোচারী বা তার মহাকাশযান আলোর থেকে বেশী কিছু করতে পারবে না অর্থাৎ বেরিয়ে আসতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে আলোক বুদবুদের উল্লেখ শুধু যে ভিন্ন কথায় কৃষ্ণগহ্বরের ভয়ংকরতা প্রকাশ করছে তা নয় এটা সময় ও স্থানের মধ্যে আদান-প্রদানকেও নির্দেশ করছে।

হতভাগ্য মহাকাশযানটির সংশ্লিষ্ট আলোর বুদবুদ বাড়তে থাকে ঠিকই কিন্তু তা কেবল কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে বহির্মুখী আলো থেকে গেলেও অন্তর্মুখী আলো কৃষ্ণ গহ্বরের কেন্দ্রের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। এর ফলে হলো কৃষ্ণগহ্বরের প্রান্তে এসে মহাকাশ যানের কেন্দ্র তার সংশ্লিষ্ট আলোক বুদবুদের কেন্দ্র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং আলোক বুদবুদটি শুধুমাত্র ভেতরের দিকে যেতে পারে। আলোক বুদবুদ একটি মহাকাশ যানের মহাকাশযাত্রীর সমস্ত সম্ভাব্য ভবিষ্যত নির্দেশ করে এই কারণে আমরা সরাসরি ও সম্পূর্ণভাবে একটি চিত্তাকর্ষক সিদ্ধান্তে পেঁছুতে পারছি। সিদ্ধান্তটি হলো এই যে, মহাকাশচারীর সময় একটি নির্দিষ্ট দিকে স্থানে পরিণত হয়ে যাবে। তার যা কিছু ভবিষ্যত আছে তা কৃষ্ণ গহ্বরের কেন্দ্রের দিকে নির্দেশিত।

এমনকি পৃথিবীর কেন্দ্রে একটি কাল্পনিক কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব ধরে নিলেও সময় ও স্থানের ওপরে উপরোক্ত অথচ তুলনামূলকভাবে নিষ্প্রভ প্রতিক্রিয়া থাকবে। সাধারণ জ্ঞান আমাদের এই কথাই বলে যে আমাদের নিজস্ব ভবিষ্যত সময় শূন্য স্থানের চেয়ে পৃথিবীর দিকে বিরাজ করে অবশ্য যদি না আমরা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করি।

উপরোক্ত কথাটি আইনস্টাইনের তত্ত্বে নিহিত আছে। পৃথিবীর ত্বকে সময়ের ভবিষ্যত গতিপথ সবদিকে সমান নয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে যাবার সময়ই সময় শূন্যে একটি নির্দিষ্ট দিক পরিগ্রহ করে। এইভাবেই বোধশূন্য একটি আপেল কোন দিকে তাকে পড়তে হবে তা বুঝতে পারে। আপেলের ভবিষ্যত হিসাবে যে দিক নির্দিষ্ট হয় তা পরিস্ফুট হয় আপেলটির সংশ্লিষ্ট আলোক বুদ্‌বুদের পৃথিবীর দিকে সামান্য বিচ্যুতির মধ্যে। এর মানে হলো সবচেয়ে কম শ্রমে সে ঐ পথেই চলে, অন্য পথে একে চালনা করতে গেলে প্রচেষ্টার দরকার হবে। স্বাভাবিক যে পতন তাতে কোন বলের ভূমিকা নেই।

পৃথিবী যেমন নিজ অক্ষের চারিপাশে ঘোরে পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত কাল্পনিক কৃষ্ণগহ্বরকেও অনুরূপ ভাবে ঘুরতে হবে। যখন ঘূর্ণনকে সাধারণ

আপেক্ষিকতাবাদের আওতায় আনা যায় তখন এমন কতগুলি প্রতিক্রিয়ার লক্ষ্য করা যায় যা নিউটনের আপেক্ষিকতায় লক্ষ্য করা যায় না। এখানেও কৃষ্ণগহ্বরের ধারণাটি অনেক কিছু পরিষ্কার করে দেয় যা প্রকৃত পৃথিবীর সম্পর্কিত সূক্ষ্ম ধারণাগুলিও করতে পারে না। একটি না ঘোরা কৃষ্ণগহ্বরের চেয়ে একটি ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বর অনেক বেশী ব্যাপক। কৃষ্ণগহ্বরের ত্বকের বাইরে একটি অংশ আছে যার নাম হলো ইরগোস্পিয়ার। এই অংশটি এমন একটি গোলকের ত্বক যা কৃষ্ণ-গহ্বরের অক্ষের প্রান্তবিন্দু বরাবর চাপা। প্রকৃত পক্ষে গোলকটি এখানে কৃষ্ণ-গহ্বরকে স্পর্শ করে।

ইরগোস্ফিয়ারটি একটি ভীতিপ্রদ অংশ যেখানে যে কোন বস্তু কৃষ্ণগহ্বরের চারিপাশে উচ্চগতিতে ঘুরে বেড়াবে। নীতিগতভাবে এই অংশটি বাদ দিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং আলো এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পরিত্যক্ত বস্তু থেকে স্থিতিশক্তি আহরণ করার জন্য যে কাল্পনিক যন্ত্রটি রোজার পেনরোজ চিন্তা করেছিলেন তা এই অংশটিকেই কাজে লাগিয়ে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইরগোষ্কিয়ারেয় মধ্যে থাকা যাচ্ছে ততক্ষণ ঘোরাটা বাধ্যতামূলক। ইরগোস্ফিয়ার শূন্য স্থান মাত্র এটা ধরে নিলেও এটা সত্যি।

মাধ্যাকর্ষণ এই কৌশলটি সম্পাদন করে সময় ও স্থানকে ঘুরিয়ে। কিন্তু এমন ভাবে এটি করে যাতে সবকিছুর ভবিষ্যত সময় কৃষ্ণগহ্বরের কেন্দ্রের থেকে বাইরের দিকে না থেকে ধারের দিকে সরে যায়। কোন বস্তুর আলোক বুদ্‌বুদ্ ঘূর্ণনের দিকে সম্পূর্ণভাবে সরে যায়। অন্য ভাষায় বলতে গেলে আলো ঐ দিকেই যেতে বাধ্য হয়। সেখানে আক্ষরিক অর্থে ভবিষ্যত বলতে কিছু নেই এবং এটা হচ্ছে স্রোতের বিপরীত মুখে সাঁতার কাটার জন্য বা অন্যপথে যাবার জন্য বা স্থির হয়ে থাকার দরুণ। এটা করতে গেলে কোন লোককে আলোর গতিবেগের চেয়েও বেশী গতি নিয়ে চলতে হবে। স্থানকালের দিকে সময়ের এই অনুপ্রবেশের জন্য ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বর সংশিলষ্ট স্থান ও তার আশেপাশের সবকিছু উচ্চগতিতে ঘোরাতে থাকে।

উন্মত্ত অবস্থাটি একটি চরম অবস্থা। কিন্তু এটা সহসা সক্রিয় হয়ে ওঠে না। ঘূর্ণায়মান কৃষ্ণগহ্বরের থেকে অনেক দূরে ভবিষ্যত সময়ের কিছুটা পাশে হটে যাবার প্রবণতা থেকে যায়। এই ধরণের প্রভাবে কৃষ্ণগহ্বর থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলে যে কোন লোক আচ্ছন্ন অনুভব করে এবং মনে করবে যেন আপাত-দৃষ্টিতে দূরবর্তী নক্ষত্রেরা তার চারিপাশে ঘুরছে। পৃথিবীর কেন্দ্রে যদি একটি কাল্পনিক কৃষ্ণগহ্বর থাকে তাহলে পৃথিবীর ত্বকে পূর্বের দিকে দৈনিক একবার ঘোরায় স্থানের প্রবাহ অব্যাহত থাকবে। এই প্রতিক্রিয়াটি খুবই সামান্য।

কারণ কৃষ্ণগহ্বরের সাপেক্ষে ঘূর্ণনের হার খুব কম ও আমরা পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে 4000 মাইল দূরে।

এই অর্থে যদি পৃথিবী নিজে ঘোরার সময় স্থানকে টেনে নিয়ে যায় তাহলে তা পৃথিবীর চারিপাশে ঘুরে বেড়ানো মহাকাশযানের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর ঘূর্ণায়মান জাইরোস্কোপের সাহায্যে ধরা সহজ হবে। জাইরোস্কোপের অক্ষটি খুব অল্প পরিমাণে ঘুরতে থাকবে এবং একটি পূর্ণ ঘূর্ণনের সময়কাল দাঁড়াবে পঁচিশ মিলিয়ন বছর। এছাড়া আরেকটি কারণ আছে যা জাইরোস্কোপটিকে একশ গুণ দ্রুত হারে ঘোরাবে। এটি হলো পৃথিবীর চারিপাশে বক্র ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে মহাকাশ যানটি যাবার জন্য। গবেষকরা কিন্তু এখনও আশা রাখেন যে প্রতিক্রিয়া দুটিই আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে ধরা যাবে।

এধরণের অস্বাভাবিক রকম সূক্ষ্ম পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত জাইরোস্কোপ কোয়ার্জের গোলক দিয়ে তৈরী হবে এবং তার আকার হবে টেনিস বলের মত। একে সম্পূর্ণভাবে গোলাকৃতি হতে হবে। প্রত্যেকটি গোলক পাতলা পাত দিয়ে মোড়া থাকবে যা মাত্র কয়েক ডিগ্রি চরম উষ্ণতায় চরম পরিবাহী হয়ে উঠবে এবং জাইরোস্কোপটিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপিত করবে। জাইরোস্কোপটিকে ঘোরাবার এবং তার অক্ষটির পথটি নিয়ন্ত্রিত রাখার জন্য সূক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করা হয়। আলোচ্য মহাকাশ যানে চারটি এই ধরণের জাইরোস্কোপ থাকে ও তাছাড়া আরও একটি থাকে যা মহাকাশযানটির বিবেক হিসাবে কাজ করে। মহাকাশযানটির ওপরে বিকিরণের চাপ সক্রিয়। এরই জন্য তারা একেবারে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ঘুরবে না। এ জিনিষটা পরিহার করতে গিয়ে মহাকাশযানের বিবেক মুক্ত ভাবে পতনের যে কোন ব্যাতিক্রম ধরতে পারে ও সামান্য পরিমাণে গ্যাস বার করে দিয়ে তাকে সংশোধন করে নেয়। জাইরোস্কোপের গতি তুলনা করার জন্য মহাকাশযানটিকে একটি সুনির্দিষ্ট অক্ষ সরবরাহ করার জন্য মহাকাশ যানটি নিজে নিজেই একটি নির্দিষ্ট তারার দিকে মুখ করে থাকবে। পাঠক হয়তো ভাবতে পারেন শুধুমাত্র স্থানচ্যুতি মাপার জন্য একটি পরীক্ষাতে এত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে কেন বিশেষত যেখানে পরীক্ষালব্ধ ফলের মান খুবই সামান্য এবং যার কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই। এর উত্তর হলো বিশ্বের ক্রিয়াপদ্ধতি সম্বন্ধে আইনস্টাইনের যে ধারণা তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহেরই প্রতীক। বিশেষভাবে ঘূর্ণায়মান পৃথিবী কর্তৃক স্থানের বিচ্যুতি এবং তার পরিণামে পৃথিবীর কাছে জাইরোস্কোপের গতিবিধি নিউটনের চিন্তাধারার পরিবর্তনমাত্র নয়—এটা আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রতিক্রিয়া। অন্যান্য সুফলের মধ্যে আশা করা যেতে পারে যে এটি একটি সুনির্দিষ্ট ফল দেবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে যা হয়—পরীক্ষকদের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন জটিল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে আইনস্টাইন প্রস্তাবিত সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়ার সন্ধান করতে হবে না। জাইরোস্কোপটি নির্দিষ্ট হারে ঘুরবে নচেৎ ঘুরবে না।

কিন্তু আসলে কি ঘটছে? সময় কি এ রকম একটা জিনিষ যাকে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে কমানো যায় বা নির্দিষ্ট দিকে চালনা করা যায়? স্থানই বা কি একটা ভারী বস্তু না নরম পুডিং এর মত যার আকার পালটাতে পারে বা একটি ঘূর্ণয়মান কৃষ্ণগহ্বরকে বিদীর্ণ না করে তার চারিপাশে নিরন্তর ঘুরে যেতে পারে? কোন তুলনাই পর্যাপ্ত নয় কেন না সময় কেবল সময়ই, স্থান কেবল স্থানই—তারা জড় বস্তুর মতন নয়। তবুও সময় ও স্থান বিশ্বের সকল প্রক্রিয়াতে কার্যকরী ভাবে অংশ নেয়। একটি আলোর প্রতিক্রিয়া স্থান কালকে অঙ্কিত করে এবং তা বুঝতে সাহায্য করে।

আইনস্টাইন যে স্থানের কথা ভেবেছিলেন তা ইউক্লিড বা নিউটন নির্দেশিত স্থানের চেয়ে কোনদিক দিয়ে তফাৎ তা বোঝাতে গিয়ে আইনস্টাইনকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি বললেন যে আমরা এমন একটি বিশ্বের কথা ভাবতে পারি যেখানে স্থান বিকৃত নয় কিন্তু তা হবে একেবারে বস্তুবিহীন। কিন্তু শূন্য স্থানের কোন বাস্তব অর্থ নেই। কি দিয়ে কোন স্থান ভর্তি, তা না জানলে কোন স্থানের অর্থ হয় না। কোন স্থানের জ্যামিতি সেখানে কি ধরণের বস্তু আছে তার ওপর নির্ভর করে।

যে ভাবে সময়, স্থান ও আলোর গতিবেগ সম্পর্ক যুক্ত তা নীতিগতভাবে কিন্তু রহস্যময় কিছু একটা নয়। কিন্তু তার পরিণতিগুলি ভীতিপ্রদ। একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি জিনিস যে দূরত্ব যায় সেটাই তার গতিবেগ। কিন্তু আইনস্টাইনের বিশ্বে আলোর গতিবেগ স্থান কালের চেয়েও আরও বেশী ব্যাপক। স্থান হলো এমন একটি জিনিষ যার মধ্য দিয়ে আলো যাতায়াত করে। সময় হলো এটা যেতে যতক্ষণ লাগে। আলোর সাহায্যেই আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে থাকা এবং সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হওয়া জিনিষগুলোকে দেখতে পাই। চারিদিকে কি ঘটছে সেটা জানতে পরমাণুকেও আলোর ওপর নির্ভর করতে হয়। সুতরাং প্রাকৃতিক সকল ঘটনাই আলোর গতিবেগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

আলোর চেয়ে আরও প্রাথমিক হলো শক্তি। কোন ভারী বস্তুর ভরের এবং স্থিতিশক্তির পরিমাণ মাধ্যাকর্ষণের মাধ্যমে আলোর চরিত্রকে প্রভাবিত করে। আলোর চরিত্রের বিভিন্নতা স্থান কাল গণনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। উদাহরণ স্বরূপ একটি কৃষ্ণগহ্বর স্থানকে গুটিয়ে দেয় এবং সময়ের প্রবাহকে মন্থর করে দেয়। দূরবর্তী কোন দর্শকের মনে হয় যেন স্বল্প দূরত্বে তা আলোকে থামিয়ে

দিচ্ছে। সে দেখবে যেন কৃষ্ণগহ্বরের কাছে আলো আরও বিলম্বিত হয়ে যাচ্ছে। এটা ব্যাখ্যা করার একটা উপায় হলো বলা যে দূরত্বগুলি একটি রাবারের টুকরোর মতো বড় হয়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে আলোকে তার স্বাভাবিক গতিতে বেশী পথ যেতে হচ্ছে। অন্য সরল ব্যাখ্যা হলো যে পর্যবেক্ষকের কাছে আলোর গতিবেগ মন্থর হয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং স্থানকে এক ধরণের বিশেষ কাঁচ হিসাবে ভাবা যেতে পারে যা সকল কঠিন বস্তুর বা আলোর ক্ষেত্রে স্বচ্ছ। কাঁচ আলোর গতিকে কমিয়ে দেয়, যত ঘন কাঁচ হবে আলোর গতিবেগও ততই কমবে। একটি ভারী বস্তু তার নিকটবর্তী স্থানকে সংকুচিত করে এবং বিকৃত করে। ভারী বস্তুর নিকটবর্তী অঞ্চলে স্থান বেশী ঘন এবং তাতেই দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন আলো সেখানে ধীর গতিতে চলছে। এতে স্থানটি একটি বিবর্ধক লেন্স্ হিসাবে কাজ করছে এবং আলো এই ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাবার সময় কিছুটা ভেতরের দিকে বেঁকে যাচ্ছে। কিন্তু স্থানীয় ভাবে অর্থাৎ ভারী বস্তুর ওপর অবস্থিত কোন পর্যবেক্ষক বা পরমাণু অথবা চলমান কোন আলোক কণার কাছে কিন্তু আলোর গতিবেগ কিংবা সময়ের হার একরকমই থাকবে। সুতরাং ঘড়ি স্লো হয়ে যাবার ব্যাপারটিকে যথার্থ করতে দূরত্বকে ছোট হয়ে যেতে হবে।

কাঁচের মতন স্থান একটি ভালবের কাজ করে। আলো সরাসরি ও দ্রুত গতিতে মাধ্যাকর্ষণের কেন্দ্রের দিকে বাঁক নেয়। আলোক বুদবুদ্ এই জিনিষটির উদাহরণ। এখানে বলে রাখা ভাল যে এমন কিছু কিছু ক্রিষ্টাল আছে যেখানে আলো ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ নিয়ে চলে। অনুরূপ ভাবে সময়ও একদিকে অন্য দিকের তুলনায় দ্রুত গতিতে চলে। সময়, আমরা যা দেখেছি—স্থান বিশেষে একটি নির্দিষ্ট দিক প্রাপ্ত হয়। ভ্রমণ করার পক্ষে একটি বস্তুর সবচেয়ে অলস দিক হবে সেটি যে দিকে আলো এবং সময় সবচেয়ে দ্রুত গতিতে চলে—যদিও এটা প্রথাগত ভাবে বস্তুটিকে একটি সময়ের অংশের মধ্যে নিয়ে যায় যেখানে আলো এবং সময় মন্থর হয়ে যায়। বস্তুটির পক্ষে অন্য কোন রাস্তা নেওয়ার পথে বাঁধা বা প্রচেষ্টা সময়কে শ্লথ করে দেয়।

স্থানকে কাঁচ হিসাবে ভাবাটা এই হিসাবে নয় যে ভারী বস্তুটি নিজে স্থানের মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছে। বিকৃত স্থান ও সময়ের মধ্যেও ছবি তুললে দেখা যাবে ভারী বস্তুকে স্থানের বক্রতাকে বজায় রাখতে গিয়ে সর্বদা কাজ করে যেতে হচ্ছে। এটা করতে গিয়ে সে সামান্য শক্তি বা ভর হারাচ্ছে। ভেজা স্পঞ্জ নিঙড়ালে যেমন জল বেরিয়ে আসে ঠিক তেমনিভাবে শক্তভাবে সংকুচিত স্থান থেকে শক্তি নির্গত হয়।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হকিন্স একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন যা আইনস্টাইনের তত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কৃষ্ণগহ্বরের কাছে স্থানটি উষ্ণ এবং এর পরিণতি হতে পারে নাটকীয়। স্থান উত্তেজিত হয় এটাই হলো এই প্রক্রিয়ার কারণ। যে কোন গ্যালাক্সি থেকে দূরবর্তী কোন স্থানের একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে কি আছে জানতে গিয়ে যদি আমরা পরিচিত অণু-পরমাণু ও অসংখ্য আলোকণা বাদ দিই তাহলে কিছু অংশ পড়ে থাকবে। সাধারণভাবে এই অংশের গঠন সম্বন্ধে কিছু জানা সম্ভব নয়। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সবচেয়ে শক্তিশালী তত্ত্বের সাহায্যে এরকম একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয় যে শক্তির সৃষ্টি সম্ভব। কোয়ান্টাম তত্ত্ব যে সমস্ত কণাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যতবাণী করে তাদের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

হকিন্স বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণগহ্বরের কাছে স্থানের অস্বাভাবিক বক্রতা এই সমস্ত অদেখা কণাদের দীর্ঘস্থায়ী কণা বা আলোক কণায় রূপান্তরিত করে দিতে পারে। ১৯৭৪ সালে তিনি ঘোষণা করেন যে কৃষ্ণগহ্বরগুলি উত্তপ্ত এবং তাদের বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এই ধরনের ঘটনা ঘটার সময় কৃষ্ণগহ্বরের স্থিতি শক্তিকে হঠাৎ বিনষ্ট করে তাকে গামা রশ্মি বা পারমাণবিক কণায় রূপান্তরিত করে দিতে পারে। আমাদের সময়ে এ ধরনের বিস্ফোরণ ঘটবে খুব ছোট কৃষ্ণগহ্বরে। এইসব ছোট কৃষ্ণগহ্বরগুলি সৃষ্টির আদিকালে তৈরী হয়েছিল।

কৃষ্ণগহ্বরের বিস্ফোরণ কি দেখা যাবে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গামা রশ্মির উদ্গীরণ লক্ষ্য করতে পারেন। বিপরীত দিকে বিস্ফোরণের ফলে বেরিয়ে আসা কণাগুলি গ্যালাক্সির চুম্বক ক্ষেত্রে ঘুরতে থাকবে এবং তার ফলে আলো এবং বেতার তরঙ্গ ছাড়তে থাকবে। বিস্ফোরণশীল কৃষ্ণগহ্বর আছে কি না তা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতদ্বৈধতা আছে। যে সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে এ ধরনের ঘটনা ঘটার একটা উচ্চ সীমা পাওয়া যায়। যদি ১৫০ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত কোন কৃষ্ণগহ্বরের বছরে একবার অন্ততঃ বিস্ফোরণ ঘটত তাকে নিশ্চয় দেখা যেত।

১। মনে হয় আলো মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে মন্থর হয়ে যায়।
২। আলোর আপাত মন্থর হয়ে যাওয়া সময় মন্থর হয়ে যাবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।
৩। আলো বেঁকে যাওয়ার অর্থ হলো মাধ্যাকর্ষণ স্থানকে বিকৃত করে।
৪। স্থান ও কালের ওপর যৌথ প্রতিক্রিয়া বক্রতাকে দ্বিগুণিত করে।
৫। সূর্য দ্বারা আলোর বেঁকে যাওয়া ও মন্থর হয়ে যাওয়া পরিমাপযোগ্য।

১৯০৫ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত আইনস্টাইন স্থান সময় ও মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে সম্পর্ক বার করার চেষ্টা করছিলেন এবং এই সময়ে তিনি বিস্ফোরণশীল বা ঐ ধরনের কৃষ্ণগহ্বর সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানতেন না। পরবর্তীকালের কয়েকটি ধারণা বা বর্ণনা থেকে পাঠক হয়ত সহজে বুঝতে পারবেন যে আইনস্টাইনকে কি ধরনের মানসিক সংগ্রাম করতে হয়েছিল। আইনস্টাইন নিজে যে সমস্ত অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিলেন সেগুলি জানতে পারলে আগের পরিচ্ছেদে বর্ণিত স্থান কাল সম্বন্ধে ধারণা বেশী করে পরিস্ফুট হবে। সাধারণ আপেক্ষিকতা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁকে আরও অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এগুলি পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে। তবে আলোর ওপরে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবই ছিল তাঁর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রধান বিষয়।

যে মুহূর্তে আইনস্টাইন আবিষ্কার করলেন যে আলো ভারী এবং $E=mc^2$ সমীকরণ অনুযায়ী তার একটি ভর আছে সেই মুহূর্তেই বোঝা গেল আলোর ওপরে মাধ্যাকর্ষণের কিছু প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই থাকবে। স্বাভাবিকভাবে যে কথাটি মনে হয় কোন ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাবার সময় আলো বেঁকে যাবে, যেমন করে একটি বুলেট মাটির দিকে বেঁকে যায়। বস্তুত আইনস্টাইনের মনে কেন আলো পড়বে—এই প্রশ্নের চেয়ে আরও ব্যাপক প্রশ্ন আলো কিভাবে পড়ে এই চিন্তাই বড় হয়ে উঠেছিল। স্থান কালের ওপরে একটি ভারী বস্তুর সম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া প্রথমেই তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়নি।

১৯১১ সালে তিনি কতকগুলি প্রাথমিক চিন্তা নিয়ে পড়লেন। সেই সময়ের মধ্যে তিনি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে লালের সরণের কথা বলে ফেলেছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও বুঝে ফেলেছিলেন যে মাধ্যাকর্ষণ সময়কে মন্থর করে দেয়।

তিনি জোরের সঙ্গে বললেন যে, বাধ্যতামূলক কিছু নেই যাতে আমরা ধরে নিতে পারি যে বিভিন্ন মাধ্যাকর্ষণজনিত বিভব ক্ষেত্রে সময়ের হার একই থাকবে। তিনি আরও ভবিষ্যতবাণী করলেন যে, তারাদের থেকে বেরিয়ে যে আলো সূর্যের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে সেই আলো সূর্যের দিকে বেঁকে যাবে এবং এই ঘটনাটি বোঝা যাবে পূর্ণ গ্রহণের সময়। কতটা বিক্ষেপ হবে সে সম্বন্ধে তাঁর গণনার মধ্যে কিছুটা ভ্রান্তি ছিল। তখন যে পরিমাণ বেরিয়ে ছিল তা পরবর্তী কালে সঠিক পরিমাপের অর্ধেক।

আইনস্টাইনের মতন বিজ্ঞানী যে আলোর ওপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন নি তার কয়েকটি কারণ আছে। তিনি পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও পরস্পরের পরিপূরক দুটি বিষয়ের কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। এদের মধ্যে একটি হলো সময়ের ওপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব। এই প্রভাবের ফলে আলো মন্থর হয়ে যায় যার ফলে সূর্যের চারিপাশের অঞ্চল একটি লেন্সের মতন কাজ করে যে লেন্স আলোক রশ্মিকে বাঁকিয়ে দেয়। দ্বিতীয়টি হলো স্থানের বিকৃতি যার ফল হলো সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা, সূর্যের দিকে যাওয়া আলোর যাত্রাপথ বড় হয়ে যায়। এতে লেন্সটা আরও মোটা ও শক্তিশালী হয়ে পড়ে। ১৯১১ সালে আইনস্টাইন প্রথমটির সন্ধান পান কিন্তু দ্বিতীয়টির নয়। এটা হঠাৎ কিছু ঘটে যাওয়ার ব্যাপার নয় যে দুটি বিক্রিয়াই আলোর বেঁকে যাওয়ার ব্যাপারে সমান প্রভাব বিস্তার করে। সেই কারণেই আইনস্টাইন প্রথমে যা পেয়েছিলেন তা প্রকৃতমানের অর্ধেক। প্রথম কারণে আলো বেঁকে যাওয়ার অর্থ হলো স্থানের বক্রতা যা দ্বিতীয় কারণের সৃষ্টি করে।

ওপরে যে সমস্ত অসম্পূর্ণতার কথা বলা হলো তা আইনস্টাইনের বিরাটত্বই প্রমাণ করে—তাকে কোনভাবেই খাটো করে না। এই ঘটনাগুলি এইটাই প্রতিষ্ঠা করে যে আইনস্টাইন একটি গাণিতিক রোবট ছিলেন না—তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ যিনি জটিল সমস্যা নিয়ে সদাসর্বদা পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁর ১৯১১ সালের প্রবন্ধটি নতুন ও পুরাতন ধারণার মিশ্রন মাত্র ছিল। এরই জন্য বোধহয় নক্ষত্রালোকের বিক্ষেপের পরিমাণ তাঁর গণনায় ভুল বেরিয়েছিল। তখনও আইনস্টাইন দুটি ধারণার মধ্যে মিলন সূত্রটি খুঁজে বার করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই ধারণা দুটি হলো মাধ্যাকর্ষণ ঘড়িকে মন্থর করে দেয় এবং ভারী বস্তুর উপস্থিতি স্থানকালকে বিকৃত করে দেয়।

আইনস্টাইন বিশ্বকে খুব সরলভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাধ্য হয়েই তাকে কিছুটা জটিল গণিতের আশ্রয় নিতে হলো। সাধারণ আপেক্ষিকতার মধ্যে যে গণিত আছে তা খুবই জটিল কেন না এতে একসঙ্গে বহু জিনিষকে ধরে

রাখার চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানে উচ্চগতি সম্পন্ন বস্তুরা পরস্পরের মাধ্যাকর্ষণ অনুভব করতে করতে প্রচণ্ড গতিতে একে অপরকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। চেষ্টা বলতে এই কথাই বোঝান হচ্ছে যে অতি দ্রুত কম্পিউটার আবিষ্কৃত হবার আগে সরল কয়েকটি অবস্থা ছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সমীকরণগুলি সমাধান করা অসম্ভব ছিল। বিকৃত স্থান কালকে বর্ণনা করতে যে গাণিতিক পদ্ধতি দরকার হয় তা বিকৃতি যোগ্য কঠিন বস্তুর মধ্যে পীড়ন গণনা করতে যে গণিত লাগে তার চেয়ে কিছু ভিন্ন নয়।

টেনসর ক্যালকুলাসের সাহায্যে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা স্থান কালের বিকৃতি সম্বন্ধে গণনা করতে পারেন। এর ধারণাগুলি আদৌ ভৌতিক কিছু নয় তবে গণিত অত্যন্ত জটিল। এই কারণে তা সম্পূর্ণ পরিহার করা হলো।

আইনস্টাইন এটা পরিহার করতে পারেননি। তিনি ১৯১২-১৪ সাল পর্যন্ত জুরিখে গণিতবিদ্ মার্শেল গ্রোসম্যানের সঙ্গে কয়েকটি প্রয়োজনীয় মুহূর্ত অতিবাহিত করেন। জুরিখ পলিটেকনিকে যখন দু'জনে ছাত্র ছিলেন তখন গ্রোসম্যান আইনস্টাইনকে অঙ্ক শেখাতেন। অধ্যাপক গ্রোসম্যান অধ্যাপক আইনস্টাইনকে স্থান কালে জ্যামিতিতে টেনসর ক্যালকুলাস কাজে লাগিয়ে কি ভাবে খেলা করা যায় তাই শেখালেন। তাঁরা দু'জনে মিলিত হয়ে এই গণিতের সাহায্যে কি ভাবে মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে নতুন তথ্য আবিষ্কার করা যায় তার চেষ্টায় রত হলেন। তাঁরা প্রায় সফল হয়েছিলেন। প্রবন্ধাকারে লিখেও ফেলে ছিলেন। আপেক্ষিকতাবাদের আলোকে বিচার্য জটিল বিশ্বে কোন জিনিষটা বস্তুগ্রাহ্য বা নির্ভরশীল তা নিয়ে তাঁর মনে তখনও দ্বন্দ্বের অবধি ছিল না। তাঁর ধারণা ছিল প্রাকৃতিক নিয়ম এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ভিন্ন হবে।

কৃষ্ণগহ্বর সম্বন্ধে সরল ধারণাগুলি কিন্তু আইনস্টাইনের জন্য নয়। তিনি সহজ কোন পথ আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলেন। যাই হোক্ এর মধ্যে যে কাহিনী নিহিত আছে বা ধারণাগুলির মধ্যে সাধারণত্বের অভাব তাঁকে অসন্তুষ্ট করেছিল। এর বদলে তিনি কষ্টসাধ্য অথচ উপযুক্ত গাণিতিক বিশ্লেষণের দুস্তর পথে পা বাড়িয়েছিলেন। মনের ওপর আরও চাপ সৃষ্টি করে তিনি ১৯১৪ সালে বার্লিনে নতুন পদ গ্রহণ করলেন। এই সময়টি ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল। তবুও ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন যখন তাঁর চিন্তা ভাবনা নিয়ে একেবারে একাকী তখনই যুগান্তকারী পরিবর্তন এলো। প্রাকৃতিক নিয়ম সব জায়গায় এক। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সৌন্দর্য তাঁর সামনে প্রতিভাত হলো। তিনি প্রকৃত প্রযোজ্য গণিতটি আবিষ্কার করলেন। প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব। সূর্য-গ্রহণের সময়ে নক্ষত্রালোকের যে পরিমাণ বিক্ষেপ দেখা যাবে তার সম্বন্ধে তিনি

সঠিক পরিমাণটি প্রতিষ্ঠা করলেন। পরবর্তীকালে তাঁর একটি উক্তি—"অন্ধকারে উৎকণ্ঠার সঙ্গে অনুসন্ধান নিবিড় আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাসের রদবদল, ক্লান্তি, পরিণতিতে আলোর বিচ্ছুরণ—যাঁরা এই সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন তাঁরাই এটা বুঝতে পারবেন।"

সূর্যের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আলোর যে বিক্ষেপ হবে তার পরিমাণ খুব সহজে গণনা করা যায়। ধরা যাক পাঠক এমন একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে যেখানে সূর্যের খুব কাছ দিয়ে আলো চলে যাচ্ছে। কল্পনা করা যাক সূর্যের কেন্দ্রে একটি কাল্পনিক কৃষ্ণগহ্বর আছে। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে ঐ দূরত্ব থেকে তাকে কত বড় দেখাবে। কৃষ্ণগহ্বরের দুটি পাশ দর্শকের চোখে যে কোণের সৃষ্টি করবে তা আসলে হবে যে কোণে আলো প্রতিফলিত হবে। বর্তমান পরিভাষায় তার তত্ত্বে যে ত্রুটি সংশোধন করেছিলেন তাতে একটি নির্দিষ্ট ভরের কৃষ্ণগহ্বরের আকার দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল।

যদিও সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীতে আইনস্টাইন ব্যর্থ মানুষ ছিলেন না ঠিকই তবুও তিনি তাঁর নিজের সাফল্যকে কখনই ছোট করে দেখেন নি। যখন ১৯১৯ সালে তার প্রথমা স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে তখন চুক্তি করেছিলেন যে নোবেল পুরস্কার পেলে তার থেকে অর্থ স্ত্রীকে দেবেন। মজার ব্যাপার হলো তিনি তখনই যে পুরস্কার পাননি কিন্তু নিশ্চিত ছিলেন যে সে পুরস্কার তিনি পাবেনই। অর্থের জন্য তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। খানিকটা একাকী হলেও আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে আলো বেঁকে যাওয়ার ব্যাপারটি একদিন পরীক্ষার সাহায্যে ধরা পড়বে এবং তাতেই তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত হবে। শেষ পর্যন্ত তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী প্রমাণিত হবার খবরটি টেলিগ্রাম মারফৎ এসে পৌঁছল। একটি ছাত্রী তাঁকে প্রশ্ন করেছিল যে যদি তাঁর ভবিষ্যতবাণী নির্ভুল প্রমাণিত না হতো তাহলে তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া হতো। আইনস্টাইন উত্তর দিয়েছিলেন—"তাহলে আমি ঈশ্বরের জন্য দুঃখ অনুভব করতাম।"

সূর্যের পাশ দিয়ে যাবার সময় নক্ষত্রের আলো কি ভাবে বেঁকে যায় তা অবলোকন করে ব্রিটিশ জ্যোতির্বিদেরা আইনস্টাইনের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার সামান্যতম সুযোগ ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। সাধারণ ভাবে যে সমস্ত নক্ষত্র সূর্যের খুব কাছাকাছি আছে তারা অতিরিক্ত সূর্যালোকের দরুণ প্রায়শই দৃশ্যমান নয়। কিন্তু বিশেষ একটি ঘটনা আছে যা আইনস্টাইনের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়ে ওঠে। এই ব্যাপারটি হলো পূর্ণ গ্রহণের সময় চন্দ্র সমস্ত সূর্যকে একেবারে ঢেকে ফেলে। তখনই সূর্য বরাবর নক্ষত্রগুলিকে দেখা যায়। যদি আইনস্টাইনের তত্ত্ব ঠিক হয় তবে সূর্য অন্যান্য নক্ষত্রদের তুলনায় সূর্যের

কাছাকাছি আছে এমন নক্ষত্রদের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে বাইরের দিকে ঠেলে দেয়।

নিউটনের তত্ত্বকে আধুনিক করণের বিভিন্ন পন্থা অনুযায়ী বলা যেতে পারে যে নক্ষত্রালোক হয় একেবারেই বিক্ষিপ্ত হবে না, বা আইনস্টাইন তাঁর তত্ত্ব সম্পূর্ণ করার আগে ভুলবশতঃ যে অর্ধেক ফললাভ করেছিলেন তাই হবে।

১৯১৯ সালের ২৯শে মে তারিখে সূর্যের পূর্ণ গ্রহণ হয়েছিল। এই গ্রহণ কিন্তু ইউরোপ বা আমেরিকার থেকে দেখা যায়নি। দুটি অভিযাত্রীদল বিষুব-রেখা অঞ্চলে এই গ্রহণ দেখেন। যুদ্ধের সময় আইনস্টাইনের প্রবন্ধ নেদারল্যান্ড ঘুরে ইংল্যান্ডে এসে পোঁছায়। আর্থার এডিংটন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি গ্রহণ পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আগে থেকেই তৈরী হচ্ছিলেন। একটি অভিযাত্রী দল উত্তর ব্রেজিলে ও অপর অভিযাত্রী দলটি পশ্চিম আফ্রিকার নগু প্রিনসিপে দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পূর্ণ গ্রহণের সময় সূর্যের চারিপাশের নক্ষত্রদের ছবি তোলেন। প্রথমে পর্যবেক্ষণের জায়গায় ও পরে ইংল্যান্ডে অতি সতর্কতার সঙ্গে তাঁরা নক্ষত্রদের অবস্থান পরিমাপ করেন। তাঁরা দেখতে পেলেন নক্ষত্রালোক সত্যি সত্যি বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রিনসিপের ফল আইনস্টাইনের অনুমানের চেয়ে কিছু কম হলেও অপর স্থানের ফল প্রস্তাবিত ফলের চেয়ে বেশীই হলো।

পূর্ণ গ্রহণ থেকে পাওয়া ফল আইনস্টাইনের বিজয় ঘোষণা করল। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব প্রায় দুশোবছর ধরে কোন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়নি। আইনস্টাইনের তত্ত্ব খাড়া হবার চার বছরের মধ্যেই তা প্রমাণিত হয়ে গেল এবং নিউটন তার সাম্রাজ্য হারালেন। মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে আলোর বিক্ষেপ আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের মূলকথা। কিন্তু পরবর্তীকালে বিভিন্ন পূর্ণগ্রহণের সময়ে নক্ষত্রালোকের বিক্ষেপের পরিমাণ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হলো। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী যা মনে হওয়া উচিত তার চেয়ে ৬০% তফাৎ হলো এসব কিন্তু পর্যবেক্ষণের ত্রুটি তত্ত্বের কোন ত্রুটি নয়। যদিও যে নিউটনকে দূরে সরানো হয়েছিল তাঁকে আর ফেরানো গেল না ঠিকই, ফলাফলের তারতম্য মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে বিকল্প কোন তত্ত্বের অবকাশ যেন একটি থেকেই গেল।

বেতার জ্যোতির্বিদরা কিছুটা ভাল ফল দর্শালেন। কোয়াসার হলো বেতার শক্তির একটি সংহত উৎস। দুটি কোয়াসার সূর্য দ্বারা বেতার শক্তির বিক্ষেপ মাপার পক্ষে সবিশেষ কার্যকরী। এদের নাম হলো, $C_{২৭৯}$ ও $C_{২৭৩}$ এরা প্রত্যেকে আকাশে খুব কাছাকাছি থাকে। প্রত্যেক বছরে ৮ই অক্টোবর কক্ষপথে পৃথিবীর ঘূর্ণন সূর্যকে $C_{২৭৯}$ এর সঙ্গে এক রেখায় এনে দেয় যার ফলে

কোয়াসারের গ্রহণ ঘটে। আইনস্টাইনের ভবিষ্যত বাণী অনুযায়ী $C_{২৭৩}$ কিছুটা পরে অন্তর্হিত হয় এবং সূর্যের অপর পার্শ্ব থেকে কিছুটা তাড়াতাড়ি পুনরোদিত হয়। কোয়াসার যদি কেবলমাত্র সাধারণ একটি জড় প্রতিবন্ধক হত তাহলে এমনটি হত না। এছাড়া $C_{২৭৩}$ এর সুবিধাজনক উপস্থিতি বেতার জ্যোতির্বিদদের আকাশে একটি সুনির্দিষ্ট বিন্দুর অবস্থান দেয় যার সাহায্যে বোঝা যায় এর আপাত অবস্থান সূর্যের কাছে এসে কিভাবে পাল্টাচ্ছে। ১৯৭০ সাল নাগাদ এই বাৎসরিক ঘটনার বেশ কয়েকটি পর্যবেক্ষণ আইনস্টাইনের ভবিষ্যৎ বাণীকে দশ শতাংশের মধ্যে সত্যি বলে প্রমাণ করল।

বেতার জ্যোতির্বিদ্যা এতই উন্নত হয়েছে যে এখন হয়ত মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব দেখতে গেলে সূর্যের খুব কাছাকাছি লক্ষ্য করার দরকার হবে না। যদি কেউ সূর্যাস্তের সময় আকাশের দিকে লক্ষ্য করে তাহলে দেখা যাবে আলো সূর্যের দিকে বেঁকে যাওয়ার দরুণ কিছুটা পূর্বদিকে সরে যাবে। সূর্যোদয়ের সময়ে এই বিক্ষেপ ঘটবে পশ্চিমের দিকে। এ ধরণের প্রভাব কিন্তু খুবই সামান্য ঠিকই কিন্তু বেতার জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে তা ধরা পড়বে নিশ্চিত।

আলো বেঁকে যাওয়ার ব্যাপারে আইনস্টাইন যে সম্পূর্ণ মান নির্দ্ধারণ করেছিলেন তার মধ্যে আলোর দেরী হবার ব্যাপারটি আছে। দূরবর্তী কোন পর্যবেক্ষক যখন দেখবে আলো সূর্যের মত কোন ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাচ্ছে তখন সে মনে করবে আলোর গতি যেন মন্থর হয়ে যাচ্ছে। এ ধরণের চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন পরীক্ষার কথা ১৯১৫ সালে ভাবা সম্ভব হয়নি। অসুবিধাটি খুবই স্পষ্ট কেন না আলোর গতিবেগ মাপতে গেলে আলোকে সূর্যের দিকে পাঠিয়ে তাকে আবার ফেরৎ নিয়ে আসতে হবে যাতে বোঝা যায় যে সমস্ত যাত্রাপথে কত সময় লেগেছে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে একটি প্রতিধ্বনির প্রয়োজন। আজকাল রাডারের প্রতিধ্বনির সাহায্যে সূর্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়া বেতার তরঙ্গের গতিবেগ মাপা সম্ভব। বেতার শক্তি ঠিক আলোর গতিবেগ নিয়েই চলে। পৃথিবীর থেকে দেখলে বোঝা যায় আলো সূর্যের কাছে এলে সত্যিই মন্থর হয়ে যায়।

১৯৬০ সালে গ্রহ থেকে রাডারে প্রতিধ্বনি পাওয়ার ব্যাপারটি একটি বড় রকমের যান্ত্রিক সফলতা। সে সময় বিরাটকায় বেতার-টেলিস্কোপ শক্তিশালী প্রেরকযন্ত্র ও অত্যন্ত সংবেদনশীল গ্রাহক যন্ত্র হিসাবে করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ শুক্র যখন সূর্য থেকে দূরে, রাডার নিসৃত তরঙ্গ সেখান থেকে ফেরৎ আসতে প্রায় আধঘণ্টা সময় নেয় এবং সমস্ত পথ জুড়ে শক্তি হারাতে থাকে। যাইহোক্ রাডারে প্রতিধ্বনি ধরা পড়েছিল এবং এর সাহায্যে আইনস্টাইনের তত্ত্বের নির্ভুলতা প্রমাণ করার

আরেকটি দিক উদ্ভাবন করলেন ম্যাসাচুয়েটসের বিজ্ঞানী স্যাপিরো। এখানে বলে রাখা ভাল যে স্যাপিরো কিছু কিছু তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আইনস্টাইনের তত্ত্বের যথার্থ ব্যাখ্যা নিয়েই এই বাধার উৎপত্তি। কেউ কেউ বলেছিলেন প্রতিধ্বনির মন্থর গতিতে ফিরে আসার ব্যাপারটি কখনই ঘটে না। এধরণের মানসিক প্রতিক্রিয়া অবশ্য সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ ভাল করে বোধগম্য হবার ফলশ্রুতি। আধুনিককালে পরীক্ষার দ্বারা আইনস্টাইনের তত্ত্ব যাচাই হবার পর অবশ্য ঐ ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়।

স্যাপিরো ও তাঁর সহযোগীরা লক্ষ্য করলেন যে শুক্র যখন সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে তখন রাডারের সাহায্যে দেখলে মনে হয় পৃথিবী থেকে কয়েক মাইল দূরে সরে যায় তারপর আবার ফিরে আসে। সম্পূর্ণ ঘটনাটি ঘটতে প্রায় এক মাস সময় লাগে। গ্রহটি কিন্তু এরকম করে না। শুক্র থেকে সূর্যের যা দূরত্ব তার তুলনায় আপাত বিচ্যুতি খুব কম। তবুও একটি বিরাট গ্রহকে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে বিচ্যুতি ঘটিয়ে আবার কক্ষপথে ফিরিয়ে আনতে গেলে কয়েক বিলিয়ন হাইড্রোজেন বোমার যা শক্তি সেই পরিমাণ শক্তি লাগবে। একটি লক্ষ্য বস্তুতে তরঙ্গ গিয়ে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তা পরিমাপ করে লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব পরিমাপ করা যায়। রাডার জ্যোতির্বিদেরা যা দেখতে পান তা আসলে সূর্যের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তরঙ্গগতি মন্থর হয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতি।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে স্যাপিরো কতগুলি বিখ্যাত পরীক্ষার দ্বারা আলোর মন্থরতা নিশ্চিত ভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন। মন্থরতার পরিমাণ ভবিষ্যতবাণীর সমপরিমাণই ছিল। স্যাপিরো শুক্র এবং মারকারি (বুধ) গ্রহ নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই মন্থরতা লক্ষ্য করলেন। এখানেও তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষার ফল প্রায় মিলে গেল। গ্রহগুলি যে মাসে সূর্যের সঙ্গে সমরেখার আসে তখনই এই ব্যাপারটি বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়। তবে সারা বছরের মোট পরিমাণই বেশী। আপাতঃদৃষ্টিতে শুক্র সর্বসমেত প্রায় পঞ্চাশ মাইল স্থানচ্যুত হয়। অতি আধুনিক কালে মঙ্গলের ত্বকে দণ্ডায়মান ভাইকিং মহাকাশযানের সঙ্গে বেতার আদানপ্রদান মাধ্যমে আরও বেশী নির্ভুলতা পাওয়া গেছে। মঙ্গল যখন সূর্যের অপর দিকে থাকে তখন সময়ের বিলম্ব ঠিক সেই পরিমাণ হয় যা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী হওয়া উচিৎ। এখানে স্যাপিরোর উক্তি স্মর্তব্যঃ "ভাল কি মন্দের জন্য জানি না সৌরমণ্ডলীই হলো সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ পরীক্ষার জন্য ভাল পরীক্ষাগার।"

আকাশে ট্রামলাইন

১। শক্তির উৎসবিহীন কোন বস্তু বিকৃত স্থানে যতদূর সম্ভব সরল রেখায় চলে।

২। একটি নির্দিষ্ট গতিবেগেই কোন বস্তু একটি ভারী বস্তুর চারিপাশে ঘুরবে।

৩। আইনস্টাইনের বর্ণনা নিউটনের থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়।

৪। আইনস্টাইন নির্দেশিত কক্ষপথ নিজেই চারিদিকে ঘোরে।

৫। কক্ষপথের ঘূর্ণন লক্ষ্য করা সম্ভব।

স্থানের বক্রতার সবচেয়ে রাজকীয় লক্ষণ হলো পৃথিবীর চারিপাশে চন্দ্রের বক্র পথে যাওয়া। বক্রপথে পৃথিবীকে মাসে একবার প্রদক্ষিণ করে চন্দ্র। সূর্যের চারিপাশে পৃথিবীও বক্রপথে ঘোরে এবং তাও বছরে একবার। মনে করা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি গ্রহ ও তাদের চন্দ্রের জন্য আকাশে ট্রাম লাইন পাতা আছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা ভাবতেন ভগবান বা কোন পরী এই গ্রহদের চালনা করছেন। নিউটন আবিষ্কার করলেন যে মাধ্যাকর্ষণজনিত বল এইসব গ্রহদের গতিবিধি সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। আইনস্টাইন মাধ্যাকর্ষণের কথা তুলে দিলেন আর তার বদলে বললেন গ্রহ এবং চন্দ্রেরা মুক্তভাবে পড়ছে এবং বক্রক্ষেত্রে যতটা সম্ভব সোজাভাবে পড়ছে। আগেই বলা হয়েছে যে ভারী বস্তু স্থান ও কালকে বিকৃত করে এবং এই বিকৃতি ভারী বস্তুর কাছাকাছি অন্যান্য বস্তুর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে। নির্দিষ্ট গতি নিয়ে চলমান কোন বস্তুকে একটি ভারী বস্তুর চারিপাশে চক্রাকারে আবর্তিত করতে স্থানের বক্রতাই যথেষ্ট।

পৃথিবীর চারিপাশে চন্দ্রের কিংবা সূর্যের চারিপাশে গ্রহদের প্রায় বৃত্তাকার পথ কিন্তু একটি পতনশীল বস্তুর গতিপথ বলে মনে হয় না। এই দুটি জিনিষের মধ্যে যদি মিল খুব স্পষ্ট হত তাহলে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র প্রাচীন গ্রীসেরই কেউ আবিষ্কার করে ফেলতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিভাধর ব্যক্তি নিউটন আবিষ্কার করেন যে মাধ্যাকর্ষণ চন্দ্রকে চালনা করে সেই মাধ্যাকর্ষণই একটি আপেলকে মাটির দিকে চালনা করে।

মাধ্যাকর্ষণের ফলে যে কক্ষপথ তৈরী হচ্ছে তা সাধারণকে বোঝাতে গিয়ে নিউটনকে অনেক কৃত্রিম উপগ্রহের কথা ভাবতে হয়েছিল। তাঁর ভাবনা বাস্তবরূপ

পেলো স্পুটনিকে তাঁর তিন শ' বছর পরে। নিউটন তাঁর পাঠকদের উচ্চ পর্ব্বতে অনুভূমিক ভাবে রাখা বন্দুকের কথা ভাবতে বললেন। কম গতিতে বন্দুক থেকে একটি গুলি ছুড়লে তা নীচের দিকে বেঁকে মাটিতে পড়বে। কিন্তু বন্দুকের গুলির গতি যদি খুব বেশী হয় এবং খুব দূরগামী হয় (পৃথিবীর প্রান্তরেখা ছাড়িয়ে) তাহলে নতুন ধরণের একটা ঘটনা ঘটতে শুরু করে। পৃথিবীর ত্বক পতনশীল বস্তু থেকে বেঁকে যায় এবং যার ফলে দূরত্বও বেড়ে যায়। যদি গুলির গতিবেগ খুব বেশী হয় তাহলে মাধ্যাকর্ষণের ফলে গুলির বেঁকে যাওয়া নীচেরকার মাটি বেঁকে যাওয়ার দ্বারা পরিপূরণ হয়ে যাবে।

গুলিটি নীচে পড়তেই থাকবে কিন্তু কখনও মাটিকে স্পর্শ করবে না। এর পরিবর্তে এটি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতেই থাকবে। নীতিগত ভাবে এই ঘোরাটা হবে অনন্তকাল ধরে। প্রারম্ভিক বিন্দুতে আসার পর আবার পূর্বেকার গতি নিয়ে চলতে থাকবে (এখানে বাতাসের বাধা বাদ দেওয়া হয়েছে) দেখা যাবে গুলি একটি কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত হয়েছে। নিউটনের তত্ত্বে মাধ্যাকর্ষণজনিত বল একটি তারের কাজ করে। এই তার উপগ্রহটিকে কক্ষপথে ধরে রাখে যেমন করে একটি দড়ি দিয়ে একটি পাথরের টুকরো ঘোরানো হয়। আইনস্টাইনের তত্ত্বে বল বলে কিছু নেই এবং উপগ্রহটি ভরশূন্যভাবে শূন্যে যে প্রাকৃতিক ট্রাম লাইন পাতা আছে সেই বরাবর চলতে থাকে।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব কথা বলা হল সেখানে মাধ্যাকর্ষণের ফলে সময়ের ও স্থানের বিকৃতি বোঝানো হয়েছে ঘড়ি ও আলোর মন্হরতার সাপেক্ষে, ভবিষ্যত সময়ের আলোক বুদ্‌বুদের ভারী বস্তুদের দিকে সরে যাওয়ার সাপেক্ষে এবং সর্বশেষে সূর্যের মতন ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি আলোকরশ্মির বেঁকে যাওয়ার সাপেক্ষে। কক্ষপথ সম্বন্ধে কল্পনা করা নির্ভর করে ভারী বস্তুর চারিপাশে অবস্থার ওপর।

কেন্দ্রে কাল্পনিক কৃষ্ণগহ্বর সমেত পৃথিবীতে ফিরে আসা যাক। দেখা যাক এই কৃষ্ণগহ্বরের কি ভাবে তা চন্দ্র বা কৃত্রিম উপগ্রহের ওপরে আপন আধিপত্য বিস্তার করে, কৃষ্ণগহ্বরের চারিপাশে একটি সময় কক্ষ আছে যেখানে কৃষ্ণগহ্বরের দিকে যাওয়ার সময় ঘড়ির গতি কিন্তু খুব মন্হর হয়ে যায়। মাটির দিকে সরাসরি পতনশীল একটি আপেল মন্হর সময় সীমায় প্রবেশ করে ও এমন ভাবে গতি বাড়িয়ে নেয় যে সামগ্রিক শক্তির পরিমাণ ঠিক থেকে যায়। কিন্তু প্রকৃত একটি চক্রাকার কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ সম্পূর্ণভাবে একটি সময়কক্ষের মধ্যে থাকে এবং এর গতিশক্তির পরিমাণ পরিবর্তিত হয় না।

উপগ্রহের পার্শ্বগতির জন্য এটি যদিও হচ্ছে তবুও পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে

নির্দেশিত হচ্ছে না। এর গতির জন্য উপগ্রহের ভবিষ্যত সময় স্থানের একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রভাব বেশী। এর ভবিষ্যত ধারে বা পেছনের চেয়ে উপরের দিকেই হওয়ার সম্ভাবনা বেশী কেন না এর স্থান পরিবর্তন করতে গেলে হয় একটি মোটর চালাতে হবে নচেৎ কিছু দিয়ে আঘাত করতে হবে।

অনন্তের মধ্যে দিয়ে কোন কিছুর যাত্রাপথ 'মাধ্যাকর্ষণ ভবিষ্যত' যা নিকটবর্তী ভারী বস্তুর কেন্দ্রের দিকে থাকে এবং 'গতি ভবিষ্যত' যা তার বর্তমান গতিপথের ওপর থাকে এই দুটি জিনিষের মধ্যে একটি সমঝোতা। কোন শক্তি ব্যয়িত না হলে বা কোন বল সক্রিয় না থাকলে বস্তুটি একটি বক্রপথ নেবে।

একটি বক্রপথের জন্য দরকার হলো বস্তুটিকে উপযুক্ত গতিবেগে পাশের দিকে চলতে হবে। খুব ধীরে গেলে পড়ে যেতে হবে এবং মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করছে এমন বস্তুর সঙ্গে ধাক্কা খেতে হবে। খুব দ্রুত গতিতে গেলে শূন্যে চলে যেতে হবে। পৃথিবীর চারিপাশে চক্রাকারে ঘোরার জন্য প্রয়োজনীয় গতি মাধ্যাকর্ষণের কার্য্য-কারিতার ওপর নির্ভর করে। এই কারণে পৃথিবী থেকে সরে গেলে আকারে ছোট হয়ে যায়। চন্দ্র পৃথিবীর চারিপাশে কৃত্রিম উপগ্রহের তুলনায় অনেক কম গতিবেগ নিয়ে চক্রাকারে আবর্তন করে। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব দ্বিগুণ করে দিলে সময়ের মন্হরতার পরিমাণ প্রায় অর্ধেক হয়ে যাবে। একটি ভাল কক্ষপথের জন্য গতি শক্তিও অর্ধেক হয়ে যাবে এবং উপযুক্ত শক্তির জন্য যে গতিবেগের দরকার প্রত্যেকটি বস্তুর ক্ষেত্রে এক। সময় সম্পর্কে কারণ অনুসন্ধান কৃত্রিম উপগ্রহের গতিকে পূর্ববর্তী পড়ন্ত আপেলের বিষয়টির সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়। স্থানের বক্রতার দিকে তাকালে চক্রাকার গতির একটি ভাল বর্ণনা পাওয়া যায়। স্থানের প্রতিনিধিত্ব করছে এমন একটি সমতল রবারের টুকরোর কথা ভাবা যাক্ আর ধরা যাক এক ভারী ওজনের সাহায্যে এই রবারের তলটিকে বক্র করা হলো। আমরা পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়ালে চন্দ্র বা কৃত্রিম উপগ্রহকে বাঁকা পথে প্রতিযোগিতা অংশ গ্রহণকারী গাড়ী বলে ভাবতে পারি।

ছবিটি পরিষ্কার করার জন্য পৃথিবীর কাছে আলোক রেখার কথা ভাবা যাক। স্থানের বক্রতার প্রথম লক্ষণই হলো আলোর বেঁকে যাওয়া। সূর্যের দ্বারা নক্ষত্রালোকের বেঁকে যাওয়ার পরিমাণ খুবই সামান্য। পৃথিবীর বেলাতে এর পরিমাণ আরও কম। ভূত্বকে অনুভূমিক ভাবে চলমান আলোর গতিপথ এমন একটি বৃত্তের বৃত্তাংশ বরাবর চলে যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ প্রায় এক আলোকবর্ষ। আমরা কেউই একে সরল রেখার থেকে আলাদা করতে পারব না। এ সত্ত্বেও এটা হলো আমাদের কাছাকাছি স্থানের বক্রতার একটি লক্ষণ।

জাগতিক সকল বস্তু আলোর থেকে অনেক কম গতিতে চলে এবং সেই কারণে

তারা পৃথিবীর সন্নিকটে স্থানের বক্রতার দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়। তাদের কক্ষপথ আরও বেশী ভাবে বেঁকে যায়। অন্য ভাষায় বলতে গেলে তারা বৃত্তের বৃত্তাংশ অনুসরণ করে চলে এবং এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ভর করে গতিবেগের ওপর। তাহলে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে কোন গতিবেগে বস্তুটির বক্রতার বৃত্ত প্রকৃত পৃথিবীর চারিপাশে একটি বৃত্তে পরিণত হয় এবং যার ফলে বস্তুটি এর চারিপাশে একটি ছোট বৃত্তাকার কক্ষপথের সৃষ্টি করে। যে জিনিষটি দরকার সেটি হলো গতিবেগের বর্গ এবং তা আলোর গতিবেগের বর্গের সামান্য অংশ মাত্র হবে। এটি যেমন হারে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আলোকবর্ষের চেয়ে ছোট ঠিক সেইরকম। প্রয়োজনীয় গতিবেগ হলো সেইটি যা রাশিয়ানরা প্রথম স্পুটনিক ছাড়ার সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন। এর পরিমাণ হলো আলোর গতিবেগের ০'০০০০২৭ ভাগ অথবা প্রতি সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল। পৃথিবীর কাছাকাছি যে কোন উপগ্রহ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় নেয়।

পৃথিবী থেকে অনেক দূরে কি ঘটনা ঘটে? একটি আলোকরশ্মি পৃথিবী থেকে চন্দ্র যতদূর ততদূরে যখন আছে তখন যা বেঁকবে পৃথিবীর ত্বকের কাছ দিয়ে যাবার সময় বেশী বেঁকবে। চন্দ্রের মতন দূরত্বে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ স্থানকে কম বক্র করে। যদি কেউ গণনা করে চন্দ্রের কি গতিবেগ হওয়া উচিত যাতে কক্ষপথের বক্রতা পৃথিবীর থেকে দূরত্ব সবসময় সমান রেখে দেবে তাহলে দেখা যাবে যে তার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ০.৬৩ মাইল। স্বাভাবিক ভাবেই এই হলো সেই গতিবেগ যা চন্দ্রকে পৃথিবীর চারিপাশে মাসে একবার আবর্তন করায়। পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহের ক্ষেত্রে আগেকার সময় ও শক্তি থেকে যা পাওয়া গেছে সেই পরিমাণ ঘাটতিই পাওয়া যাবে। সুতরাং সময়ের মন্থরতা অথবা স্থানের বক্রতা একটি উত্তর দেয় এবং অবশ্যই তা দেওয়া উচিত।

হিসাব নেওয়ার জন্য আমাদের এখন চন্দ্র বা কৃত্রিম উপগ্রহ আছে। এর বক্রক্ষেত্রে চক্রাকারে আবর্তন করছে। যতটা সম্ভব সোজা এবং যতটা সম্ভব ধীর-গতিতে চলে তারা তাদের গতি ও পৃথিবীর থেকে দূরত্ব অনুযায়ী চক্রাকার ট্রামলাইনে ঘুরছে। এখানে কিন্তু ভর বা উপগ্রহের কি দিয়ে তৈরী সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। ঘূর্ণায়মান বস্তুটি একটি স্বাভাবিক চন্দ্র বা স্কাইল্যাবের মত কোন কৃত্রিম যন্ত্র কিনা তার ওপর কিছুই নির্ভর করে না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আইনস্টাইন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মাধ্যাকর্ষণকে দেখেছিলেন এবং কৃত্রিম উপগ্রহদের গতিবেগ ও পৃথিবীর থেকে দূরত্বের মধ্যে যে সম্পর্ক নিউটন নির্ণয় করেছিলেন তিনিও সেই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। সূর্যের চারিপাশে ঘুরে বেড়ানো গ্রহদের বেলাতে প্রযোজ্য

নিয়মগুলো সৌরমণ্ডলীর রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে নিউটন ও কেপলার আবিষ্কার করেছিলেন। এ সম্বন্ধে ভল্টেয়ারের বক্তব্য ঃ—'প্রকৃতি বলে কিছু নেই, শিল্পই হলো সব......রয়েল সোসাইটির কিছু বুদ্ধিমান লোক জিনিষগুলোকে সেই ভাবেই সাজিয়ে রেখেছে।' আইনস্টাইন ধন্যবাদের পাত্র এই কারণে যে আমরা এটা দেখতে অধিকারী হচ্ছি যে শিল্পকর্ম ছাড়াও স্বাভাবিক ভাবেই আলো পতনশীল এবং একটি ভারী বস্তুর সামনের স্থান বেঁকে যায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হলো তাতে একটি আপেল সরাসরি মাটির দিকে পড়ে এবং অন্যান্য বস্তু বৃত্তাকার পথে। প্রকৃত বস্তুদের কক্ষপথ একেবারে বৃত্তাকার না হয়ে কিছুটা ভিন্ন হয়। সূর্যের চারিদিকে গ্রহদের কক্ষপথ পরাবৃত্ত একটি পরিপূর্ণ বৃত্ত নয়। এটি আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী কেপলার এবং এর ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠল নিউটনের তত্ত্ব। উপবৃত্তাকার কক্ষপথে গ্রহরা সূর্যের দিকে বেশী কাছে যায় আবার তারপর ঘুরে ওপরের দিকে উঠে আসতে শুরু করে। সোজাসুজি পতনের বেলাতে এবং চক্রাকার গতির ক্ষেত্রে নিউটন ও আইনস্টাইনের তত্ত্ব এক ফল দেয়। সুতরাং এটা ভেবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে উপবৃত্ত কক্ষপথের চিন্তার মধ্যে দুটি মিল আছে। যে পর্যন্ত নিউটনের তত্ত্বের সঙ্গে আইনস্টাইনের তত্ত্ব মেলে সে পর্যন্ত আইনস্টাইনের তত্ত্ব নিউটনের তত্ত্বে সময়-সংক্রান্ত সকল ঘটনাকে সমর্থন করতে পারে।

গ্রহদের গতিবিধি সংক্রান্ত বিজ্ঞান একটি প্রয়োজনীয় বিষয়। আজকাল এর সাহায্যে বোঝা যায় পৃথিবীর বরফযুগে কিভাবে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে বরফ নড়াচড়া করত। চন্দ্রের এবং কিছু পরিমাণ সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বেঁকে যাওয়া ঘূর্ণনশীল লাট্টুর মতন পৃথিবীর অক্ষকে চারিপাশে ঘোরায়। সৌরমণ্ডলীর অন্যান্য গ্রহরা বিশেষ করে বৃহস্পতি, মঙ্গল এবং শুক্র পৃথিবীর বেঁকে যাওয়াকে এবং কক্ষপথের চেহারাকে প্রভাবান্বিত করে। এর ফলে বিভিন্ন ঋতুতে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে আপতিত সূর্য কিরণের দীপ্তির হেরফের হয়ে যায়। প্রায়শই সৌভাগ্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং পৃথিবীর কক্ষপথ সংযুক্ত হয়ে বরফের আস্তরণকে সূর্যালোকে উদ্ভাবিত করে যেমনটি ঘটে ছিল প্রায় দশ হাজার বছর আগে বরফ যুগে। মাধ্যাকর্ষণ আজও আমাদের গ্রহ নিয়ে খেলা করে চলেছে।

ওপরের যে ঘটনাগুলি বলা হলো তাতে আইনস্টাইন ও নিউটনের চিন্তাভাবনা মিলে যায়। যদি দুটি তত্ত্বের মধ্যে তফাৎ কিছু না থাকে তাহলে এটা একেবারে পছন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে যে মাধ্যাকর্ষণের কোন্ তত্ত্বটি আমরা গ্রহণ করব। কিন্তু পূর্বসূরীদের সঙ্গে আইনস্টাইনের তত্ত্বের খুব সূক্ষ্ম তফাৎ আছে। এই তফাৎকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আমাদের কৃষ্ণগহ্বরের ধারণায় ফিরে যেতে হবে।

মনে রাখতে হবে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ কৃষ্ণগহবরের যে পরিমাণ ব্যাস নির্দিষ্ট করে তা নিউটন-তত্ত্বের সাহায্যে যে পরিমাণ পাওয়া যায় তার দ্বিগুণ। সময়ের মন্থরতা স্থানের বক্রতা প্রত্যেকের ওপর প্রত্যেকের প্রতিক্রিয়াকে বাড়িয়ে দেয়। কৃষ্ণ-গহবরের কেন্দ্রীন ভর মানুষ যা ভাবতে পারে তার অন্ততঃ দ্বিগুণ দূরত্বে আলোকে পরাভূত করতে পারে। সূর্যের কেন্দ্রে কাল্পনিক কৃষ্ণগহবরের ব্যাস হলো মাত্র ৩.০ মাইল। সূর্য থেকে বহু দূরত্বে অবশ্য এটা মাধ্যাকর্ষণের চরিত্রের ওপর কোন তফাৎ সৃষ্টি করেনা। কিন্তু যতই এর কাছে আসা যাবে ততই মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়া বাড়তে থাকবে এবং নিউটনের তত্ত্বে যা নির্দিষ্ট আছে তার চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণেই বাড়বে। উপবৃত্তকার কক্ষপথ বজায় রাখতে গিয়ে সূর্যের কাছাকাছি যে কোন গ্রহকে কিছুটা দ্রুত চলতে হবে। গ্রহ উপবৃত্তে ঘোরার সময় সূর্যের দিকে ঝাপ দিচ্ছে, ঘুরে আবার ওপরের দিকে উঠে আসছে। সূর্যের কাছাকাছি থাকার সময় গ্রহটি কিছুটা অতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণ অনুভব করবে। দূরবর্তী কোন দর্শক মনে করবে বেরিয়ে আসার আগে গ্রহটি একটি সময় সীমার মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে থাকছে।

নিউটনের তত্ত্ব অনুসারে একটি গ্রহ অনন্তকাল ধরে একই কক্ষপথে চলবে অবশ্য অন্যান্য গ্রহদের সম্ভাব্য প্রভাবকে বাদ দিয়ে। আইনস্টাইনের তত্ত্বে কিন্তু তা হয় না। প্রত্যেক গ্রহ একবার কক্ষপথ সম্পূর্ণ করার পর পথ পরিক্রমার জন্য অন্য পথ ধারণ করে। সূর্যের চারিপাশে ঘোরার পর পেরিহিলিয়ন সামনের দিকে সরে যাবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমস্ত উপবৃত্তাকার কক্ষপথটি সামগ্রিকভাবে আস্তে আস্তে ঘুরছে।

এই ধরণের ঘোরার পরিমাণ খুবই সামান্য। পৃথিবী যে প্রত্যেক জানুয়ারী মাসে সূর্যের কাছাকাছি আসে তার বেলাতে পেরিহিলিয়নের বিচ্যুতির পরিমাণ হবে ৬০০ মিলিয়ন মাইল চক্রাকারে আবর্তনে মাত্র কয়েক মাইল মাত্র। আইনস্টাইনের কাছে কতকগুলি ভাল তথ্য ছিল যার সাহায্যে তিনি তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব ও নিউটনের তত্ত্বের মধ্যে যে সূক্ষ্ম তফাৎ আছে তা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম ছিলেন। এই ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশী পরিমাণে সংঘটিত হয় ভেতরকার গ্রহ বুধ বা মার্কারির বেলাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদেরা বুধের গতিবিধির মধ্যে একটি বৈষম্য আবিষ্কার করেছিলেন। একটি অদৃশ্য গ্রহ ভালকানের উপস্থিতি ধরে নিয়ে তাঁরা বুধের গতিধিধির এই বৈষম্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যখন ভালকানের অস্তিত্ব প্রমাণ করা গেল না কেউ কেউ দুঃসাহসী হবার চেষ্টা করলেন এবং বললেন হয়ত নিউটনের তত্ত্ব সম্পূর্ণ সত্য নয়। আইনস্টাইনের তত্ত্ব এই বৈষম্যের সঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হলো। তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের এইটি

হলো যথার্থ প্রাথমিক সাফল্য।

বুধের গতিবিধি সঠিকভাবে বার করা জ্যোতির্বিদের পক্ষে একটি কণ্টকর ব্যাপার। বুধের পেরিহিলিয়ন মনে হয় প্রায় এক মিনিট (১ ডিগ্রির ষাট ভাগের এক ভাগ) আর্ক বছরে অতিক্রম করে এবং তার কারণ হলো পৃথিবীর অক্ষের নড়াচড়া। প্রকৃতপক্ষে বুধের পেরিহিলিয়ন এর এক দশমাংশ হারে চলমান। আইনস্টাইনের কোন বিশেষ তত্ত্ব এর জন্য দায়ী নয়। অন্যান্য গ্রহদের প্রভাবই এর কারণ। আইনস্টাইনের তত্ত্ব যে পরিমাণ বিচ্যুতি আশা করে তা পরীক্ষালব্ধ ফলের চেয়ে অনেক কম। বর্তমানকালে বিজ্ঞানী স্যাপিরো রাডারের সাহায্যে খুব সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান চালিয়েছেন। এতে বুধের পেরিহিলিয়নের বিচ্যুতির যে পরিমাণ আইনস্টাইন ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন তা খুব সূক্ষ্মভাবেই মিলে য়ায়।

বুধের চেয়েও আরো পরিস্কারভাবে যার কক্ষপথের বিচ্যুতি বোঝা যায় তা হলো পালসার। পালসার হলো দীপ্যমান নিউট্রন নক্ষত্র। ১৯৭৪ সালে প্রথম পালসার জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে ধরা পড়ে। আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে যাঁরা গবেষণায় মগ্ন তাঁদের কাছে পালসারের আবিষ্কার খুব আনন্দের। পালসার নামটি দিয়ে আকাশে এর অবস্হান বোঝায়। বেশীর ভাগ সময় একে বাইনারি পালসার বলা হয় কারণ এটি আরেকটি ধ্বংসপ্রাপ্ত নক্ষত্রের চারিপাশে খুব কাছে দ্রুতগতিতে ঘুরে বেড়ায় এবং এর ফলে দ্বৈত নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। পালসার অনেক দূরে প্রায় ৫,০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করে। এই পালসারের সঙ্গীটি হয়ত একটি শ্বেতবামন কিংবা দ্বিতীয় একটি নিউট্রন নক্ষত্র কিংবা কৃষ্ণগহ্বরের হতে পারে।

পালসার সেকেণ্ডে সতেরোবার বেতার শক্তি নির্গত করে। এই হিসাবে পালসার খুব ভালো ঘড়ির কাজ করে। এর কক্ষপথ প্রথমে পালসারকে পৃথিবীর দিকে ঠেলে দেয় তারপর পৃথিবী থেকে দূরে সরে আসে এবং ডপলার প্রক্রিয়ার সাহায্যে এটা বোঝা যায়। বিপরীত ক্রমে দ্রুতগতিতে ওপরে উঠে প্রতি আটঘণ্টায় মন্হর করে দেয়। দ্বৈত পালসারকে দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্য করে বিজ্ঞানী টেলার এর ক্রিয়াগুলি খুব নিপুণভাবে বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কয়েকমাস পরেও তিনি পালসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম ছিলেন এবং লক্ষ্য করলেন প্রথম তরঙ্গটি ঠিক নিয়মমাফিক আসছে। তরঙ্গে পৌঁছুবার যে সময় আগে থেকে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল তার সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফল একেবারে মিলে গেল। কক্ষপথের ঘূর্ণনটি বেশ লক্ষ্যণীয়। একটি পালসারের তার না-দেখা সঙ্গীর দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিমাণ প্রায় বছরে চার ডিগ্রি। সূর্যের চারিপাশে বুধের কক্ষপথের এগুবার যে পরিমাণ এটা তার চেয়ে প্রায় ৩০,০০০ গুণ বেশী।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের সাহায্যে গণনা করা যায় যে পালসারের ও তার সঙ্গীর যুগ্মভর সূর্যের ভারের চেয়ে ২.৮৮ গুণ বেশী।

বেতার জ্যোতির্পদার্থবিদ্‌দের সামনে এখনও অনেক কাজ বাকী। দুটি বস্তুর ভর নির্ণয় করে তাঁদের আইনস্টাইনের তত্ত্বের সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করতে হবে। সবচেয়ে উত্তেজক সম্ভাবনা হলো যে তাঁরা হয়ত দেখতে পাবেন যে কক্ষপথে পালসারের গতিবেগ ধীরে অথচ নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো এই দ্বৈত নক্ষত্রে দ্রুত ঘূর্ণায়মান ভরগুলি নতুন ভাবে বিকিরণের মারফৎ শক্তি হারাবে। ফলে দুটি বস্তু কাছাকাছি আসবে এবং তাদের গতিবেগ বেড়ে যাবে। গতির এই পরিবর্তন যদি পরীক্ষার সাহায্যে ধরা যায় তবে সে তা মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করবে খানিকটা ঘোরানো পথে। মাধ্যাকর্ষণ জনিত বিকিরণ এইটাই মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের প্রকৃত নাম হওয়া উচিৎ। এর কারণ হলো মাধ্যাকর্ষণের ফলে সাধারণ তরলে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় অনেকে তাকে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ বলে থাকেন। আইনস্টাইন প্রবর্তিত তরঙ্গকে অনেক অধ্যাপক কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ বলে থাকেন। আমরা সেই রীতিই অনুসরণ করব।

মাধ্যাকর্ষণের তরঙ্গ

১। বেঁকে যাওয়া স্থান জোয়ারের বল দ্বারা একটি বস্তুকে লম্বা করে।
২। আইনস্টাইন জোয়ার তরঙ্গ বা মাধ্যাকর্ষণের তরঙ্গ সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।
৩। মাধ্যাকর্ষণের তরঙ্গ ক্রমান্বয়ে বস্তুকে লম্বা করে।
৪। মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ খুবই দুর্বল।
৫। মহাজাগতিক প্রলয় অনুধাবনযোগ্য মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ সৃষ্টি করে।

সমুদ্রের ঢেউ আমাদের অতিপরিচিত একটি ঘটনা। যখন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে জোয়ারের জলস্রোত বয়ে যায় তখন নাবিকদের পরিশ্রমের অবধি থাকে না। একটি পোতাশ্রয় জলশূন্য হয়ে গেলে কাদার মধ্যে নৌকাগুলি আটকে যায়। আবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জোয়ারের জল এসে নৌকাগুলিকে ভাসিয়ে দেয়। ওপরের কথাগুলি থেকে মাধ্যাকর্ষণের ক্ষমতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়। জোয়ার হলো সূর্য ও চন্দ্রের সামনে স্থানের বক্রতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মহাজাগতিক সকল বস্তুর সাপেক্ষে চন্দ্র খুবই ছোট। তবুও যেহেতু চন্দ্র পৃথিবীর খুব নিকটে আছে যার জন্য জোয়ার ভাঁটার প্রভাব সূর্যের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। সুতরাং আমরা কাহিনীকে সরল করতে পারি কেবলমাত্র চন্দ্রের কথা ধরে। জোয়ার ভাঁটার সৃষ্টি চন্দ্র থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দূরত্বের দরুণ বিভিন্ন মাধ্যাকর্ষণের জন্য।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে কোন নাবিকের মাথার উপরে চাঁদের দূরত্ব পৃথিবীর অপর প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত নাবিকের চন্দ্র থেকে দূরত্বের পরিমাণের চেয়ে ৮০০০ মাইল কম। এই বিশ্বে যে সব মহাসাগর আছে তারা চন্দ্র গোলকের দ্বারা বিকৃত স্থানের বিভিন্ন অংশ পরিব্যাপ্ত করে। পৃথিবীর ওপর চন্দ্রে মাধ্যাকর্ষণ জনিত প্রতিক্রিয়ার গড় নিলে চন্দ্র যেখানে সোজাসুজি মাথার ওপরে থাকে তার নিকটবর্তী জলের ওপর প্রতিক্রিয়া হয় বেশী। এটি তখন মন্থর চন্দ্র সময়ের একটি সময়ন্তরে পরে। এই অবস্থাকেই আমরা স্ফীত হতে দেখি। অপর দিকে চন্দ্রের আকর্ষণ কম এবং সমুদ্রের জল চন্দ্রের বিপরীত দিকে বেড়ে যায়। যেখানে চন্দ্রকে দিগন্তে দেখা যায় সেখানে সমুদ্রের জলতল সবচেয়ে কম হয়।

সামগ্রিকভাবে প্রতিক্রিয়াটি হলো সমুদ্রতলের গোলককে চন্দ্রের দিকে ডিম্বাকৃতি

করে দেওয়া। চন্দ্রেরও নিজস্ব এই ধরণের আকার আছে। এই জন্য চন্দ্রের জোয়ার ভাঁটায় পৃথিবীর প্রতিক্রিয়ায় আমাদের দিকে চন্দ্রের একই দিক নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু পৃথিবী নিজস্ব কক্ষপথের চারিপাশে ঘোরে এবং যে মুহূর্তে বিকৃতির অংশে ঢোকে তখনই সমুদ্রের জলতল ওপরে উঠে যায়। ডিম্বাকৃতি বলে জোয়ার মোটামুটিভাবে দিনে দুবার হয়। যেহেতু চলমান জল এবং স্থলের মধ্যে ঘর্ষণ-জনিত বল সক্রিয় সেহেতু ঘূর্ণায়মান পৃথিবী জলস্ফীতিকে সঙ্গে নিয়ে চলে। এর ফলে চন্দ্রও সূর্যের আপাতগতির সাপেক্ষে সামান্য ভিন্ন দশায় থাকে। এছাড়া ঘর্ষণজনিত বল পৃথিবীর ঘূর্ণনকে মন্থর করে দেয়। আমাদের চব্বিশ ঘণ্টায় যে দিন আছে তা দুশো মিলিয়ন বছরে প্রায় এক ঘণ্টা হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বর্তমানে আমাদের যে বিষয় আলোচ্য তাতে জোয়ার ভাঁটা বক্রস্থান নির্দেশ করে। আলো কতখানি বাঁকবে তা পরিমিত হয় সেই স্থানের বক্রতার পরিমাপ থেকে। এর সঙ্গে উৎসের কাছে গেলে কি হারে ঘড়ি পরিবর্তিত হচ্ছে, কিংবা মাধ্যাকর্ষণ কি হারে তীব্র হচ্ছে তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। চন্দ্রের রেখা বরাবর সমুদ্র জলের বিকৃতি তীব্রতর মাধ্যাকর্ষণের একটি সরাসরি নির্দশন।

একটি ভারী বস্তুর সামনে বক্রস্থানটি নষ্ট হয়ে যায়। গোলকের ক্ষেত্রফল ও আয়তন ব্যাসার্দ্ধ থেকে যা আশা করা যায় তার চেয়ে কম। সেই কারণে যখন একটি বস্তু অপর একটি ভারী বস্তুর দিকে পড়ে তা জোয়ার ভাঁটার দৈর্ঘ বরাবর লম্বা হয়ে যায়। বস্তুটি ধার দিয়ে সংকুচিত হয় এবং তাতে আয়তন কমে যায় যাতে সংকুচিত স্থানে নিজের অবস্থান ঠিক করে নিতে পারে। যে বল আপেলকে মাটির দিকে পাঠায় বা চন্দ্রকে তার কক্ষপথে পরিচালনা করে তা দৃষ্টি বিভ্রম মাত্র—এটাই আইনস্টাইনের মত। কিন্তু জোয়ার ভাঁটার বল যে বক্রতার সৃষ্টি করে তা প্রকৃত। এরা একটি মানুষকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে।

জোয়ার ভাঁটাজনিত বিকৃতি সাধারণ অবস্থায় খুবই মোলায়েম। কিন্তু একটি কৃষ্ণগহ্বরের সামনে এদের ব্যবহার খুবই নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে। একটি কৃষ্ণ-গহ্বরের ওপরে পতনশীল একজন নভোচারী এত শক্তিশালীভাবে প্রলম্বিত বা সংকুচিত হবে যে কৃষ্ণগহ্বরে পৌঁছুবার আগেই যে লম্বা একটি স্পেগেটির মত দেখতে হয়ে যাবে। ডিম্বাকৃতি সমুদ্র ও নভোচারীর স্পেগেটির মতন হয়ে যাওয়া স্থানীয় বক্রতারই সুস্পষ্ট নির্দশন বহন করে।

জোয়ার ভাঁটায় লম্বিত হওয়ার আরেকটি উদাহরণ আছে। যদি একটির পর একটি পাথরের টুকরো ফেলা হয় তাহলে যতই তারা পড়তে থাকবে ততই তাদের মধ্যেকার দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকবে। প্রথম পাথরের টুকরোটি আগেই ত্বরিত হতে আরম্ভ করেছে বলে দ্বিতীয় পাথরের টুকরো থেকে সরতে থাকবে। দুটি পাথরের

মধ্যে আপেক্ষিক ত্বরণ স্থানের বক্রতার আরেকটি উদাহরণ।

একটি মহাকাশযান যার মধ্যে মোটরটি বন্ধ করা আছে তা কোন মাধ্যাকর্ষণ অনুভব করে না, সে ভারশূন্য। কিন্তু ভবিষ্যতের নভোচারীরা কৃষ্ণগহ্বরকে চিহ্নিত করার জন্য কোন একটা ব্যবস্থা চাইতে পারেন। তাঁরা জোয়ার ভাঁটার সহায়তায় অদৃশ্য কোন ভারী বস্তুর সন্ধান পেতে পারবেন। একটি সরল প্রক্রিয়া দলবদ্ধভাবে চলমান তাদের মধ্যেকার দূরত্বগুলি নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। খালি এবং সরল স্থানে তারা যদি গতিবেগকে এমনভাবে চালনা করেন যাতে তারা সুবিন্যস্তভাবে চলছে তাহলে বক্রস্থানের মুখোমুখি হলে সেই বিন্যাস একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে এবং তা রাডারের সাহায্যে ধরা পড়বে। কৃষ্ণগহ্বরের দিকে দিক নির্দেশ করছে এমন একটি সরলরেখা বরাবর মহাকাশযানদের মধ্যেকার দূরত্ব বাড়বে। এই সরলরেখার সঙ্গে লম্ব কোন সরলরেখা বরাবর মহাকাশযানগুলি পরস্পরের কাছে চলে আসবে। ধীরে ধীরে সমগ্র মহাকাশযানগুলি একটি তীরের আকার নেবে যে তীরের মুখটি কৃষ্ণগহ্বরের বরাবর আছে।

আইনস্টাইনের চমকপ্রদ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটি হলো—বক্রস্থানের সমষ্টি—কার্যত জোয়ার ভাঁটা বা ছোট ছোট ঢেউ তাদের সৃষ্টিকারী ভারী বস্তুদের অনেক দূরে শূন্যস্থান দিয়ে যাওয়া উচিত। বক্রতা পরিবর্তিত হচ্ছে এই ধারণাটি ছাড়া বক্রস্থানের অস্তিত্ব বোঝা খুবই সহজ সাধ্য নয়। মনে হবে যেন ভূমিকম্পের মতন একটি প্রলয় বয়ে চলেছে। এই কারণেই ১৯৭০ সালে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের অনুসন্ধান প্রয়োগবিদ্ বিজ্ঞানীদের কাছে অনুসন্ধানের একটি আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়াল।

১৯১৬ সালেই আইনস্টাইন তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের পরিণতি হিসাবে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের কথা বলেছিলেন। একইরকমভাবে তড়িৎ বিজ্ঞান ও চুম্বকত্বকে এককীকরণ করতে গিয়ে ম্যাক্সওয়েল তাঁর তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গটি আবিষ্কার করেন। মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ ও তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ সমান্তরাল দুটি তত্ত্ব। তড়িতাধানের গতিবিধির জন্যই তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্বের উৎপত্তি। একটি বেতার প্রেরক যন্ত্রে ইলেকট্রন ইতস্ততঃ যাতায়াত করে, পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন একটি স্তর থেকে লাফিয়ে অন্যস্তরে যায় এবং তাতে দৃশ্যমান আলোর সৃষ্টি হয়। উচ্চশক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রনগুচ্ছ কোন লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত প্রাপ্ত তাদের গতি রহিত হয় এবং তারই ফলে রঞ্জন রশ্মির উৎপত্তি। একইভাবে একটি ভর কম্পমান হলে তা মাধ্যাকর্ষণজনিত তরঙ্গ সৃষ্টি করবে। ঠিক যেমনভাবে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ অন্য তড়িতাধানের ওপর বল-প্রয়োগ করে তাকে মুক্ত করতে পারে ঠিক তেমনভাবে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ অন্য একটি ভারকে মুক্ত করতে পারে। মাধ্যাকর্ষণের তরঙ্গ কঠিন বস্তুদের যেমন, পৃথিবীর মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে যেতে পারে কোনরকম দুর্বল না হয়ে। যদি আমরা কল্পনা

করি যে একটি মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ ফুটবল খেলার মাঠের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর মধ্যে ঢুকছে তাহলে তা মাঠটিকে প্রথমে লম্বা ও সরু করবে এবং তার পরে ছোট এবং চওড়া করে দেবে।

মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ পৃথিবীর মধ্যে ভাব আদান-প্রদানের একটি উপায়। প্রকৃত পক্ষে খুব সাধারণ যুক্তিই তাদের অপরিহার্য প্রতিপন্ন করে। নক্ষত্র ও গ্রহেরা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় এবং চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গিয়ে শূন্যে বস্তুর বিন্যাসকে পরিবর্তিত করে দেয়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেমন করে বস্তুরা বুঝতে পারবে যে মাধ্যাকর্ষণের চরিত্রটি পাল্টাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক চন্দ্র পৃথিবীতে এসে পড়ল। পৃথিবী ও চন্দ্রের মাঝে কৃত্রিম উপগ্রহ। চাঁদের উপগ্রহ ও নানান প্রাকৃতিক বস্তু আছে। তাদের বর্তমান অবস্থিতি থেকেই মাধ্যাকর্ষণজনিত গতিবিধি নির্দিষ্ট হবে। তারা আর তাদের পুরানো কক্ষপথে ঘুরতে পারবে না। কারণ তারা সংকেতের সাহায্যে পরিবর্তনটি নজর করবে। এর অর্থই হলো মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের মত কোন শক্তিপ্রবাহ।

কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ খুবই দুর্বল হবে এটা আশা করাই সঙ্গত। যে সব পর্যবেক্ষকরা মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ যন্ত্রের সাহায্যে ধরতে চান তাঁদের পক্ষে এটা খুবই অসুবিধাজনক। বাতাস কলের ঘূর্ণায়মান হাত থেকে যে পরিমাণ শক্তি বেরিয়ে আসে তা আইনস্টাইন স্বয়ং নিজে গণনা করেছিলেন। দেখা গেল বাতাস কলটি এক মিলিয়ন বছর ধরে ঘুরলে ঘূর্ণন শক্তির বিলিয়ন বিলিয়ন-বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ শক্তি মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গে রূপান্তরিত হবে। পৃথিবীতে জীবন ধারণের জন্য মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের দুর্বলতা খুবই প্রয়োজনীয়। যদি আমাদের গ্রহ তার শক্তির বড় অংশ মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গে রূপান্তরিত করে দেয় তবে তা মানুষ সৃষ্ট হবার আগেই সূর্যকে ধ্বংস করে দিত।

ভরকেন্দ্র না সরবার দরুণই এই দুর্বলতার সৃষ্টি। কোন দিকে কিছু ভর সরে গেলে অবশ্যম্ভাবীরূপে কিছু ভর তার বিপরীত দিকে সরে যাবে। এর ফলে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। চন্দ্র পৃথিবীতে পড়লে যে জিনিষটি কেবলমাত্র পরিবর্তিত হতে পারে তা হলো কেবল ভরের বিন্যাস এতে চন্দ্র পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের যে প্রভাব মঙ্গলের ওপর পড়ে তার ওপর কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করবে না।

পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গকে ধরতে গেলে তরঙ্গ সৃষ্টির জন্য খুবই শক্তিশালী উৎসের প্রয়োজন। যে সব দ্বৈত নক্ষত্র পরস্পরের চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীতিগত ভাবে তারা ক্রমাগত শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ ছাড়তে থাকবে যদি অবশ্য তারা পরস্পরের কাছে আসে। ছায়াপথের মধ্যে যে সব দ্বৈত নক্ষত্র আছে তাদের থেকে

বেরিয়ে আসা যে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গগুলি পৃথিবীতে এসে পেঁছেছে সম্মিলিতভাবে তাদের ধরা খুবই শক্ত। কোন বিরাটকায় নক্ষত্রে বিস্ফোরণ ঘটলে যে ধরণের কম্পন হবে তাতে খুবই শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ বেরিয়ে আসার কথা। বর্তমানে যে সব যন্ত্রপাতি আছে তাদের সাহায্যে উপরোক্ত উপায়ে তরঙ্গ সৃষ্টি ধরা সম্ভব হতে পারে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধা হলো ঘটনার স্বল্পতা—একশো বছরে এ ধরণের ঘটনা হয়ত একবার মাত্রই ঘটে। অন্য ছায়াপথের মধ্যে যে সব নক্ষত্রগ্রাসী কৃষ্ণগহবর আছে তারাই কেবল ক্রমাগত মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। দুটি কৃষ্ণগহবরের মধ্যে সংঘর্ষ মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ উৎপাদনের ব্যাপারে খুবই সক্রিয় উৎস হতে পারে এবং বিশ্বে এধরণের সংঘর্ষ যতটা বিরল ভাবা যায় ততটা বিরল নয়।

মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গকে ধরবার জন্য প্রথম যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন ম্যারিল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জোসেফ ওয়েবার ১৯৬০ সালে। অধ্যাপক ওয়েবারের প্রয়াস চমকপ্রদ হলেও বহু বিজ্ঞানী মনে করেন যে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ ধরার যে দাবী তিনি করেছিলেন তা কিছুটা তাড়াহুড়ো ছিল। এমন কিছু তাঁর যন্ত্রে ছিল যা-মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ ধরার ব্যাপারে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারত। সবচেয়ে অসুবিধার ব্যাপারটি হলো যে ওয়েবার অধিকমাত্রায় মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ দেখতে পেলেন। এদের ব্যাখ্যা করতে হলে ছায়াপথের অন্ততঃ কয়েকটি সূর্যের সমান ভর লয়প্রাপ্ত হওয়া দরকার। শক্তিসংক্রান্ত এই সমস্যাটি ওয়েবার বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর অভিমত হলো: বিশাল পরিমাণ শক্তি নির্গমণের ব্যাপারটি এই সন্দেহই প্রতিষ্ঠা করে যে তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলগুলি সম্পূর্ণভাবে বুঝে ওঠা হয়নি। যাই হোক আমেরিকা বা ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় যেসব তরঙ্গগ্রাহক যন্ত্র বসানো হয়েছিল তারা ওয়েবারের দাবী অনুসারে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

১৯৭০ সালে আইনস্টাইনের জন্মশতবার্ষিকী। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর সর্বত্র মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ ধরবার জন্য নতুন ধরণের গ্রাহক যন্ত্র সৃষ্টি হলো। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যে দ্বৈত পালসারের কথা বলা হয়েছে তা মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ ছেড়ে শক্তি হারাবে। এই প্রক্রিয়াটি যদি আইনস্টাইনের তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে তাহলে পালসারের গতিবিধির মধ্যেই তা ধরা পড়া উচিৎ। পালসার সংক্রান্ত অনুসন্ধান একটু ঘুরিয়ে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং এটা হতে পারে পৃথিবীতে কোন গ্রাহক যন্ত্র মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ সরাসরিভাবে ধরার আগেই।

মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ ধরতে পারলেই যে কাহিনী শেষ হয়ে যাবে তা নয়। কিছু কিছু পরীক্ষা হয়ত একদিন আইনস্টাইনের ভবিষ্যতবাণী অনুযায়ী মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের অস্তিত্ব ধরতে পারবে। পদার্থবিজ্ঞানীরা কিন্তু সেইখানে থেমে থাকবে

না। তাঁরা আরো অনেক কিছু হয়ত জানতে চাইবেন, জানতে চাইবেন মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের গতিবেগ কত? এক্ষেত্রে সবচেয়ে সহজ যে উপায়টি হলো সুপারনোভার মতন একটি দৃশ্যমান ঘটনা অবলোকন করে তার থেকে বেরিয়ে আসা মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ সনাক্ত করা। আইনস্টাইন যদি নির্ভুল হয়ে থাকেন তাহলে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ আলোকস্ফূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই এসে পৌঁছুবে কেন না মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের স্বরূপ ও ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে তার মিল কতখানি তা দেখে যাচাই করা যাবে যে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সত্যতা কতদূর। আইনস্টাইনের প্রতিযোগী যে সব তত্ত্ব আছে তাদের মতে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের চরিত্রটি একেবারে ভিন্ন হবে এবং আইনস্টাইনের ভবিষ্যতবাণীর চেয়েও বেশী তীব্র হবে। পালসার সংক্রান্ত গবেষণায় কিন্তু এসব কথা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আইনস্টাইনের তত্ত্বের প্রতিযোগী কোন তত্ত্ব মাথা চাড়া দেবার মত উচ্চহারে পালসার শক্তি হারাচ্ছে না।

পৃথিবীর চারিদিকে গ্রাহক যন্ত্র বসালে তার থেকে বোঝা যেতে পারে আকাশের কোন দিক থেকে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গগুলি আসছে। মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গ জ্যোতির্বিদ্যায় আইনস্টাইনের বিশ্বকে দেখার একটি নবদিগন্ত উন্মোচন করবে। এর সাহায্যে বিস্ফোরণোন্মুখ ছায়াপথে বিরাটকায় কৃষ্ণ গহ্বরের সন্ধান পাওয়া যাবে। ধরা পড়বে কোয়াসার যা নিশ্চিতভাবে মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উৎস হবে। কৃষ্ণগহ্বরের মধ্যে অপ্রতুল অথচ সুতীব্র সংঘর্ষ এবং তার ফলে সৃষ্ট কম্পন বিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরেও ধরা পড়বে।

আলোক তরঙ্গ যেমন ফোটনের সমষ্টি ঠিক তেমনি ধরা হয় মাধ্যাকর্ষণ তরঙ্গও এক ধরণের কণার সমষ্টি যাদের নাম হলো গ্র্যাভিটন। এইসব কণাদের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করার মানেই হলো শূন্যের বক্রতাকে বোঝা। বিশ্বে যে সমস্ত বস্তুর ভর আছে তাদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়ার আদানপ্রদান করে গ্র্যাভিটনেরা। গ্র্যাভিটনেরা নিজেরাই শক্তি বদল করে, তারা ভারী এবং একটি গ্র্যাভিটন আরেকটি গ্র্যাভিটন দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে যেসব কণারা মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়াকে বদল করে তারাই আবার নিজেদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া অনুভব করে। এই কারণে তারা বক্রপথ বরাবর বিক্ষিপ্ত হয়। গ্র্যাভিটনদের মধ্যে এই প্রবণতার জন্য কোন স্থানের বক্রতার সৃষ্টি হয়।

গ্যালিলিও রহস্য

১। মাধ্যাকর্ষণ ও ত্বরণের প্রতিক্রিয়াগুলি এক।

২। প্রত্যেক বস্তু একই হারে পড়বে।

৩। ত্বরিত মহাকাশযানে আলো বেঁকে যায়।

৪। ত্বরিত মহাকাশযান তার পেছনে কৃষ্ণগহ্বর সৃষ্টি করতে পারে।

৫। চন্দ্রের গতি আইনস্টাইনের সমতুল্যতা নীতি প্রতিষ্ঠা করে।

বস্তুদের সকল স্বাভাবিক ব্যবহারের মধ্যে পতন একটি। শূন্যে ভ্রমণ করা মানেই হচ্ছে পড়া কিন্তু পৃথিবীর সাপেক্ষে বেশীর ভাগ সময়ই আমাদের কোন পতন ঘটে না। সত্যি করে পৃথিবীর কেন্দ্রে কোন কৃষ্ণগহ্বর নেই যদিও একটি আপেল বা কলাগাছে পিছলে পড়া কোন মানুষ এমনভাবে পড়বে যেন কৃষ্ণগহ্বরের অস্তিত্ব আছে পৃথিবীর কেন্দ্রে। শক্ত মাটিই তাদের কেন্দ্রের দিকে যেতে বাধার সৃষ্টি করে। আমাদের গ্রহদের মধ্যে যেসব পরমাণু আছে তারা মাধ্যাকর্ষণের তুলনায় অনেক দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ যে কারণে তারা মিলিত হয়ে আমাদের দাঁড়াবার মত শক্ত পাহাড় তৈরী করে। আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে পতনক্ষমতা ত্বরণ হিসাবে আসে—ক্রমাগত গতি আহরণ এমন কি যখন কোন একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি তখনও।

এ ধরণের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটি হেলিকপ্টার প্রয়োজনীয় সূত্রগুলি সরবরাহ করতে পারে। একটি হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনকে ক্রমাগত কাজ করে যেতে হয় যাতে তা পড়ে না যায়। চালক এবং যাত্রীদের মনে হয় যে যদিও হেলিকপ্টারটি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তবুও তাদের বসার আসনগুলি ওপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছে। তাদের কোন কষ্ট হয় না কেন না মাটিতে বসে থাকলে তাঁদের যে অনুভূতি হত হেলিকপ্টারের ভেতরেও সেই অনুভূতিই বজায় থাকে। যদিও হেলিকপ্টারটি তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠে তাহলে সীটগুলো লোকেদের ওপর বেশী চাপ দেয়। তাদের নিজেদের আরও ভারী মনে হয় এবং মনে হয় যেন পেটের সব কিছু পেছনে পড়ে থাকছে। এই যে ওপরের দিকে চাপ একে প্রায়ই 'g-বল' বলা হয়। বাধাহীন পতনের ক্ষেত্রে এটা শূন্য g পৃথিবীর ত্বকে অথবা চলমান হেলিকপ্টারে এটি হলো g।

ধরা যাক্ একজন নভোচারী দ্রুতগামি একটি মহাকাশযানে পৃথিবীতে ফিরে

আসছে বহুদিন বাদে এবং তার পর্যাপ্ত পরিমাণে শক্তি সঞ্চিত আছে। নভোচারীকে পৃথিবীতে ফিরে আসার আগে বহুল পরিমাণে গতি হারাতে হবে। এর অর্থ হলো তার জাহাজটিকে চারিদিকে ঘোরাতে হবে এবং রকেটটিকে সামনের দিকে চালনা করার জন্য প্রজ্বলিত করতে হবে। স্বচ্ছন্দের প্রয়োজনে সে রকেটটিকে এমনভাবে চালাবে যাতে 'g-বলের' পরিমাণ একক g হয়। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে বা বসে সেই অনুভূতিই পাবে যা সে পৃথিবীতে বসে পেত। কমপিউটার যন্ত্রের উড্ডয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে কাজ করে যাচ্ছে সে সমস্ত জানলার শার্সিগুলি টেনে দেবে যাতে বাইরের বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষের দরুণ গলে যাবার কোন সম্ভাবনা না থাকে।

নভোচারীর আত্মীয় বন্ধুরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাঁরা দেখবে আকাশযানটি ধীর গতিতে নেমে আসছে এবং সব সময় ধীর গতি হারাচ্ছে। মাটি থেকে ছাউনি পরিমাণ উঁচুতে আসলে এটি থেমে যাবে। এর সকল যন্ত্র তখনও সক্রিয় থাকবে যার জন্য আত্মীয় পরিজনেরা আর সামনে এগুতেই পারবে না। তাঁরা মোটর থামিয়ে নভোচারীর বাইরে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। সব জানালা বন্ধ থাকার দরুণ নভোচারী বুঝতেই পারবে না যে সে বাড়ি ফিরে এসেছে। এই সময় টেবিলে রাখা একটি বাটিকে সে ধাক্কা মারবে এবং সেটা পড়ে মাটিকে স্পর্শ করবে পৃথিবীতে যেমনটি পড়ে। যদি নভোযানটি ত্বরিত হয় বা একক 'g' বলে ব্রেক কসে তাহলে শূন্যে এমন ঘটনাই প্রত্যাশিত। ইতিমধ্যে সে মাটি থেকে ছয় ইঞ্চি উঁচুতে ঘুরতে থাকবে এবং এর জন্য প্রচুর পরিমাণ জ্বালানী নষ্ট হবে। এর ফলে আবহাওয়া দূষিত হবে ও পরিজনদের অপেক্ষমান রাখতে হবে।

তাঁদের হয়ত সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করতে হবে। আইনস্টাইন বুঝতে পেরেছিলেন যে এমন কোন সরল উপায় নেই যা দিয়ে পৃথিবীর ত্বকে থাকা এবং উপযুক্ত গতিতে চলমান মহাকাশযানে থাকাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে। বিপরীত ক্রমে সব জিনিষই এক মনে হবে। যদি নভোচারী তার কেবিনের ভেতরে শূন্যে একটি বল ছুড়ে দেয় তাহলে স্বাভাবিক প্রত্যাশা অনুযায়ী বলটি ওপরে উঠে আবার নীচে নেমে আসবে। একটি মহাকাশযানের ভেতরে প্রত্যেক বস্তুর পৃথিবীর মতই নিজস্ব ওজন আছে।

পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ এবং শূন্যে ত্বরণের মধ্যে কোন তফাৎ নেই—আইনস্টাইনের এই ব্যাখ্যা গ্যালিলিও সমস্যার সমাধান মুহূর্তমধ্যে করে দিল। এটা হলো কেন বায়ুশূন্য অবস্থায় সকলবস্তু সমান গতিবেগ নিয়ে পড়ে। আর তার অর্থ তারা একযোগে একরকমভাবেই ত্বরিত হবে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা

বাদের আলোকে আমরা ভাবতে পারি মাটি বিরাট রকেটের মত ওপরের দিকে ত্বরিত হচ্ছে এবং পতনশীল বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে স্থির হয়ে আছে। এই যদি প্রকৃত ধারণা হয় তাহলে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, মাটি সকল পতনশীল বস্তুর দিকে সমপরিমাণ ত্বরণে অগ্রসর হয়।

আগে কোন বস্তুর ভরের দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ধারণা ছিল। একটি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ওজন হিসাবে প্রতিভাত হয় এবং অপরটি হলো ত্বরণের সময় বিরুদ্ধাচারণ করে জাড্য হিসাবে প্রতিভাত হয়। আইনস্টাইনের আগে এটা বোঝা কষ্টসাধ্য ছিল যে একই ছবি দুটি জিনিষকে কি ভাবে বর্ণনা করতে পারে। মাধ্যাকর্ষণকে ত্বরণ হিসাবে ব্যাখ্যা করে এবং গ্যালিলিও সমস্যাকে সমাধান করে আইনস্টাইন দ্বৈত সমস্যাকে একক সমস্যায় রূপান্তরিত করেছিলেন।

কিন্তু আসল ব্যাপারটি হলো মুক্তভাবে পতনশীল মহাকাশযানে কোন ভারহীন বস্তু মোটরগুলি চালনা করার সঙ্গে সঙ্গে সহসা ভারী হয়ে ওঠে এবং ত্বরণকে বাধা দিতে শুরু করে।

কোন নভোযান এসে তাদের আঘাত করতে পারে। যার ব্যাখ্যা সবচেয়ে দরকার তা হলো কেন তারা সংঘাতিকভাবে বাধা দেয় এবং তাদের সামনের দিকে ঠেলতে নভোযানকে কেন জ্বালানী ব্যবস্থা করতে হবে। এটি কোন গতিবেগের দরুণ নয়। মোটর যখন বস্তুগুলিকে থামিয়ে দেয় সবাই তারা ভারহীন হয়ে পড়ে যদিও তারা আগের তুলনায় দ্বিগুণ গতিবেগ নিয়ে চলেছে। যতক্ষণ ত্বরণ আছে ততক্ষণই ভর সক্রিয় হয়ে ওঠে। এখানে ভরের তৃতীয় একটি ধারণা এসে যাচ্ছে। এটা হলো ভরশক্তির একাত্মকরণ সম্পর্কে আইনস্টাইনের ধারণা। একটি বস্তুর যতবেশী ভর বা শক্তি ততই তাকে চলমান করা শক্ত কাজ। একটি নির্দিষ্ট গতিতে ত্বরিত করতে যে অতিরিক্ত শক্তি লাগবে তা যে পরিমাণ শক্তি আছে তার ওপর নির্ভর করবে।

আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসা যাক। স্পষ্টতই মাটি রকেটের সাহায্যে ওপরের দিকে চালিত হচ্ছে না। অন্য কিছু না ভেবেই বলা চলে মাটি যদি সেকেণ্ডে বত্রিশ ফুট ত্বরণ নিয়ে ওপরের দিকে চলত তবে এক বছরের মধ্যে তা আলোর সমান গতিবেগ আহরণ করত। যাই হোক সমস্ত ধারণাটিই সাধারণ বুদ্ধির বিরোধী। এই অজুহাতেই আমরা আইনস্টাইনের তত্ত্বের এমন একটি প্রয়োজনীয় ও প্রাথমিক বিষয়ের আলোচনা স্থগিত রাখব যতক্ষণ না পর্যন্ত তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের ব্যাখ্যার ব্যাপারে খানিকটা অগ্রসর হতে পারছি। নভোযানে ত্বরিত হওয়া আর মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে যে যোগসূত্র আছে তা বুঝতে কেবল তখনই পারা যাবে যখন আমরা বুঝতে পারব পৃথিবীর সামনে বক্রস্থান কালের বিচিত্র প্রভাবে আপাতদৃষ্টিতে

আলোকগুচ্ছটি বেঁকে গিয়ে ত্বরণের সৃষ্টি করবে। নভোযানে আকাশ পরিক্রমার চেয়ে মাধ্যাকর্ষণ অনেক পুরনো ব্যাপার। সুতরাং উল্টে বলা ভাল যে একটি ত্বরিত মহাকাশযান মাধ্যাকর্ষণের মায়াজাল সৃষ্টি করে।

মাধ্যাকর্ষণকে যদি ত্বরণের সঙ্গে তুলনা করা যায় তবে তাদের মধ্যেকার যোগ-সূত্রটি খুবই চমকপ্রদ। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে এর থেকে সঙ্গে সঙ্গে এটাই বোঝা যায় যে আলো মাধ্যাকর্ষণের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। আমরা একথাটা আগেই বোঝাতে চেয়েছিলাম যখন বলা হয়েছিল যে একটা প্রক্রিয়া আশা করার ক্ষেত্রে নিছক ভর ছাড়াও আরও কিছু শক্তিশালী যুক্তি ছিল।

যদি কোন নভোচারী তার কেবিনের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে একগুচ্ছ আলোক-রশ্মি ধারের দিকে চালনা করে তাহলে দূরবর্তী দেওয়ালে একটু নীচের দিকে আঘাত করবে। নভোযানটি ত্বরিত না হলে এমনটি হবে না। নভোযানটি আলোর কণাদের পেছনে ফেলে আসতে চেষ্টা করে এবং নভোযান সাপেক্ষে আলো নীচের দিকে কিছুটা মাটির দিকে বেঁকে যাচ্ছে যেন কোন মাধ্যাকর্ষণ বল সক্রিয় রয়েছে।

আরও অন্তর্লীন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আইনস্টাইন প্রস্তাবিত 'মাধ্যাকর্ষণ-জনিত লাল আলোর সরণ' যা বলতে বোঝায় ভারী বস্তু থেকে কম শক্তির আলো নিঃসরণ তা উৎস ও দর্শকের মধ্যে আপেক্ষিক গতির জন্য সৃষ্ট ডপলার প্রক্রিয়ার সমান। যদি নভোচারী তার ত্বরিত মহাকাশযানের পায়ের তলায় কোন আলোর দিকে তাকায়, তাহলে সে কিছুটা রক্তিম দেখবে। এর কারণ হলো আলো উৎস থেকে বেড়িয়ে আসা এবং চোখে এসে পেঁছুনোর মধ্যে যে সময় তাতে মহাকাশযান ও নভোচারী কিছুটা গতিবেগ লাভ করেছে।

খুব আলাদা ভাবে দেখলে আলোর উৎস এবং চোখ পরস্পর থেকে সরে যাচ্ছে। মাধ্যাকর্ষণের মত ঘড়ির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপ্যার। একটি ত্বরিত মহাকাশযানের মাথায় রাখা আণবিক ঘড়িকে মাটিতে রাখা ঘড়ির চেয়ে সামান্য দ্রুত চলছে বলে মনে হবে। ত্বরিত মহাকাশযান নভোচারীকে ঘড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছে যার জন্য তাঁর মনে হবে ঘড়িতে পরবর্তী সেকেণ্ডটি একটু তাড়াতাড়ি অনুষ্ঠিত হলো যা মহাকাশযানটি স্থির গতিতে চললে ঘটত না। নীচের দিকে তাকালে বিপরীত ঘটনাটি ঘটবে। সেখানে ঘড়ি ধীরগতি হয়ে যাচ্ছে মনে হবে।

নভোচারীর কাছে এ ধরণের ঘটনা ঘটার পেছনের যুক্তি হলো মাথার ওপর থেকে চোখে আসতে ও মাটির তলা থেকে চোখে আসার বেলাতে আলোর আপেক্ষিক গতিবেগ সমান নয়। আলো সব সময় একই গতিবেগ নিয়ে চলবে—আপেক্ষিকতাবাদের এই যে মূল নীতি তা কেবল যে সব বস্তু স্হির গতিবেগ নিয়ে

চলছে তাদের বেলাতেই বা যেসব বস্তু বাধাহীনভাবে নীচে পড়ছে তাদের বেলাতেই সত্য। যেমনভাবে মাধ্যাকর্ষণ পথ, আলোর গতিবেগ এবং দূরবর্তী পর্যবেক্ষক সাপেক্ষে সময়ের হারকে পরিবর্তিত করে দেয় ঠিক তেমনি ত্বরণ পরিবর্তন আনে মহাকাশযানে। যদি কেউ আলোর উৎসের দিকে ত্বরিত হয় তাহলে তার কাছে আলোর গতিবেগ বেশী মনে হবে। অপরদিকে যদি কেউ আলোর উৎস থেকে ত্বরিত অবস্থায় দূরে সরে যায় তার মনে হবে আলোর গতিবেগ কমে আসছে। বহুক্ষণ ধরে ত্বরিত হলে নভোচারীর পেছন থেকে আসা আলো তার কাছে পৌঁছুতেই পারবে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রকৃত মহাকাশযান খুবই সামান্য সময়ের জন্য ত্বরিত হয় এবং তারপরেই মুক্তভাবে পড়তে থাকে। কিন্তু যদি কল্পনা করা যায় যে এমন একটি পারমাণবিক যন্ত্র সৃষ্টি করা গেল যার সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট ত্বরণ অনন্তকাল ধরে বজায় রাখা যাবে তাহলে মাধ্যাকর্ষণের একটি চমৎকার বিকল্প তৈরী হবে। যাত্রাপথে নভোযানটি একটি কৃষ্ণগহ্বরের সৃষ্টি করবে। দ্রুতগতিতে চলমান যাত্রীর কৃষ্ণগহ্বরটি বুঝতে গেলে আমাদের বিখ্যাত গ্রীক উপকথার কথা স্মরণ করতে হবে যেখানে এচিলেস ও কচ্ছপের মধ্যে একটি দৌড় শুরু হয়েছিল।

যে সময়ে দৌড়বীর কচ্ছপের প্রাথমিক জায়গায় গেল সেই সময়ে কচ্ছপ সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে গেছে। দৌড়বীর আরও একটু এগিয়ে যাবে এবং দেখবে কচ্ছপটি আরও একটু এগিয়ে গেছে। এই ব্যাপারটা অনন্তকাল চলতেই থাকবে। মনে হবে এচিলেস কখনই কচ্ছপটিকে ধরতে পারবে না যে কারণে সে তার তাঁবুতে বসে থাকবে। একটি চিত্তাকর্ষক গল্প, সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত কিন্তু একেবারেই অর্থহীন। এই ধাঁধার সমাধান হলো এই ধরণের অসীমসংখ্যক ঘটনা এক মুহূর্তের মধ্যে শেষ করে ফেলা যায়।

এখন ধরা যাক্ কচ্ছপটি অতিমাত্রায় সজীব একটি জীব। যে স্বাভাবিক ধীরভাবে যাত্রা শুরু করার পর ত্বরিত হচ্ছে। এর বাধাটি আরেকটি চমকপ্রদ রূপ নেবে কেননা এচিলিসের সমান গতিতে না দৌড়েও কচ্ছপটি এচিলেসের আওতার বাইরে চলে যেতে পারে। এর কারণ হলো যদিও এচিলেস দূরত্বকে কমিয়ে আনতে পারে কিন্তু কাজ করতে এবং কচ্ছপটিকে ধরতে তার ব্যায়িত সময় ক্রমশঃ বেশী হতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ যে সময়ে অতিমাত্রায় সজীব কচ্ছপটি এচিলেসের গতিবেগের ৯৯.৯ শতাংশ গতিবেগ নিয়ে চলেছে একশত গজ পেছনে থেকে কচ্ছপটিকে অতিক্রমের সময় কয়েক ঘণ্টা ছাড়িয়ে যাবে। কচ্ছপের গতিবেগ আরও বাড়ালে এই সময়ের পরিমাণ দাঁড়াবে কয়েক বছর আরও বাড়ালে কয়েক শতাব্দী। প্রথমবারের ধাঁধার মত এই কথাগুলো কিন্তু মিথ্যা নয়। আসল

ব্যাপারটা হলো অনুসরণকারী সমান গতিবেগে না দৌড়েও অনুসরণ করার হাত থেকে রেহাই পাওয়া।

প্রাণবন্ত কচ্ছপটি হলো নভোচারী। এচিলেস হলো তার পেছন থেকে আসা আলোকরশ্মি। ক্রমান্বয়ে ত্বরিত হলেও নভোচারী আলোর গতিবেগকে অতিক্রম করে যেতে পারে না ঠিকই কিন্তু নীতিগতভাবে তার কাছাকাছি আসতে পারে যেমন করে কচ্ছপটি এচিলেসের সমান গতিবেগ লাভ করেছিল। এমত অবস্থায় আলোর রশ্মি কখনই নভোচারীকে ধরতে পারবে না।

যদি ত্বরিত নভোচারী তার পাশের জানালা দিয়ে তাকায় তাহলে সে কিছুই বলতে পারে না। তারাগুলো তার দিক থেকে অন্তর্হিত হয়েছে কেন না তাদের থেকে আলো তার কাছে এসে পৌঁছুবে না। তার বেলাতে বিশ্বের একাংশ কৃষ্ণ গহ্বরে রূপান্তরিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি সে সাধন করতে পারবে (নীতিগত-ভাবে) কোনরকম অস্বাভাবিক অনুভূতি ছাড়াই। অবশ্য এর জন্য তার নভো-যানটি খুবই শক্তিশালী হওয়া দরকার। g পরিমাণ ত্বরণ একবছরের মধ্যে কৌশলটি আয়ত্ত করতে সাহায্য করবে। এর ওপরে, বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন ত্বরিত মহাকাশযান একটু গরম হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমনভাবে একটি মাধ্যাকর্ষীয় কৃষ্ণগহ্বর শূন্য থেকে শক্তি আহরণ করে ঠিক তেমনিভাবে ত্বরিত কৃষ্ণগহ্বর ও শক্তি শোষণ করে।

মাধ্যাকর্ষণের অভিজ্ঞতা আর ত্বরণের মধ্যে যে যোগসূত্র বর্তমান তাই হলো আইনস্টাইনের পদার্থবিজ্ঞানের মূল নীতি। এর দুটো মতবাদ আছে। দুর্বল যোগসূত্র নীতিতে (যা গ্যালিলিও বলেছিলেন) বলে যে সমস্ত বস্তু মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সমহারে পড়ে। সরল যোগসূত্র নীতি বলে যে, পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি সব জায়গায় ও সবসময় একই থাকবে। এটা হবে গতি বা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব বাদ দিয়ে। দ্বিতীয় মতবাদের জন্য আইনস্টাইন খুবই উন্মুখ হয়েছিলেন। কিন্তু মতবাদটির প্রত্যাশা খুব বেশী কেন না পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি গতি, মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াও তড়িৎবিজ্ঞান, পরমাণুবিজ্ঞান, তাপবিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের মিশ্রনে গঠিত। সব জায়গায় ও সব সময় বলতে স্থান ও সময়ের বিশাল পরিমাণকে বোঝায়। পর্যবেক্ষকের মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করতে গেলে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে।

যেহেতু তড়িৎ এবং পরমাণুদের মধ্যেকার বল খুবই শক্তিশালী সেহেতু তাদের কোনোরকম বৈপরীত্যও ধরা সহজ। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরবর্তী গ্যালাক্সিতে বা কোয়াসারে পারমাণবিক আলো দেখতে পান যেমনটি তারা দেখতে পান সাধারণ গবেষণাগারে। ভূবিজ্ঞান পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মের

কোনরকম পরিবর্তনের নজীর রাখে না। বিশেষ করে গাবনের ওকলোতে দুই বিলিয়ন বছর আগে সক্রিয় প্রাকৃতিক নিউক্লিয়ার রিয়াকটরের একটি বিশেষ উপাদান এইটাই প্রমাণ করে মাধ্যাকর্ষীয় বলগুলি এই বিরাট সময়ের ব্যবধানে বিলিয়ন ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম পরিবর্তিত হয়েছে। এমন সব নজীর আছে যাতে প্রমাণ হয় যে সরল যোগসূত্রতা নীতিটি সম্পূর্ণভাবে ঠিক। মাধ্যাকর্ষণের বেলাতে সমস্যাটা একটু চাতুরীপূর্ণ।

প্রথম প্রয়োজনীয়তা হলো যে গ্যালিলিওর নিয়ম আংশিকভাবে ঠিক হলে হবে না, একেবারে সঠিক হতে হবে। যতই সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের কথা ভাবা যাক না কেন মাধ্যাকর্ষণ ভর ও জাড্যিক ভর একই হতে হবে। ১৮৮৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯২২ সাল পর্যন্ত বুডাপেস্টে ভন ইয়টভস তাদের, খুব সঠিকভাবে তুলনা করেছিলেন। প্রথাগতভাবে অপকেন্দ্র বিচ্যুতি জাড্যিক ভরের ওপর নির্ভর করে এবং মাধ্যাকর্ষণ নির্ভর করে ভরের ওপরে। যদি এদের মধ্যে কোন বৈপরীত্য থাকেও এবং মাধ্যাকর্ষণ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ওপরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্রিয়া করত তা হলে তা তাঁর যন্ত্রে নিশ্চিতভাবে ধরা পড়ত। তিনি অনেক চেষ্টা করেও এই বৈপরীত্যের সন্ধান পেলেন না এবং তার পরীক্ষার নির্ভুলতা সন্দেহাতীত ছিল।

আরও কয়েকটি বিশিষ্ট পরীক্ষা চালান বিজ্ঞানী রবার্ট ডিকে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি সোনা বা এ্যালুমিনিয়ামের ওপরে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর যন্ত্রপাতির জটিলতা এবং সূক্ষ্মতা গ্যালিলিওকে অবাক করত। এই পরীক্ষায় আলোর রশ্মি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সামান্য পরিমাণের গতিকে ধরা, মাপার জন্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এক ডিগ্রি তাপমাত্রার দশ হাজার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ যাতে তারতম্য না ঘটে তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। পরীক্ষকরা অনেক দূরে অবস্থান করেছিলেন যাতে তাঁদের মাধ্যাকর্ষণ সিলিণ্ডারগুলির ওপর কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না করে। তাঁরা যা করছিলেন তার মূল কথাটি হলো যে তাঁরা এটাই লক্ষ্য রাখছিলেন যে সোনা এবং এ্যালুমিনিয়াম সূর্যের দিকে একই হারে পড়ে ঠিক যেমনভাবে গ্যালিলিও লক্ষ্য করেছিলেন সোনা ও তামা পৃথিবীর দিকে একই হারে পড়ে।

পৃথিবীর ত্বকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের তুলনায় ১৬০০ গুণ বেশী শক্তিশালী। যেহেতু পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিপাশে ঘুরছে তাই সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের দিক নিয়ত পরিবর্তিত হয়। যেমন সকালে পূর্ব দিকে বরাবর এবং সন্ধ্যায় পশ্চিমাভিমুখী। ডিকে এবং সহযোগীরা একটি রজ্জুতে ঝোলান অনু-ভূমিক ফ্রেম থেকে সোনা ও এ্যালুমিনিয়ামের সিলিণ্ডারগুলি ঝুলিয়ে দিলেন। যদি

দুটি বস্তুর মধ্যে সূর্যের মাধ্যাকর্ষণজনিত প্রতিক্রিয়ার কোন তফাৎ থাকত তাহলে ফ্রেমটি সামান্য পরিমাণে দুলত প্রতি চব্বিশ ঘণ্টা অন্তর। ১৯৬০ সালে পরীক্ষকেরা দেখতে সমর্থ হলেন যে সোনা বা এ্যালুমিনিয়ামের ওপর মাধ্যাকর্ষণ প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কোন তারতম্য নেই। কয়েক বছর পরে মস্কোতে অনুরূপ একটি পরীক্ষা চালানো হয় এবং এখানে ব্যবহার করা হয়েছিল প্লাটিনাম ও এ্যালুমিনিয়াম। এই পরীক্ষা আরও সঠিক হওয়া সত্ত্বেও এবারেও কোন তারতম্য ধরা পড়ল না।

দুর্বল যোগ সূত্রের ব্যাপারে ওপরের পরীক্ষাগুলি খুবই চিত্তাকর্ষক। কিন্তু এখানে একটি ত্রুটি আছে। যেসব ভর নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছিল তারা খুবই ছোট। সুতরাং এরকম সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে খুব ভারী বস্তুরা কিছুটা ভিন্ন চরিত্র দেখাবে। প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী যোগসূত্রের নীতিটি যদি সুকঠিনভাবে সত্য না হয় তাহলে একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। এটা হলো মাধ্যাকর্ষণ তার নিজের সঙ্গে এবং যে মাধ্যাকর্ষণজনিত শক্তি ধরে রেখেছে তার সঙ্গে ভিন্ন রকমভাবে ব্যবহার করে। অন্যান্য শক্তির ক্ষেত্রে এই ব্যবহারটি ভিন্ন রকমের হতে পারে। এই বিষয়টি অনুসন্ধান করার জন্য সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে একটি চিত্তাকর্ষক পরীক্ষার উদ্ভব হয়েছে।

পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মগুলি সব জায়গায় এক হবে—শক্তিশালী যোগসূত্রের এই নীতিটি যাচাই করতে যাওয়ার ব্যাপারে একটি সমস্যা হলো ঠিক কি জিনিষটা পাওয়া দরকার সেটা জানা। কিন্তু আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বটি রচনা করার পর থেকে অন্যান্য লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করতে শুরু করেন যে সব তত্ত্ব আইনস্টাইনের নীতিটিকে ব্যহত করে। আইনস্টাইনের প্রতি অসীম আস্হাসম্পন্ন বিজ্ঞানীরা, যাঁরা জানেন যে এই সব তত্ত্ব নিশ্চিত ভাবে ভুল প্রমাণিত হবে তাঁদের কাছেও এইসব তত্ত্ব সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করার কাজে কার্যকরী বলে মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণ সংক্রান্ত সকল আধুনিক তত্ত্বগুলির আলোচনা বিরক্তির সৃষ্টি করতে পারে। বারোটির মত বিবিধ তত্ত্বের মধ্যে যেটি সবচেয়ে শক্তিশালী বলে বিবেচিত এখানে কেবল তারই উল্লেখ করা হবে। ১৯৬১ সালে কার্লবার্জস্ ও রবার্ট ডিকে এই তত্ত্বটি প্রস্তাব করেন। সংক্ষেপে আমরা একে ডিকের তত্ত্ব নামে আখ্যাত করব। ক্রমশ এই তত্ত্বটি আইনস্টাইনের তত্ত্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেছিয়ে পড়লেও একে ডিকের তত্ত্বের দুর্বলতা হিসাবে ভাবলে চলবে না। বিপরীতভাবে তিনি আপেক্ষিকতাবাদের একজন প্রথম সারির তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষক।

ডিকের মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বটি প্রকৃতপক্ষে আইনস্টাইনের বক্রস্হান কালে

সম্প্রসারিত নিউটনের তত্ত্ব। বিশ্ব যত বাড়ছে তত মাধ্যাকর্ষণ দুর্বল হয়ে পড়ছে। এই কথাটি আইনস্টাইনের তত্ত্বের সঙ্গে তফাৎ রচনা করছে। ডিকের মতে প্রতি বিলিয়ন বছর মাধ্যাকর্ষণ কয়েক শতাংশ কমে। সুতরাং বিলিয়ন বছর আগে পদার্থবিদ্যার নিয়মগুলি ভিন্ন ছিল। এই কথার মানে দাঁড়াচ্ছে শক্তিশালী যোগসূত্রতার নিয়মটি আর খাটছে না।

মাধ্যাকর্ষণের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার মান আইনস্টাইন যা বার করেছিলেন ডিকের লব্ধ মান তাদের থেকে ভিন্ন। সূর্যের কাছে রাডার তরঙ্গের মন্থর হয়ে যাওয়া ব্যাপারটি প্রথম পরিমাপ করেন স্যাপিরো। আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকে এই মন্থর হয়ে যাবার যে পরিমাণ পাওয়া যায় ডিকের তত্ত্ব থেকে দেখলে তার মান কিছুটা কম হবে। সূর্যের কাছে আলোর বিক্ষেপের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি অনুরূপ। বুধের কক্ষপথটিও সামান্য ধীর গতিতে ঘোরা উচিত। এই সকল পরীক্ষা থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে ডিকের চেয়ে আইনস্টাইনের তত্ত্বই বেশী নিরাপদ।

এছাড়া ডিকের তত্ত্ব অনুযায়ী অন্যান্য রকমের শক্তির চেয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কিছুটা ভিন্ন চরিত্র দর্শায়। এর ফলে পৃথিবীর চারিপাশে চন্দ্রের কক্ষপথ কিছুটা ভিন্ন হওয়া উচিত এবং সূর্যের দিকে পৃথিবীর তুলনায় আরও দ্রুতগতিতে ধাবিত হওয়া উচিত। এটি গ্যালিলিও ও আইনস্টাইনের ধারণার বিরুদ্ধে যায়। যদি আইনস্টাইন ভ্রান্ত এবং ডিকে ঠিক হতেন তাহলে চন্দ্রের কক্ষপথ সূর্যের দিকে বেশ কিছু সরে যেত। কেন না সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থান প্রত্যেক মাসে পরিবর্তিত হয়। চন্দ্রের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সামান্য হলেও নিয়ম অনুযায়ী তারতম্য ঘটত।

এ ধরণের সামান্য পরিবর্তনকে ধরার জন্য যে সূক্ষ্মতার দরকার তা সম্ভব করা যায় লেসার রশ্মির সাহায্যে। শূন্যে মিলিয়ন মাইলের মত দূরত্ব, অতি সূক্ষ্মভাবে এর সাহায্যে মাপা যায়। ডিকের উৎসাহে প্রয়োজনীয় পরীক্ষাটি আরম্ভ করা হয়। ১৯৬৫ সালে রাশিয়ান নভোচারীরা ১০০ ইঞ্চি টেলিস্কোপের সাহায্যে চন্দ্রে লেসার রশ্মি নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করেন। এই রশ্মিগুলি ২.৬ সেকেণ্ডে পরে ফিরে আসছিল। যদিও ফিরে আসা লেসার রশ্মির শক্তি খুবই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল তাহলেও নভোচারীরা চন্দ্রের দূরত্ব খুব সঠিকভাবে নির্ণয় করতে অক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৬৯ সালে এ্যালড্রিন চন্দ্রের দেহে প্রথম পদচারণা করেন। তিনি চন্দ্রের বুকে একটি প্রতিফলক বসান যার সাহায্যে লেসাররশ্মি সূক্ষ্মভাবে পৃথিবীস্থিত মানমন্দিরে প্রতিফলিত করা যায়। পরে এ্যাপোলো ও রাশিয়ার যন্ত্রচালিত মহাকাশ যান চন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় আরও অনুরূপ প্রতিফলক স্থাপন করে। এইসব প্রতিফলকের সাহায্যে চন্দ্রের দূরত্ব সঠিকভাবে মাপ সম্ভব হয়েছে। এর

ফলে কিছু জ্যোতির্বিদ ও পদার্থবিদ মিলে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মগুলি অতি সূক্ষ্মভাবে যাচাই করার কাজে ব্যাপৃত হলেন। আইনস্টাইনের তত্ত্বটি পরীক্ষা করার কাজে দশটি সহযোগী গবেষণাগার মিলিত হয়েছিল। ছ বছর পরীক্ষা চালিয়ে চন্দ্র থেকে ১৩০০টি লেসার প্রতিধ্বনি ধরে বিশ্লেষণকারীরা এই কথাটি প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলেন যে চন্দ্রের গতি আইনস্টাইনের প্রত্যাশা থেকে এতটুকুও তফাৎ হচ্ছে না। তাদের পরীক্ষায় আইনস্টাইন নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ডিকের প্রস্তাবিত সূর্যের দিকে বিচ্যুতির কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না।

লেসারের সাহায্যে পরীক্ষা চালানো বজায় রাখা হলো। কেবলমাত্র দেখবার জন্য যে চন্দ্রের গতির মধ্যে এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা যাতে মনে হতে পারে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে। কেবলমাত্র ডিকেই মাধ্যাকর্ষণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল হয়ে যাবার কথা বলেন নি ডিরাক (যিনি এ্যান্টিম্যাটার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন) ১৯৩৭ সালে একটি তত্ত্ব দেন যাতে একই কথা বলা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি সময়ে টমাস ফ্ল্যান্ডার্ন এরকম দাবী করলেন যে তিনি মাধ্যাকর্ষণের ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যাওয়া ধরতে পেরেছেন মাসের দৈর্ঘ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

চন্দ্র ধীর গতিতে পৃথিবী থেকে জোয়ার ভাঁটার আকারে শক্তি অর্জন করে এবং তারই ফলে মাসের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়তে থাকে তা মাধ্যাকর্ষণ দুর্বল হউক বা নাই হোক। চন্দ্র পৃথিবী থেকে দূরে সরে যায় এবং ধীরগতিতে চলার জন্য গতিবেগ পরিবর্তন করে। এই কারণে প্রত্যেকটি মাস তার পূর্ববর্তী মাসের চেয়ে এক সেকেন্ডের কিছু অংশ বেশী হবে। কিন্তু কুড়ি বছর ধরে আণবিক ঘড়ির সাহায্যে চন্দ্রের গতি পর্যালোচনা করে ফ্ল্যানডার্ন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে প্রত্যেকটি মাস প্রত্যাশার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বাড়ছে। এর কারণ হিসাবে তিনি মাধ্যাকর্ষণের দুর্বল হয়ে যাওয়ার কথা বলেন।

যদি পরবর্তী অনুসন্ধান ওপরের ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠা করে তাহলে তা আইনস্টাইনের তত্ত্বের ক্ষতিসাধন করবে। আইনস্টাইনের তত্ত্বে কোন পরিবর্তনের অবকাশ নেই। এরকম একটা সন্দেহ করা হয় যে প্রথম যুগের আণবিক ঘড়িগুলি খুব বিশ্বাসযোগ্য ছিল না এবং নতুন পরীক্ষা ফ্ল্যানডার্নের বক্তব্যকে অপ্রমাণ করে দিতে পারে। আপেক্ষিকতাবাদের বিজ্ঞানীরা এই ভেবে সন্তুষ্ট যে মাধ্যাকর্ষণের তীব্রতা কমে যাওয়ার ঘটনাটি এখনও নজরে পড়েনি। মাধ্যাকর্ষণের তীব্রতা কমে যাওয়ার ব্যাপারটি সত্যি হলেই ধরা পড়তে পারে কিন্তু সকল তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা এই আশা করেন যে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের কোনরকম বিরুদ্ধাচারণ শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হবে। ১৯৭৮ সালে অক্সফোর্ডে রোজার পেনরোজ বললেন, "সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ প্রকৃত সত্যের খুব কাছাকাছি।"

১। জৈবিক সময় পারমাণবিক সময়ের সঙ্গে এক।
২। কৃষ্ণগহ্বরের কাছে যেতে পারলে যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকবে।
৩। উচ্চগতিতে ভ্রমণ করতে পারলে যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।
৪। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ উচ্চগতি নিয়ে কাজ করে।
৫। অসুস্থিত কণারা দ্রুতগতিতে চললে দীর্ঘ জীবন পায়।

পাঠক কি আইনস্টাইনের সময়ের ধারণাটির সূক্ষ্ম তাৎপর্যকে শক্তভাবে ধরবার জন্য প্রস্তুত আছেন? সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ যতই বিশদভাবে পরীক্ষার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ততই সময়সংক্রান্ত আইনস্টাইনের ধারণাকে পরিহার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কয়েক সেকেণ্ডের সীমার মধ্যে মনকে সীমাবদ্ধ রাখছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপেক্ষিকতাবাদের প্রতিক্রিয়া এমন কিছু বেশী নয়। কিন্তু আধুনিক মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব থেকে পরিষ্কার যে, নীতিগতভাবে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো সম্ভব। কৃষ্ণগহ্বরের সামনে সময় স্থির হয়ে যাবে এই ধারণাটি নিতান্তই আক্ষরিক অর্থে নিতে হবে। একটি কৃষ্ণগহ্বরকে একজন মানুষের জীবনকে দীর্ঘায়িত করার কাজে লাগানো যেতে পারে এবং তাকে ভবিষ্যতে হাজার হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে।

এই যাত্রা হবে একটি মাত্র পথে। সময়ের এই পরিক্রমা কিন্তু কল্পবিজ্ঞানে ব্যবহৃত সময়ের মতন নয়। কল্পবিজ্ঞানে মানুষের অতীত চলে গিয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে প্রত্যক্ষগোচর করতে পারে বা ভবিষ্যতের সীমা থেকে বেরিয়ে এসে বলতে পারে কি ঘটবে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এ ধরণের যাতায়াত বিশ্ব-সংসারের চালু নিয়মগুলির মধ্যে বৈধতার প্রশ্ন তুলবে যার সম্বন্ধে আইনস্টাইনও ভীত ছিলেন। কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদ, যখন কোন ঘটনা একজনের কাছে অপর একজনের তুলনায় ধীরগতিতে উন্মোচিত করে (কোন ব্যক্তির বেঁচে থাকা, জরাগ্রস্ত হওয়া এবং মৃত্যু পর্যন্ত) তখন কিন্তু কোন বৈষম্য নজরে পড়বে না। এখন এ কথা মেনে নেওয়ার সময় এসেছে যে পারমাণবিক ঘড়ির পরিবর্তনের সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পারমাণবিক ঘড়ির কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করে যে পরমাণুরা মাধ্যাকর্ষণবিহীন জায়গায় যে গতিবেগ নিয়ে চলে তার তুলনায় শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে নিশ্চিতভাবে

শ্লথ হয়ে যায়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পরমাণুরা যে আলো নির্গত করে তারাও ঐ একই প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু মানব দেহ অসংখ্য পরমাণুর সমষ্টি এবং পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবনের আণবিক ছন্দের উত্থান ঘটাচ্ছে। বেঁচে থাকার সকল প্রক্রিয়ার হার পারমাণবিক বিক্রিয়ার হারের ওপরে নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ খুব শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব মস্তিষ্কের অনুভূতি অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে যাবে এবং হৃদযন্ত্রও আরও ধীরে স্পন্দিত হবে। খুব সঙ্গত কারণেই আইনস্টাইন হয়ত এগুলি বিস্তারিত অর্থহীন ভাবে হচ্ছে বলে ভাবতেন। তাঁর কাছে সকল শক্তিই মাধ্যাকর্ষণের মুখোমুখি হলে কমে যায় বা শ্লথ হয়ে যায়। যা কিছু মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়া অনুভব করে তারাই সময়ের ওপরে মাধ্যাকর্ষণের যে প্রতিক্রিয়া তার থেকে রেহাই পায় না।

সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদে সময়ের সম্বন্ধে যেসব প্রস্তাব আছে তাদের যখন আপাতদৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা হয় তখন পৃথিবীতে তাদের পরীক্ষালব্ধ পরিণতি খুবই নগণ্য। কিন্তু সময় নথীভুক্ত করার ব্যাপারটি একেবারে ব্যক্তিগত এই ধরণের উপলব্ধি আইনস্টাইনের পূর্ববর্তী মানুষের মনে যে দার্শনিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তা বড় নগণ্য নয়। এমন কি যখন সকল যুক্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখনও মন চরম সময়ের মধ্যে মুক্তি পেতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। যদি তত্ত্ব এবং পরীক্ষা এই সিদ্ধান্তে আসে যে ঘড়ি এক জায়গার চেয়ে অন্য একটি জায়গায় অনেক বেশী ধীরগতিতে চলে তখনও পর্যন্ত কিছু লোক এইরকম সন্দেহ করে যে ব্যাপারটি মায়া মাত্র। আপেক্ষিকতাবাদ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হচ্ছে যে "অন্য জায়গায়" গিয়ে একটি মানুষ অন্তত নীতিগতভাবে তার ঘড়িকে শ্লথ করে দিতে পারে এবং তার ফলে তার দিনপঞ্জী, তার জীবনের হার মন্থর হয়ে যাবে। এর ফলে যে অন্য জায়গার মানুষের চেয়ে বেশী বাঁচবে এবং অনায়াসে ভবিষ্যতের দিকে পদচারণা করতে পারবে। তাঁর মনে হবে সময় খুব স্বাভাবিক হারেই প্রবাহিত হচ্ছে যদিও অন্য জায়গার তুলনায় সময় ধীর গতিতে চলছে।

সমস্ত ব্যাপারটি থেকে পরিত্রাণ পাবার একটি রাস্তা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ধরা যাক্ একটি মহাজাগতিক চরম সময় আছে যা সুসমভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিন্তু মানুষ এর পরিমাপ করছে ভুল ভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কেন না ঘড়িগুলি কোনটাই সম্পূর্ণভাবে ত্রুটি শূন্য নয়। উদারহণ স্বরূপ যদি আমরা একটি পারমাণবিক ঘড়িকে বহুদূরে মহাশূন্যে নিয়ে যাই তাহলে সেটি পৃথিবী বা সূর্যের মাধ্যাকর্ষণজনিত প্রভাব কম অনুভব করবে এবং তখন সে প্রকৃত মহাজাগতিক সময় নির্দেশ করবে। এ ধরণের ধারণার মধ্যে কিছু বাস্তবতা থাকলেও আইনস্টাইনের তত্ত্বের যে ভাবাদর্শ তার পরিপন্থী। আইনস্টাইনের

দৃষ্টি অনেক বেশী গণতান্ত্রিক কেননা তিনি কোন ঘটনা সকলের ব্যক্তিগত মূল্যায়ন বলে মানেন। যদি একজন পরিভ্রমণকারী দেখতে পায় সময় বাইরের জগতের চেয়ে ধীর গতিতে যাওয়ার জন্য তার বিশ্ব আপাতদৃষ্টিতে দ্রুতগতি হয়ে যাচ্ছে তাহলে বিশ্ব সম্বন্ধে তার বর্ণনা আর সব বর্ণনার মতই সঠিক।

পরিভ্রমণকারীকে কৃষ্ণগহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়া থেকে নিবৃত্ত করা উচিত। একটি কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর দিয়ে আরেকটি বিশ্বে পেঁাছে যাওয়া যাবে এরকম একটি আশা-ব্যঞ্জক অনুমান করা হলেও এটা খুবই অসম্ভব যে ভ্রমণকারী নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে। তার পক্ষে উচিত হবে তার মহাকাশযানটিকে কৃষ্ণগহ্বরের চারিপাশে বৃত্তাকারে ঘোরানো এবং যতখানি তার ক্ষমতা ততখানি সে কৃষ্ণগহ্বরের নিকটবর্তী হতে পারে। তাহলে সে এমন একটি সময় স্তরের মধ্যে থাকবে যেখানে পারমাণবিক ও জৈবিক ঘড়ি দূরবর্তী কোন অনুসন্ধানকারীর কাছে খুব ধীর-গতিতে চলছে বলে মনে হবে। ব্যবহারিক দিক থেকে তাহলে জোয়ার ভাটার চাপ অসম্ভব রকম বেশী হত যদি কৃষ্ণগহ্বরটি খুব বড় হত। যে কোন ক্ষেত্রেই তার মোটরটিকে চালু রাখতে হবে যাতে সে ভেতরের দিকে ঢুকে না পড়ে। সবচেয়ে কাছের সুস্থিত কক্ষপথ যেখানে শক্তিবিহীন মহাকাশযান ঠিক থাকবে তা ঘূর্ণন-বিহীন একটি কৃষ্ণগহ্বরের ব্যাসার্দ্ধের প্রায় ছয়গুণ। সেখানে সময় শ্লথ হবার পরিমাণ বছরে কয়েক মাস। ধরা যাক অনেক বাধা সত্ত্বেও পরিভ্রমণকারী একটি কৃষ্ণগহ্বরের চারিপাশে ঘুরতে সক্ষম হলো এবং তা কৃষ্ণগহ্বরের ত্বকের এত কাছে যে এমন একটি সময় স্তরের মধ্যে থাকবে যেখানে পৃথিবীর ত্বকের তুলনায় হাজার ভাগের এক ভাগ হার নিয়ে ঘড়ি চলে। যারা গোঁড়া তার লক্ষ্য করবেন যে আমরা গতির প্রতিক্রিয়ার কথা ধরছি না—একটি যন্ত্রচালিত মহাকাশযানে গল্পের ভ্রমণকারী যথেচ্ছ পরিমাণ ধীরে চলতে পারে।

সময়ের ওপর মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়া মায়াজাল কিনা দেখার জন্য একটি উপায় ভাবা যেতে পারে। ধরা যাক নভোচারী ও ভূকেন্দ্রের মধ্যে আলোর সংকেত যাতায়াত করছে। যদি দু দলেরই এরকম ধারণা থাকে যে অন্যের ঘড়ি শ্লথ যাচ্ছে—মহাকাশযান পৃথিবীর থেকে অতি উচ্চগতিতে সরে যেতে থাকলে এমনটিই হতো—তাহলে এটিকে স্ববিরোধী মায়াজাল বলে বাতিল করা যেত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সময় পরিভ্রমণকারী এবং তার ভূকেন্দ্রস্থ বন্ধুরা যা ঘটছে তাতে একমত হবে।

যে মহাকাশযানটি কৃষ্ণগহ্বরের খুব কাছে আবর্তন করছে সেখানে পৃথিবী থেকে যে আলোক সংকেতগুলো এসে পেঁাছুবে তারা খুব দ্রুতগতিতে আসছে বলে মনে হবে। যার ফলে তারা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে প্রভূত পরিমাণে নীলের দিকে সরে

যাবে। প্রচারের বেতার তরঙ্গ একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। গ্রাহক যন্ত্রে তা উচ্চ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট মনে হবে। তাদের বুঝতে গেলে তাদের রেকর্ড করে পরে অনেক ধীরগতিতে চালাতে হবে। কিন্তু যে তথ্য তারা বহন করবে তারা অনেক ঘন হয়ে অনেক দ্রুতগতিতে আসবে। পরিভ্রমণকারী প্রতি নব্বুই সেকেণ্ড অন্তর অন্তর পৃথিবী থেকে বার্তা পেতে থাকবে এবং সপ্তাহে পাঁচবার আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন অনুষ্ঠান অবলোকন করবে। যদি পরিভ্রমণকারীর বন্ধুরা পৃথিবী থেকে তাদের হৃদস্পন্দনের শব্দটি পাঠান তবে তা একটি তীক্ষ্ম আওয়াজ বলে মনে হবে।

অন্যদিক থেকে দেখলে পরিভ্রমণকারীর দ্বারা পাঠানো সংকেত যখন পৃথিবীতে এসে পোঁছুবে তখন তা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে লালের দিকে সরে যাবে। পৃথিবীতে তার বন্ধুদের তখন তাদের গ্রাহক যন্ত্রকে কম কম্পাঙ্ক অংশ ধরতে হবে এবং বোঝার তাগিদে বার্তাটিকে দ্রুতগতি করে রেকর্ড চালাতে হবে। কিন্তু তাঁদের খুব একটা শ্রম করতে হবে না পরিভ্রমণকারীও পাঠানো দৈনিক সংবাদ তিন বছরে একবার এসে পোঁছুবে, দশ মিনিটের শুভকামনা রেকর্ড করতে সপ্তাহের বেশী সময় লেগে যাবে। যদি সে তার একটি টেলিভিশন ছবি পাঠায় তা হলে মনে হবে তার চোখের পলক পড়তেই অনেক সময় লাগছে। এসত্ত্বেও পরিভ্রমণকারী কৃষ্ণগহবরের চারিপাশে ঘুরতে ঘুরতে তার নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সময়ের বিচিত্র গতিবিধি ধরতে পারবে না। তার মনে হবে তার নাড়ী, তার হৃদযন্ত্র স্বাভাবিক লয়েই চলেছে। প্রত্যেক জায়গায় সময়কে স্বাভাবিক ভাবেই প্রবহমান মনে হবে—শারীরিক মানসিক সব দিক থেকেই। কিন্তু দুটি আলাদা জায়গায় সময়ের তারতম্যের একটি নির্দ্দিষ্ট সামঞ্জস্য থাকবে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পরিভ্রমণকারী এই খবর পাবে যে তার সকল বন্ধুই মৃত। সে যদি কৃষ্ণগহবরের চারিপাশে দশ বছর ঘুরে পৃথিবীতে ফিরে আসে তাহলে সে দেখবে পৃথিবীতে দশহাজার বছর পার হয়ে গেছে। সে কখনই তার পূর্ববর্তী সময়ে ফিরে আসতে পারবে না। আপেক্ষিকতাবাদে এমন কোন প্রক্রিয়া নেই যাতে কোন বস্তু, ব্যক্তি বা একটি বার্তা সময়ের সাথে পেছনের দিকে যেতে পারে।

উচ্চগতি মানুষের যৌবনকে দীর্ঘ করতে পারে। আমাদের আলোচ্য নভোচারীর কোন প্রয়োজন নেই একটি কৃষ্ণগহবর খুঁজে পাওয়া এবং সময় পরিক্রমা শুধু করা যাতে সে পৃথিবীতে অবস্থিত তার সহযোগীদের চেয়ে বেশী বাঁচতে পারে। শূন্যে সে তার যাত্রা পথকে এমনভাবে পরিকল্পনা করতে পারে যাতে করে মহাকাশযানস্থিত পারমাণবিক ঘড়ি ও তার বাড়ীর ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলে। পরিকল্পনাটি খুবই সরল—তাকে যা করতে হবে তা হলো তাকে যে কোন দিকে খুব বেশী গতিবেগ নিয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে এবং তারপরে ঘুরে আবার

সগৃহে ফিরে আসতে হবে। যত সে দ্রুত যাবে এবং যত বেশীক্ষণ যাবে ততই সময়ের দিক থেকে তার সুবিধা হবে।

আইনস্টাইনের প্রাথমিক আবিষ্কারের মধ্যে মহাশূন্যে সময় পরিক্রমার সম্ভাবনা অন্যতম। এটি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের অন্যতম প্রধান সিদ্ধান্ত এবং তার প্রথম প্রধান সূত্র যার দ্বারা বোঝা যায় যে পদার্থবিদ্‌দের চরম সময় সম্পর্কে প্রাচীন ধারণাকে পরিত্যাগ করতে হবে। ভাবা হতো সর্বত্র সময় একই লয়ে বয়ে চলেছে। এই অধ্যায় ও পরের কয়েকটি অধ্যায়ে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে। নামকরণটি থেকে এটাই বোঝা যায় যে বিষয়টি বিশেষ অবস্থায় আপেক্ষিক গতির ভূমিকাই এর আলোচ্য বিষয়। শূন্যস্থান, মাধ্যাকর্ষণের তীব্র উৎস থেকে অনেক দূরে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের জগৎ মাধ্যাকর্ষণ জর্জরিত সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের জগতের চেয়ে অনেক সরল। এসত্ত্বেও ধারণা করার ব্যাপারে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বেশ কিছুটা বিভ্রান্তিজনক। সবকিছুই ঢিলে-ঢালা। নক্ষত্র বা গ্রহদের মত কোন মাধ্যাকর্ষের কেন্দ্র এখানে নেই যাকে একটি নিশ্চিত রেফারেন্স বিন্দু হিসাবে ভাবা যেতে পারে। এই বইটিতে আইনস্টাইনের ধারণাগুলি তুলে ধরা হয়েছে আবিষ্কারের যে ক্রমপর্যায় তার বিপরীত ভাবে। আমরা সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ থেকে বিশেষ আপেক্ষিকতা ও উচ্চগতিতে ভ্রমণ বিষয়টিতে আসছি। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা ঠিক বিপরীত। এই দুটি তত্ত্বের মধ্যে যোগসূত্র হলো (১) মাধ্যাকর্ষণ ও ত্বরণের মধ্যে মিল (২) উচ্চগতিতে ভ্রমণ ও সময়ের ওপরে তার প্রতিক্রিয়া।

পৃথিবীতে তথা বিশ্বের সর্বত্র মাধ্যাকর্ষণ তেমন সুতীব্র নয়। এর ফলে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সিদ্ধান্তগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় পুরোপুরি খেটে যায়—বিশেষ সূক্ষ্মভাবে মহাকাশযানগুলির যা মুক্তভাবে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পড়ছে তাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। এ ব্যাপারে স্কাইল্যাবের কথা ভাবা যেতে পারে। যদিও মাধ্যাকর্ষণজনিত লালের দিকে সরে যাওয়া এবং তার সংশ্লিষ্ট পারমাণবিক ঘড়ির ব্যবহার মাধ্যাকর্ষণকে বোঝার ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবুও এরা সাধারণতঃ উচ্চ আপেক্ষিক গতির সময়ের ওপরে যে প্রতিক্রিয়া তার তুলনায় কম।

যেখানে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে ঘড়ি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে সেখানে একটি অনুভব-যোগ্য কারণ আছে। পৃথিবী, সূর্য বা কৃষ্ণগহ্বরের মত ভারী বস্তু যে সময় ও তাঁদের পারিপার্শ্বিক স্থানকে কিছুটা অদ্ভুতভাবে প্রভাবিত করবে তা একেবারে আশ্চর্যজনক নয়। যার জন্য বিশেষ আপেক্ষিতাবাদ বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হয় তা হলো যখন মাধ্যাকর্ষণকে বাদ দিলেও কেবলমাত্র গতি স্থান ও সময়কে বিকৃত করতে পারে। এই ব্যাপারটা অনেক বিশিষ্ট পদার্থবিদ্ ও সাধারণ মানুষকে

পর্যন্ত বিভ্রান্ত করেছে।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের যে মূলকথা তাহলো যে কোন ব্যক্তির কাছে আলোর গতিবেগ সব সময় এক থাকবে, তাদের গতি বা আলোক উৎসের গতি তার ওপরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। ওপরের কথাগুলো এই মূলকথার বেলাতেও প্রযোজ্য। যদি এটি সঠিক তবুও এটি একটি বিভ্রান্তিকর ধারণা। যে কেউ সুসমগতি নিয়ে চলমান অবস্থায় শূন্যস্থানে আলোর গতিবেগ পরিমাপ করলে সব সময় একই ফল লাভ করবে এবং তার পরিমাণ হবে প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬,০০ মাইল। এটা ধরে নিলে সময়ের ওপরে একটি প্রতিক্রিয়া গণণা করা সম্ভব যা আমাদের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের অন্তরে পেঁছে দেবে।

যদি একজন অপর একজনের পাশ দিয়ে উচ্চগতিতে অতিক্রম করে যায় তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির ঘাড়কে ধীরগতিতে চলতে দেখবে। এর কারণটি স্বতঃসিদ্ধ মনে হবে যদি প্রথম ব্যক্তি দুটি পাশাপাশি চলমান মহাকাশযানের একটির যাত্রী হয় এবং যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তাদের পৃথিবীর থেকে দূরে সরে যেতে দেখে। প্রথম ব্যক্তি তার মহাকাশযানের জানালা দিয়ে দেখলে ভাববে দ্বিতীয় মহাকাশযানটি স্থির হয়ে আছে এবং তার প্রেক্ষাপটে পৃথিবী দ্রুতগতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। যদি প্রথম ব্যক্তি রাডার বা লেসার রশ্মির সাহায্যে অপর মহাকাশযানের সঙ্গে তার দূরত্ব পরিমাপ করার ইচ্ছা করে তাহলে তাকে আলোর গতিবেগ নিয়ে সংকেত পাঠাতে হবে এবং প্রতিফলন ফিরে আসার সময়টি পারমাণবিক ঘড়ির সাহায্যে মাপতে হবে। প্রথম ব্যক্তির সাপেক্ষে সংকেত তার সঙ্গী মহাকাশযানে সরাসরি যাচ্ছে সবচেয়ে কম দূরত্বের রাস্তা দিয়ে এবং তার কাছে সরাসরি ফিরে আসছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে কিন্তু ব্যাপারটা এভাবে প্রতীয়মান হবে না। যে সময়ে প্রথম মহাকাশযান চলতে থাকবে সে সময়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে হবে দ্বিতীয় মহাকাশযানটি সামনের দিকে চলছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হবে আলো বাঁকা পথে দ্বিতীয় মহাকাশযানটিতে পেঁছুচ্ছে। অনুরূপভাবে ফিরতি প্রতিফলন প্রথম মহাকাশযানে পেঁছুতে বাঁকাপথ নেবে এবং মহাকাশযানটি তখনও আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। অন্যভাবে বললে মনে হবে সংকেতটি আরও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করল।

কম গতিবেগের বেলাতে এই তফাৎটুকু উপেক্ষণীয়। কিন্তু মহাকাশযানগুলি যখন আলোর গতিবেগের অর্ধেক গতিবেগ নিয়ে চলবে তখন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে সংকেতের যাত্রাপথ প্রথম ব্যক্তির তুলনায় পনেরো শতাংশ বেশী বলে মনে হবে। কিন্তু যদি দুজনের কাছে আলোর গতিবেগ সমান হয় তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি সময় গণণা করে দেখবে প্রথম ব্যক্তি কর্তৃক পাঠানো সংকেত প্রথম ব্যক্তির কাছে ফিরে

যেতেই যে সময় লাগছে তা প্রথম ব্যক্তি যে সময় পরিমাপ করছে তার চেয়ে পনেরো শতাংশ বেশী। কিন্তু একটি ও একই রাডার সংকেত একই পরিক্রমা করছে এবং স্থান ও সময়ের ধারণার মধ্যে কিছু একটি অসঙ্গতি ঢুকে পড়ছে।

আইনস্টাইন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে এই ব্যাপারে যে জিনিষটিও নজর দিতে হবে তাহলো সময়কে স্বাভাবিক ভাবে গণণা করতে হবে। পরবর্তীকালের সকল অনুসন্ধান তাঁর সিদ্ধান্তকে ঠিক প্রমাণিত করেছে। যে পৃথিবীতে বসে দেখছে সে মনে করতে পারে যে মহাকাশযানে রাখা ঘড়ি সেই পরিমাণে আস্তে চলছে যা দিয়ে আলোর যাত্রাপথের দূরত্ব নিয়ে দুটি মতের মধ্যে মিলন ঘটাবে। তাঁর তত্ত্ব ঐভাবে আলোক সংকেত যাবার সময়ে দূরত্বের যে তারতম্য হয় তা মেলাবার চেষ্টা করে।

ধরা যাক প্রথম ব্যক্তি দেখল একটি আলোক সংকেত তার কাছে ফিরে যেতে একশ ন্যানোসেকেন্ড (এক সেকেন্ডের বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ) লাগল এবং মহাকাশযান দুটি একশ ফিট তফাতে আছে। তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলবে "ওহ্ তোমার মহাকাশযানের ঘড়ি ধীরে চলছে এবং প্রকৃত সময় লেগেছে একশ পনেরো ন্যানো সেকেন্ড।"

এই যুক্তিতে ব্যক্তিদ্বয়ের চরিত্র একেবারে পরিবর্তিত করে দেওয়া যাবে। প্রথম ব্যক্তি দেখবে পৃথিবী তার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি রাডারের সাহায্যে তার বাড়ি থেকে স্থানীয় পানশালার দূরত্ব মাপছে। প্রথম ব্যক্তির গণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় ব্যক্তি ও তার পানশালা আলোর অর্ধেক গতি নিয়ে ছুটে চলেছে। প্রথম ব্যক্তি গণনায় সরলরেখায় চলাচলকারী রাডার প্রতিধ্বনি বাঁকা মনে হবে এবং দূরত্ব বেশী মনে হবে। সুতরাং প্রথম ব্যক্তির গণনায় দ্বিতীয় ব্যক্তির ঘড়ি ধীর চলছে বলে মনে হবে। এই বিক্রিয়াটি পারস্পরিক এবং বৈষম্য মূলক। দুটি ঘড়িই একে অপরের চেয়ে আস্তে যেতে পারে না। সময়ের ওপরে উচ্চগতির প্রতিক্রিয়া তাহলে দৃষ্টিভ্রমের মত।

এবার কিন্তু একটি আশ্চর্যজনক জিনিষ ঘটবে। যদি প্রথম ব্যক্তি পৃথিবীর পাশ দিয়ে চলতে থাকে এবং তারপরে তার মহাকাশযানটি ঘুরিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে যায় তখন দেখা যাবে দ্বিতীয় ব্যক্তির ঘড়ি ধীরগতি হয়ে যাবার ব্যাপারটি প্রকৃত মনে হবে। প্রথম ব্যক্তি তার যাত্রাপথে দ্বিতীয় ব্যক্তি যা মনে করবে তার থেকে কম সময় লাগবে। এ ব্যাপারে ভ্রমণের দিকের কোন ভূমিকা নেই কেননা ঘড়ির চলনের ওপরে উচ্চগতির প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে এদিক থেকে নিরেপেক্ষ। এই তফাৎটি আসছে কেননা প্রথমব্যক্তি ভ্রমণকারী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তার বাড়ীতে বসে আছে।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের ভবিষ্যৎবাণী দ্বৈত ধাঁধাঁ নামে পরিচিত। এর কারণ হলো এর থেকে যমজ ভাইয়ের গল্প তৈরী করা যেতে পারবে! যমজ ভাই-এর একজন অন্য ভাইকে পৃথিবীতে রেখে উচ্চগতিতে নক্ষত্রের দিকে যাত্রা শুরু করল। ফিরে এসে সে দেখতে পাবে তার ভাই বৃদ্ধ হয়ে গেছে অথচ তার যৌবন অক্ষুণ্ন রয়েছে। নভোচারীর ঘড়ি তাও সে পারমাণবিক হোক বা জৈবিক হউক পৃথিবীতে রাখা ঘড়ির তুলনায় কম সময় নির্দেশ করেছে। আকাশে ভ্রমণের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে করলে নভোচারী অনেক বেশী বছর বাঁচতে পারে ঠিক তেমনটি নিউ-টেষ্টামেণ্ট-এ মেথুসেলাহ ৯৬৯ বছর বেঁচে ছিল।

আপেক্ষিকতাবাদের অন্য যে কোন ধারণার চেয়ে দ্বৈত ধাঁধাঁটি সাধারণ মানুষের মনে জটিলতা ও তর্কের সূচনা করেছে। কিছু লোক আইনস্টাইনের সময়ের ধারণার চেয়ে আরও দৃঢ় ধারণায় বিশ্বাস করে। তারা দ্বৈত ধাঁধাঁটি গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হারবার্ট ডিঙ্গলে এ ব্যাপারে একটি বিপরীত তত্ত্ব দেন। তিনি বলেন যে ভ্রমণকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে মহাকাশযানটি একবার ত্বরিত হয়ে পেছনে সরে যাচ্ছে আবার ত্বরিত হয়ে কাছে চলে আসছে। সুতরাং যমজ দুটি যখন পুনর্বার মিলিত হবে তখন তাদের মধ্যে বয়সের কোন পার্থক্য থাকবে না। কিন্তু আইনস্টাইন ও ডিঙ্গলের মতামতের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে।

যে ব্যক্তি উচ্চগতিতে সময় পরিভ্রমণ করছে এবং যে কৃষ্ণ গহ্বরের কাছে যাচ্ছে তাদের মধ্যে সমতুল্যতা দ্বৈত ধাঁধাঁ ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। আগেই বলা হয়েছে কৃষ্ণগহ্বরের কাছে সময় ভ্রমণকারীর নির্গত সংকেত খুব বেশী পরিমাণে মাধ্যাকর্ষণজনিত কারণে লালের দিকে সরে গিয়ে পৃথিবীতে এসে পৌঁছবে এবং কম্পনসংখ্যা কমে যাবে। অপরদিকে কৃষ্ণগহ্বরের কাছে সময় ভ্রমণকারী পৃথিবী থেকে যে সংকেত পাবে তার কম্পনসংখ্যা বেড়ে যাবে ও তা নীলের দিকে সরে যাবে। সংকেতের ওপর এই প্রতিক্রিয়া এটাই প্রমাণ করে যে পৃথিবীর যে কোন ঘড়ির চেয়ে সময় ভ্রমণকারীর ঘড়ি অনেক ধীরে চলছে। উচ্চগতিতে সময় ভ্রমণ-কারীর কাছে একটি সংকটময় মুহূর্ত আসে যখন পৃথিবী থেকে পাঠানো সংকেত লালের দিকে সরে যাবে আবার সে নিজে দেখবে পৃথিবী থেকে আসা সংকেত নীলের দিকে সরে যাচ্ছে।

এই ক্ষেত্রে আলোর লাল হয়ে যাওয়া বা নীল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ডপলার প্রক্রিয়ার জন্য ঘটে। ডপলার প্রক্রিয়াতে দুটি বস্তুর মধ্যে যাতায়াতকারী আলো দুটি বস্তু পরস্পরের দিকে আসছে না সরে যাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে তরঙ্গ দৈর্ঘ সংকুচিত ও প্রসারিত করে। যখন দুটি বস্তু পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে তখন তার দৈর্ঘ লালের দিকে সরে আসবে। আবার বস্তু দুটি যখন পরস্পরের

দিকে আসবে তখন আলো নীলের দিকে সরে যাবে। সংকটকাল তখনই উপস্থিত হয় যখন সময় পরিভ্রমণকারী ঘুরে তার বাড়ীর দিকে আবার যাত্রা শুরু করে। সেই মুহূর্তে সে দেখবে পৃথিবী থেকে আসা আলো নীলের দিকে সরে যাচ্ছে এবং মহাজাগতিক ঘড়িগুলি দ্রুত হারে চলতে শুরু করবে। কিন্তু ধরা যাক যখন সে দশ আলোক বর্ষ দূরে তখন সে প্রত্যাবর্তন করছে তখন তার যে যমজ ভাই বাড়িতে বসে আছে সে ঘটনাটি ঘটার দশ বছরের মধ্যে জানতে পারবে না যে নভোযানটি আবার ফেরার মুখে। নভোযানটি যে ফিরে আসছে সেই বার্তা নিয়ে আলোক সংকেত পৃথিবীতে এসে পৌঁছুবে দশ বছরে। এই দশ বছর ধরে বাড়ীতে বসে থাকা যমজ ভাই দেখবে আকাশযান লালের দিকে সরে যাচ্ছে এবং তার অভ্যন্তরে রাখা ঘড়ি স্লো হয়ে যাবে। মহাকাশযানটি যত জোরে চলবে ততই ঘড়িদের মধ্যে পার্থক্য বাড়তে থাকবে এবং সময় ভ্রমণকারী ততই বেশী সময় বাঁচাতে থাকবে।

চলমান যমজ ভাই ও পৃথিবীতে বসে থাকা যমজ ভাই-এর অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটি প্রাথমিক তফাৎ আছে। ভ্রমণকারী যাত্রা করার ফিরে আসার সময় ত্বরণ অনুভব করবে। পৃথিবীতে যে বসে আছে সে তা অনুভব করবে না। ত্বরণের প্রতিক্রিয়াগুলি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে বেশ কিছুটা অস্পষ্ট। এই কারণে বিক্রিয়াটিকে ধাঁধাঁ বলা হয়। আইনস্টাইন নিজে বলেছেন যে এ ব্যাপারটি সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের সাহায্যে পুরোপুরি বোঝা সম্ভব। পরবর্তী তত্ত্ব এইটাই পরিষ্কার বলে যে শূন্যস্থানে ত্বরণ মাধ্যাকর্ষণের থেকে অভিন্ন। যে ভাবে মাধ্যাকর্ষণ সময়ের ওপর বিক্রিয়া ঘটায় অনুরূপভাবে ত্বরণও সেরূপ বিক্রিয়া ঘটায়।

যখন কেউ উচ্চগতিতে একটি বৃত্তের চারিদিকে ভ্রমণ করতে থাকে তাহলে সে প্রায় কৃষ্ণগহ্বরের মুখোমুখি হবে। যতই গতি বেশী হবে ততই কার্যতঃ সে কাল্পনিক কৃষ্ণগহ্বরের কাছাকাছি হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে আলোর গতিবেগের অর্ধেক গতিবেগ নিয়ে বৃত্ত পরিক্রমা করলে একটি কৃষ্ণগহ্বর থেকে ব্যাসের দ্বিগুণ দূরে ঘোরার সমান হবে। ভ্রমণের প্রত্যেক বছরের জন্য ভ্রমণকারী দু মাসের চেয়ে কিছু কম সময় লাভ করবে। কৃষ্ণগহ্বরের ভ্রমণকারীর (যে তার ঘড়িকে একহাজার অংশ স্লো করে দিয়েছে)। কার্যকারিতার সমতা রাখতে গিয়ে দর্শককে আলোকগুচ্ছকে অনুসরণ করতে হবে এবং গতিবেগ হবে আলোর নিজস্ব গতিবেগের চেয়ে প্রতি সেকেণ্ডে এক মাইল কম।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কেবলমাত্র উচ্চগতিই এক ভ্রমণকারীকে তার বাড়ীতে বসে থাকা যমজ ভাই-এর তুলনায় যুবা রাখছে না। উচ্চগতি লাভ করতে এবং

বাড়ী ফেরার জন্য দিক পরিবর্তন করতে যে শ্রম করতে হচ্ছে তাতে তাকে যুবক রাখতে সাহায্য করছে।

আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বে কেউ মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সংগ্রাম করুক বা মহাকাশ-যানে পরিভ্রমণ করুক পরিশ্রম, তাকে অলস ঘড়ির চলনের তুলনায় ভিন্ন সময় কালে নিয়ে যেতে পারে। যমজ ধাঁধা নিয়ে একটু বেশী কথা বলা হলো ঠিকই এই কারণে যে এই ব্যাপারটি নিয়ে অনেকই বিহ্বল হয়ে পড়েন। পদার্থবিজ্ঞানে কোন জিনিস কেবলমাত্র আলোচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। হয় পরীক্ষার সাহায্যে। যখনই পরীক্ষা করা হয় তখনই দেখা যায় যে আইনস্টাইনের সিদ্ধান্ত একেবারে নিভুর্ল।

যমজ ধাঁধাটি পৃথিবীতে বসে পরীক্ষা করতে গেলে সবচেয়ে ভাল হয় এমন জিনিস থাকা যার একটি স্বাভাবিক জীবদ্দশা আছে এবং উচ্চগতির সাহায্যে এই জীবদ্দশাকে প্রলম্বিত করা যায়। কণা বিজ্ঞানীদের কাছে এই ধরণের যোগ্য বস্তু সহজেই লভ্য হয়ে দাঁড়ায়। অনেকগুলি কণা আছে যারা সুস্থিত না। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে তারা ভেঙ্গে যায়। বয়সকাল বাড়াবার সংক্রান্ত পরীক্ষার সবচেয়ে যোগ্য কথা হলো মিউসেসান। তারা এক সেকেণ্ডের দুই মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময় ইলেকট্রনে ভেঙ্গে যায়।

মিউসেসান কি দিয়ে তৈরী সেসব প্রশ্ন এখানে অবান্তর। যেটা প্রয়োজনীয় তা হলো এই কণাদের তড়িতাধান আছে এবং তাদের শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে চালনা করা যায়। কল্পনা করা যাক একগুচ্ছ কণাকে উচ্চগতিতে কিছুক্ষণ চালনা করে তাদের আবার ফিরিয়ে আনা হলো। যমজ ধাঁধাটির সিদ্ধান্ত যদি ঠিক তাহলে গতি সম্পন্ন কণাদের জীবনকাল অনুরূপ স্থির কণাদের চেয়ে বেশী মনে হবে। জেনেভাতে ১৯৪৭ সালে পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হল যে সত্যি সত্যি মিউসেসানের জীবনকাল দ্রুতগতির জন্য বেড়ে যাচ্ছে। উচ্চগতি মানুষের যৌবনকে ধরে রাখে এবং আইনস্টাইনের ফরমূলা একটি বাস্তব সত্য।

বিশ্বজনীন সংশোধন

১। একটি উচ্চগতিসম্পন্ন বস্তু মনে হবে দর্শকের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে।
২। একটি উচ্চগতিসম্পন্ন ঘাড়িকে মনে হবে যেন মন্থর যাচ্ছে।
৩। একটি বস্তুর গতিশক্তি বস্তুটির আপাত ভর বৃদ্ধি করে।
৪। উচ্চগতিতে ভ্রমণে দূরত্ব কমে যাবে বলে মনে হবে।
৫। **ভিন্ন প্রতীয়মান হলেও কিন্তু ভৌত নিয়মগুলি অপরিবর্তনীয় থাকবে।**

পাশ থেকে আসা বাতাসের সান্নিধ্যে যখন একটি চলমান নৌকা গতি আহরণ করে তখন বাতাস সরে যায়। তখন মনে হয় বাতাস নৌকার সামনের কোন জায়গা থেকে আসছে। মাস্তুলের ওপর পতাকা, যা নৌকাচালকদের বাতাসের দিক নির্দেশ করে, আর বাতাসের দ্বারা আন্দোলিত হয় না। বরং কোণাকুণি একটি দিক নির্দেশ করে। নৌকাটি যত তাড়াতাড়ি চলবে ততই এই কোণের পরিমাণ বেশী হবে। নৌকার গতিবেগ কিন্তু প্রকৃত বাতাসের দিককে পরিবর্তন করছে না। পৃথিবীর ত্বকে বিরাট জায়গা জুড়ে উচ্চ ও নিম্ন চাপের ফলে বাতাসের সৃষ্টি। যেটা প্রকৃত অর্থে পরিবর্তিত হয় তাহলে নৌকার মানুষের চোখে আপাতদৃষ্টিতে প্রতীয়মান বাতাসের দিক। তবুও বাতাসদের আপাত দিকের একটি বস্তু সত্ত্বা আছে কেননা এটাই নৌকাকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়।

আইনস্টাইন এইরকম একটি ছোট নৌকার নাবিক, যেমনটি ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দিতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্র্যাডলে। আইনস্টাইনের দুশ বছর আগে ব্র্যাডলে আপেক্ষিকতাবাদে একটি প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কার করেন। টেমস নদীতে নৌকা করে যাওয়ার সময় বাতাসের আপাতদিকের প্রতিফলন থেকে তিনি এই আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে দূরবর্তী স্থির নক্ষত্রদের আপাত অবস্থান শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাবে। উপরন্তু পৃথিবীর গতির দিক সূর্যকে পরিক্রমা করবার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। এই কারণে আকাশে নক্ষত্রদের আপাত অবস্থান ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটু পালটে যাবে। তিনি যাচাই করে দেখলেন তাঁর সিদ্ধান্তটি সঠিক। কিছু কিছু নক্ষত্রের বেলাতে গ্রীষ্ম থেকে শীতকালের মধ্যে নক্ষত্রদের আপাত অবস্থানের পরিবর্তন প্রায় একডিগ্রির উনিশভাগের একভাগ। ব্র্যাডলে তখন আলোর গতি পৃথিবীর কক্ষপথে

পরিক্রমার গতিবেগের চেয়ে কতগুণ তা নির্ণয় করতে সমর্থ হলেন।

একজন জ্যোতির্বিদকে দূরবর্তী কোন নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে আসা আপাত আলোকরশ্মিকে ধরতে গেলে তার টেলিস্কোপটিকে পৃথিবীর গতিপথের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকাতে হবে। এটা বাতাসের আপাত গতিবেগের দরুণ নৌকার পতাকার দিক পরিবর্তনের সামিল। একে ইংরাজীতে বলা হয় এ্যাবারেসন। যে সব গতিবেগ আলোর গতিবেগের তুলনায় কম সেখানে এই এ্যাবারেশন খুব কম। কিন্তু একটি দ্রুত জলযান আপাত বায়ুপ্রবাহের দিক একেবারে সামনের দিকে করে দিতে পারে তা প্রকৃত বাতাসের দিক যাই হোক না কেন। ঠিক সেইরকমভাবে আলোর উৎসের সাপেক্ষে খুব উচ্চগতি নক্ষত্র থেকে আসা আলোর আপাত দিক ও নক্ষত্রের আপাত পরিচয়ের ওপর নাটকীয় পরিবর্তন আনতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ কল্পনা করা যাক একটি মহাকাশযান পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছে প্রায় আলোর সমান গতিবেগ নিয়ে। পর্যবেক্ষক যদি তাঁর টেলিস্কোপটি পূর্ব আকাশের দিকে নির্দেশ করে রাখে তাহলে সে দেখবে মহাকাশযান তার দিকে এগিয়ে আসছে—শেষের অংশটি আগে। এ্যাবারেশন এত বেশী যে, যে আলো সঠিক কোণে টেলিস্কোপে ঢোকার কথা তাকে প্রায় সোজাসুজি মহাকাশযানের পেছন থেকে ছাড়তে হবে। চিন্তা করা যাক একটি মহাকাশযান স্থির আছে এবং পৃথিবী প্রায় আলোর গতি নিয়ে এর পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। মহাকাশযান থেকে একটি লেসার রশ্মির সাহায্যে পৃথিবীতে আঘাত করার একটি উপায়ই আছে। পৃথিবীর গতির দিকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা।

পৃথিবীতে সুবিধাজনক স্থানে ফিরে আসা যাক্। মহাকাশযান যখন সবচেয়ে কাছাকাছি আসছে সেই সময় দেখবার চেষ্টা করতে গিয়ে পর্যবেক্ষক যখন তার টেলিস্কোপটি সোজাসুজি ওপরে ঘোরাবে তখন পর্যবেক্ষক তার দিকে মহাকাশ-যানের পেছনের অংশই দেখতে পাবে। অন্য কথায় বলতে গেলে পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাবার রাস্তা বরাবর না দেখে মহাকাশযানটিকে মনে হবে যেন ঘুরে পৃথিবীর থেকে দূরে লক্ষ্য করছে। এমনকি অনেক কম গতিবেগেও একটি চলমান মহাকাশযানকে মনে হবে যেন পৃথিবীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। দর্শক যখন মহাকাশযান পাশ থেকে দেখবে বলে আশা করবে তখন সে মহাকাশযানের লেজের সামান্য অংশ দেখতে পাবে। এর কারণ হলো পৃথিবী থেকে সোজাসুজি বাইরের দিকে নির্দেশ করা যে আলো প্রবেশ করবে তা মহাকাশযানের কিছুটা পেছন থেকে ছোঁড়া হয়েছিল, এ্যাবারেশনের জন্য জায়গা ছেড়ে। আপেক্ষিকতাবাদের ওপর অনেক বইতে ভ্রমবশতঃ লেখা থাকে যে, একটি চলমান মহাকাশযান তার দৈর্ঘ্য-বরাবর অস্বাভাবিকভাবে খর্ব হয়ে যায়। সত্যিই একে ছোট দেখা যায় কিন্তু

ব্যাপারটি একটি নির্দিষ্ট কোণ থেকে দেখলে যা হওয়া উচিত সেই স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে।

একটি চলমান মহাকাশযান এ্যাবারেশনের দরুণ ঘড়ির আপাত মন্থর হয়ে যাওয়ার সরাসরি ব্যাখ্যা দেয়। এ্যাবারেশনের জন্য দর্শক একটি চলমান মহাকাশ যানকে দেখতে পায় সেই আলোতে যা তার পেছন দিক থেকে ছোঁড়া হয়েছে এই কারণেই মনে হয় যেন মহাকাশযানটি আপাতদৃষ্টিতে দর্শকের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এর ফলে আলো ডপলার বিক্রিয়ায় লালের দিকে সরে যাবে। এতে আলোর শক্তি ও কম্পনাংক কমে যায়, যখন উৎস এবং দর্শক পরস্পরের দিক থেকে সরে যায়। এটি তখনও ঘটে যখন দর্শক ভাবে যে পৃথিবীর পাশ দিয়ে যাবার সময় মহাকাশযানটি যতখানি কাছে আসা উচিত সেই জায়গায়ই আছে এবং ওটি দর্শকের দিকেও আসবে না আবার সরেও যাবে না। যদি আপাত অপসৃয়মান মহাকাশযান তার ঘড়ি থেকে দর্শকের কাছে সংকেত পাঠায় তারাও বেড়ে গিয়ে পেঁছবে এবং দর্শকের মনে হবে যেন মহাকাশযানের ঘড়িগুলি মন্থর যাচ্ছে।

স্কাইল্যাব এবং স্যালুয়েট-এর মত প্রকৃত মহাকাশযান পৃথিবীর চারিদিকে প্রায় সেকেণ্ডে পাঁচমাইল বা আলোর গতিবেগের চল্লিশহাজার ভাগের এক ভাগ গতি নিয়ে ঘুরত। এদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিক্রিয়াগুলি কম। মাধ্যাকর্ষণ ও সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের প্রতিক্রিয়াগুলি উপেক্ষা করলে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী মহাকাশযানের ঘড়িগুলি পৃথিবীর ঘড়িগুলির তুলনায় মন্থর চলবে। এর পরিমাণ হবে বছরে এক সেকেণ্ডের দুশো ভাগের এক ভাগ।

যে সব বস্তু খুব কম গতিতে চলছে তাদের ক্ষেত্রবিশেষে আপেক্ষিকতাজনিত সংশোধনের পরিমাণ খুব সামান্য। এই কারণে মোটর গাড়িতে যে সব ঘড়ি আছে তাদের সঙ্গে বাড়িতে রাখা ঘড়িগুলি মিলে যাবে। যে সমস্ত বস্তু আলোর গতিবেগ নিয়ে চলেছে সেখানে এই সংশোধনের পরিমাণ অসীম এবং সময়ের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

জগতের বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত না করে কেউ সময় নিয়ে অদ্ভুত কিছু করতে পারে না। $\frac{V}{C}$ এই ভগ্নাংশটি উচ্চগতির ফলে যে সব বৈচিত্র্য দেখা যায় তাদের নিয়ন্ত্রিত করে। এখানে V ও C যথাক্রমে বস্তু ও আলোর গতিবেগ।

এটি একটি বিশ্বজনীন সংশোধন। পৃথিবীতে অবস্থিত কোন দর্শকের কাছে দ্রুত চলমান নভোযানের কোন নভোচারীকে আশ্চর্যজনকভাবে যুবা মনে হতে পারে। পৃথিবীর দর্শক আরো মনে করবে সে চিরদিন যেমন ছিল তেমনি আছে কিন্তু তার দৃষ্টিতে নভোচারীর ও তার নভোযানের ভর বেড়ে গেছে।

কি ভাবে এটা হয়। মনে রাখতে হবে কোন বস্তুর ভর হচ্ছে ত্বরণের বিরুদ্ধে বাধা। ধরা যাক নভোচারী নভোযানের গতি বাড়াবার জন্য রকেট চালনা করল। নভোচারীর সাপেক্ষে নির্মাতাদের গণনা অনুযায়ী মোটরটি কাজ করবে। এতে তার ওপর ত্বরণের সৃষ্টি হবে। ধরা যাক যার পরিমাণ g। এতে তার গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৩২ ফুট করে বাড়বে। কিন্তু যে দর্শক পৃথিবীতে বসে দেখছে সে নভোচারীর সময়কে প্রলম্বিত দেখবে। নভোচারী যত তাড়াতাড়ি গতিবেগ আহরণ করছে পৃথিবীর দর্শকের দৃষ্টিতে কিন্তু ততটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে না। পৃথিবীর দর্শকের দৃষ্টিতে মোটরটি খুবই ধীর গতিতে চলছে। উচ্চগতি সম্পন্ন মহাকাশযান আরও ধীরে ত্বরিত হচ্ছে বলে মনে হবে।

ধরা যাক মহাকাশযানটি দূরে সরে যাচ্ছে। যেখানে পৃথিবীর দর্শকের দৃষ্টিতে বেশী গতি নিতে পারছে না সেখানে তার দৃষ্টিতে মহাকাশযানের ভর খুব বেশী পরিমাণে বাড়তে থাকবে। যে সময়ে মহাকাশযানের গতি আলোর গতিবেগের ৯৯.৯ ভাগ হয়ে যাবে সেখানে একটি ১০০ টনের মহাকাশযানের কার্যকরী ভর গিয়ে দাঁড়াবে ২২৩৭ টন। এই অতিরিক্ত ভর কার প্রতিনিধিত্ব করে? এই অতিরিক্ত ভর মহাকাশযানের গতিশক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করে। ত্বরণের ফলে মহাকাশযান যতই শক্তি আহরণ করতে থাকে ততই তার ভরও বাড়তে থাকে। মহাকাশযানের গতি যত আলোর গতিবেগের সমান হতে থাকে ততই শক্তি অসীম হবার চেষ্টা করে। সুতরাং মহাকাশযানের মোটরগুলি যদিও চিরকাল চলতে পারে তা সত্ত্বেও এমন শক্তি উৎপাদন করে না যাতে আলোর গতিবেগের সমান গতিবেগ সৃষ্টি করা যায়।

$$\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

রাশিটিকে গামা রাশি বলা হয়। গামা রাশিটি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে যা জাগতিক বস্তুকে আলোর সমান গতিবেগে চলতে বাধা দেয়। এখানে v = বস্তুটির গতিবেগ, c = আলোর গতিবেগ।

পৃথিবীর দর্শকের কাছে ভরের বৃদ্ধির ব্যাপারটি কোন মায়াজাল নয়। অপর দিকে যদি সে কোনো একটি বস্তুকে খুব বেশী গতিবেগ নিয়ে চালাতে বল প্রয়োগ করে তাহলে সে দেখতে পাবে এক সেকেণ্ডে একমাইল বেশী চালাতে তার ক্রমান্বয়ে বেশী শক্তি লাগবে। ত্বরণ যন্ত্রে (accelarator) ঠিক এরমই একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়। এখানে মানুষ কণাদের উত্তরোত্তর শক্তি বাড়াতে থাকে। কিন্তু যখন কণাদের গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি হয় তখন তাদের গতি বৃদ্ধি প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে ভর বাড়তে থাকে।

এইখানেই একটি বস্তু সম্পূর্ণ হলো। পাঠক লক্ষ্য করবেন আমরা ভর শক্তির সমতুল্যতা সূত্রে ফিরে এলাম। আইনস্টাইন তার বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূল নিয়ম হিসাবে এটিকে আবিষ্কার করেছিলেন। দ্রুতগামী বস্তুর ভর গামা রাশিটি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। বস্তুটি স্থির হয়ে গেলে গামার মান ১ হয়ে যায় এবং তখনই শক্তিকে স্থিতি শক্তি বলি। তফাৎটা হলো গতির শক্তির। ঘড়ির মন্থর হয়ে যাওয়া বিশেষ করে শক্তি বাড়াতে কাজে লাগানো হয়। শূন্যে উচ্চগতিতে (যেমন গ্রহ নক্ষত্র বা কৃষ্ণ গহ্বরের মাধ্যাকর্ষণের বেলায়) শক্তির সঞ্চয় বাইরের কাছে সময়কাল মন্থর হয়ে যাওয়া বলে প্রতিভাত হবে। যেমন কৃষ্ণগহ্বরের পরিসীমায় সময় একেবারে থেমে যায় ঠিক সেই রকম যদি কেউ আলোর গতিবেগ নিয়ে চলে তাহলেও সময় থেমে যাবে। দূরত্বের ব্যাপারটা দর্শকের কাছে অর্থহীন হবে এবং তার যাত্রা স্থল আর গন্তব্য স্থল একই স্থানে মনে হবে।

যদি একটি মহাকাশযান আলোর গতিবেগ নিয়ে সংকেতের সঙ্গে যায় তাহলে সে ভাববে যে, শেষ সীমায় এসে পৌঁছুচ্ছে সেই সময়ে যে সময়ে সে যাত্রা শুরু করছে। সময় অবাধে বর্ধিত হয় এবং দূরত্ব কমে গিয়ে শূন্য হয়ে যায়। পৃথিবীর দর্শক মনে করবে ক্ষুদ্র মহাকাশযানের ঘড়িগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। সত্যি বলতে কি কেউ যদি আলোর গতিবেগ নিয়ে চলে তাহলে সে সমগ্র বিশ্বকে মুহূর্তে-মধ্যে অতিক্রম করে যেতে পারে। স্থান কাল ব্যাপারটিই চলে যাবে। শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হবার ফলে গতি ধীর হয়ে যাবে। এই কারণে আলোর গতিবেগ নিয়ে চলা অসম্ভব এবং তাতেই আমাদের অস্তিত্বের জন্য বিশ্ব স্থান কালকে সুযোগ দেয়। তবুও কেউ যত দ্রুত চলবে ততই মানুষের জীবন আলোর মতন হয়ে যাবে, স্থান সংকুচিত হবে সময় মন্থর হয়ে যাবে।

নীতিগত ভাবে মানুষ তার জীবদ্দশায় বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। আলোর গতিবেগের প্রায় এক দশমাংশ নিয়ে অন্য তারাদের কাছে যাওয়া হয়ত মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে। সেই গতিবেগ ও সময়ে উচ্চগতিতে ভ্রমণ করার ব্যাপারটা তুচ্ছ হয়ে পড়বে। নক্ষত্রদের গড় দূরত্ব অর্থাৎ প্রায় পাঁচ আলোবর্ষ পরিমাণ পথ যেতে পৃথিবীর দর্শকের কাছে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লাগবে—ভ্রমণকারীর কাছে এর থেকে মাত্র তিন মাস কম। সেই সময়ে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্র যাবার পথে আলোর সমান গতিবেগ নিয়ে চলার কথা বারে বারে মনকে খোঁচা দেবে। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী যে কেউ কল্পবিজ্ঞানের নায়কদের মতন দুটি তারার মাঝে ছোটাছুটি করতে পারে।

ধরা যাক উচ্চগতিতে ধাবমান নভোচারীর কাছে এক ম্যাপ আছে যা পৃথিবীতে বসে আঁকা। এই ম্যাপে তারাদের অবস্থান ও তাদের দূরত্ব দেখান আছে।

নভোচারী তারাদের এই অবস্থান থেকে গতিবেগ ধারণা করে নিতে পারে। সে একথা বলতে পারে যে, "এই নক্ষত্রটি শেষের নক্ষত্রের চেয়ে চার আলোকবর্ষ দূরে এবং একটির থেকে অন্যটিতে যেতে আমার সময় লেগেছে আট আলোকবর্ষ। সুতরাং পৃথিবীতে থাকা দুটি স্থানের মধ্যে আমার গতিবেগ আলোর অর্ধেক।" মনে রাখতে হবে যে তার গতিবেগ যত বাড়বে তত তার ঘড়ি মন্থর হতে থাকবে। পৃথিবী থেকে গণনা করলে, একটি গতিবেগ আছে, যে গতিবেগে ঘড়ি শ্লথ হওয়ার ব্যাপারটা খুব বেশী হবে। তখন নভোচারীর মনে হবে কার্যকর ভাবে সে আলোর গতিবেগকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই গতিবেগটি আলোর গতিবেগের ৭১ শতাংশ। এর থেকে গতিবেগ বেশী হলে পৃথিবীতে বসে আঁকা ম্যাপের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোর চেয়ে অনেক বেশী গতি হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে পৃথিবীর সাপেক্ষে আলোর গতিবেগের শতকরা নিরানব্বুই ভাগ গতিবেগ নিয়ে চললে নভোচারীর মনে হবে সে যেন নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে বছরে সাত আলোকবর্ষ গতিবেগ নিয়ে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে। অবশ্য ঘড়ি মন্থর হয়ে যাবার জন্যই এ ঘটনাটা ঘটছে। পৃথিবীর কোন দর্শকের কাছে সে তখন বছরে এক আলোকবর্ষের চেয়ে কম গতি নিয়ে চলছে।

যদি নভোচারী নিজে নক্ষত্রদের মধ্যে দূরত্ব মাপার কষ্টটা নিতে রাজী থাকে তাহলে পৃথিবীতে আঁকা ম্যাপটি তার কাছে ভুল বলে মনে হবে। দূরত্ব মাপার ব্যাপারটা গতিবেগের ওপর নির্ভর করে এবং নভোচর যেদিকে যাচ্ছে সমস্ত বিশ্ব সেদিকে ছোট হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ সে যদি রাডার ব্যবহার করে তাহলে তার মন্থরগতিতে চলা ঘড়িতে দুটি নক্ষত্রের মধ্যে দূরত্ব খুব কম মনে হবে। দূরত্ব ছোট হয়ে যাওয়া ঘড়ি মন্থর হয়ে যাবার ব্যাপারটিকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে এবং তাতে এই সিদ্ধান্তে আসবে যে শেষ পর্যন্ত সে আলোর গতিবেগের নিরানব্বুই শতাংশ নিয়ে চলছে।

এই নিয়মমাফিক সংশোধনের উদ্দেশ্য এই নয় যে নভোচারী জীবদ্দশায় দূরবর্তী কোন জায়গায় যাওয়ার ক্ষমতাকে অস্বীকার করা। এই সম্ভাবনাটি কোনদিন বাস্তবায়িত হবে কিনা তা কে বলতে পারে?

উচ্চগতি নিয়ে চলার সময় জিনিষ কিভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় বোঝার জন্য আমরা একবার দৃষ্টি ফেরাতে পারি ষ্ট্যানফোর্ডে স্থাপিত ত্বরণ যন্ত্রের দিকে। এখানে ইলেকট্রন প্রায় দু' মাইলের পথ অতিক্রম করছে। আগেই বলা হয়েছে যে ইলেকট্রনদের গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি চলে আসে। যাত্রা শুরুর সময় তাদের যে ভর ছিল তা প্রায় ৪০,০০০ গুণ বেশী হয়ে যায়—গতিশক্তিই বেড়ে যায়। একই কারণে ত্বরণ যন্ত্রের কার্যকরী দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে যায়। ইলেকট্রনদের

সম্পূর্ণ গতিবেগ নিয়ে দেখলে দুই মাইল দৈর্ঘ্য তিন ইঞ্চিতে পরিবর্তিত হয়। ইলেকট্রনের সাথে যে ঘড়ি লাগানো আছে তা একই ভাবে মন্থর হয়ে যায়। ফলে বাইরের থেকে আমরা যাকে দু' মাইল দীর্ঘ পথ বলে ভাবছি পূর্ণগতি ইলেকট্রনদের পক্ষে তা অতিক্রম করতে এক সেকেন্ডের এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময় লাগবে। ইলেকট্রনরা তাদের ঘড়ি এবং আমাদের ম্যাপ অনুযায়ী আলোর গতিবেগের ৪০,০০০ গুণ বেশী গতিতে তাদের ভ্রমণ শেষ করে। কিন্তু তাদের ঘড়ি ও তাদের ম্যাপ অনুযায়ী তারা আলোর গতিবেগের কম গতি নিয়ে চলছে। সময় ও স্থানকে একই ভাবে পরিবর্তিত করে গামা সংখ্যাটি আলোর গতিবেগকে অপরিবর্তিত রেখে দেয়।

শেষ পর্যন্ত আমরা দ্বৈত ধাঁধাঁর প্রকৃত অর্থের সন্ধান পেলাম। শক্তি আপেক্ষিক। উদাহরণ স্বরূপ উচ্চগতি বিশিষ্ট নভোচারী নিজে কিন্তু বুঝতে পারে না যে কি পরিমাণে সে শক্তি সম্পন্ন এবং ভারী হয়েছে। নভোযানের ছোট পরিসরে সে স্থির। ভরশক্তির সমতুল্যতার জন্য তার দৃষ্টিকোণ থেকে কাছাকাছি সমস্ত তারারা খুব দ্রুতগতি ও ভারী হয়ে পড়েছে। ঘড়িগুলির মধ্যে যদি কোন তারতম্য না থাকত তাহলে তার ফল হতো মারাত্মক। মনে হত পৃথিবী সূর্যের গায়ের ওপরে গিয়ে পড়ছে।

যদি দ্রুতগতি সম্পন্ন নভোচারী মনে করে সূর্যের ভর খুব বেশীরকম ভাবে বেড়ে গেছে তা হলে তার মাধ্যাকর্ষণও সেই পরিমাণে বাড়বে। যদি গ্রহদের গতি কোন না কোন ভাবে থামিয়ে না নেওয়া যায় তাহলে কারুর পক্ষে এটা আশা করা অন্যায় হবে না যে নভোযানের দ্রুতগতি সূর্যের আপাত ভরকে সাংঘাতিক ভাবে বাড়িয়ে দেবে যার ফলে সমস্ত গ্রহরা সূর্যের ওপরে পতিত হয়ে নিজেদের বিপর্যয় ডেকে আনবে।

যে বিশ্বে সব কিছু সুস্থিত হয় তবে এমন আশা করা ঠিক হবে না যে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব নির্ভর করবে কে নক্ষত্রকে দেখছে তার ওপরে। তাহলে চলমান পারমাণবিক কণাই বিরাট এই গ্যালাক্সির ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। ঘড়ির মন্থর হয়ে যাবার ব্যাপারটা আমাদের তথা পদার্থবিদ্যাকে এই সংকট থেকে পরিত্রাণ দেয়। ঘড়ি মন্থর হয়ে যাবার জন্য উচ্চগতি কোন বস্তুকে কোথাও কোন বিপর্যয় ডেকে আনতে বাধা দেয়। যদি নভোচারী সূর্যের ভর দ্বিগুণ হয়ে যেতে দেখে তবে সে এটাও দেখবে যে পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে দ্বিগুণ গতিবেগ নিয়ে ঘুরছে। এই অতিরিক্ত গতি সূর্যের মাধ্যাকর্ষণের আপাত বৃদ্ধি সত্ত্বেও আপন কক্ষপথে অক্ষত থাকতে পারে।

এই ভাবে দেখা গেল, আইনস্টাইন সারা বিশ্বকে সংহত রাখলেন যখন তিনি

চরম সময়ের ধারণাটিকে বাতিল করে দিলেন। সময় দর্শকের ওপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে দেখালেন তখনই তিনি সমস্ত পদার্থবিদ্যাকে গভীরতর বৈপরীত্য থেকে রক্ষা করলেন। তাঁর সাহসের জন্য তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঘড়ির সময়ের পরিবর্তন, সীমানা নির্দেশক কারী হিসাবে আলোর গতিবেগ এবং $E=mc^2$ সমীকরণটি সব কিছুই গামা রাশিটির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। কম মানের গতিবেগের ক্ষেত্রে গামা রাশিটির মান হয় এক। এবং এই সময়ে গতির সকল নিয়মগুলিই নিউটন প্রস্তাবিত নিয়মের সঙ্গে মিলে যায়। উচ্চগতিবেগের বেলাতে বিশ্ব আইনস্টাইনের নিয়মগুলি মেনে চলে।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সব মানুষের ক্ষেত্রে এক হবে—আইনস্টাইনের তত্ত্বের এইটাই মূল কথা। যদি এটা ভ্রান্ত হতো তাহলে যে ভৌত নিয়মে শীতকালে বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে গ্রীষ্মকালে তারা ভগ্ন প্রায় হয়ে যেতো। আমাদের বেতার যন্ত্রটিকে মাসে মাসেই নিয়ন্ত্রিত করতে হত। পৃথিবীর ঘোরা এবং মহাশূন্যে গতি সত্ত্বেও যে জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে না এসব হলো আইনস্টাইনের নীতির স্থানীয় উদাহরণ। যদি পিসা এবং কেমব্রিজে, সকাল সন্ধ্যায় ভৌত নিয়মগুলি পালটে যেতো তাহলে বিজ্ঞান বেশীদূর অগ্রসর হতে পারত না। নভোচারীরা পৃথিবীর বাইরের বিশ্বকে যে অনুধাবন করতে পারেন, তার উপকরণ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারেন তার কারণ হলো অনন্তকাল পরমাণুর চরিত্র একই থাকছে। বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে যে কোয়াসার আছে তার মধ্যে পরমাণুগুলি পৃথিবীতে যে সব পরমাণু দেখা যায় তাদেরই মতন। আইনস্টাইনের প্রস্তাবিত নীতির মধ্যে যে সংহতির কথা বলা আছে তা যদি না থাকত তাহলে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের জন্য নির্ভরযোগ্য পরিবেশ গড়ে উঠত না।

পরমাণু, ক্ষেত্র, কোয়াসার প্রভৃতি জিনিষের কার্য প্রণালীকে প্রকৃতি একটি জিনিষ দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। মাধ্যাকর্ষণ, তাঁড়তশক্তি কেন্দ্রীনশক্তি সব কিছুর মধ্যেই এই জিনিষটি সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই জিনিষটি হলো চিরন্তন ধ্রুবক আলোর গতিবেগ—যাদু ময় 'c' অক্ষরটি। আলোর গতিবেগ ধ্রুবক কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে যদি সামান্য মাথা ধরে তবে তার মূল্য হবে আলোর গতিবেগ ধ্রুবক হওয়ার দরুণ আমরা যে সুবিধা ভোগ করি তার নিরিখে খুবই সামান্য।

আলোর গতিবেগ

১। শূন্যে সকল আলো একই গতিবেগ নিয়ে চলে।
২। উৎসের গতিবেগের ওপর আলোর গতিবেগ নির্ভর করে না।
৩। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী আলোর গতিবেগ দর্শকের গতিবেগের ওপরও নির্ভর করে না।
৪। কোন সংকেত বা শক্তি আলোর চেয়ে বেশী গতি নিয়ে চলতে পারেনা।
৫। উচ্চগতিতে ১+১=২ নয়।

আলোর গতিবেগ মাপার যে সব প্রক্রিয়া আছে তার প্রায় সবকটি রাডার কার্যপ্রণালীর ওপর নির্ভরশীল। এই নীতি অনুযায়ী এক জায়গা থেকে আলো পাঠিয়ে আরেক জায়গা থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। এই দুটি জায়গার দূরত্ব যদি জানা থাকে এবং আলোর যাতায়াতের সময় যদি জানা থাকে তাহলে আলোর গতিবেগ বার করে ফেলা যায়। সঠিক ভাবে এই গতিবেগ মাপার ব্যাপার শূন্যে করা উচিত কেননা কাঁচের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আলোর গতিবেগ কমে যায় এমন কি বায়ু আলোর গতিবেগের বেশ কিছু অংশ প্রতিহত করে। আলোর গতিবেগ কোন বিশেষ দিকের ওপর নির্ভর করে কিনা তা দুটি আয়নার সাহায্যে লক্ষ্য করা যেতে পারে। দেখা যাবে যে আলো কোন বিশেষ দিকের ওপর নির্ভর করে না।

সমস্ত পরিবেশে শূন্য স্থানে আলোর গতিবেগ সব সময় এক থাকছে এই ব্যাপারটি বোঝাই আপেক্ষিকতাবাদের মধ্যে সবচেয়ে অস্বোয়াস্তিকর দিক। এইটাই আইনস্টাইনের প্রধান অনুমান এবংপরীক্ষার দ্বারা এই অনুমানের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও ব্যাপারটা আইনস্টাইনের সমকালীন বিজ্ঞানীদের সঙ্গত কারণেই হতবাক করেছিল। শব্দের বেলাতে গতিবেগ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে উৎসের গতিপ্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। আলোর গতিবেগের বেলাতে এধরণের তারতম্য দেখা যায় না।

ধরা যাক পৃথিবীর কোন গবেষণাগারের জানালা দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। এই আলোর গতিবেগ মাপা হলো, এর পরিমাণ দাঁড়াবে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। এখন আলোর গতিবেগের অর্ধেক গতিবেগ নিয়ে সূর্যের দিকে চলমান নভোযানে বসে আলোর গতিবেগ আবার মাপা হলো। এবারও দেখা যাবে আলোর গতিবেগ ১৮৬,০০০ মাইল প্রতি সেকেণ্ডে। একই গতিবেগ নিয়ে যদি উল্টো দিকে যাওয়া যায় তাহলেও আলো সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল বেগে পিছন ধাওয়া

করবে। আরও নানান ভাবে পরীক্ষা চালালে দেখা যাবে আলোর রঙ সুস্পষ্ট ভাবে লাল বা নীলের দিকে সরে গেলেও আলোর গতিবেগ কিন্তু একই থাকছে।

আবার অবস্থার পরিবর্তন করা যাক্। ধরা যাক্ আলোর উৎসটিই চলমান। একজন নভোচারীর কোন দর্শকের পাশ দিয়ে যাবার সময় দর্শকের দিকে একগুচ্ছ লেসার রশ্মি ছুড়ে দিল। দর্শক যদি এই আলোক গুচ্ছ ধরে তার গতিবেগ পরিমাপ করে তাহলে সে দেখতে পাবে নভোচারী তার দিকে আলোর গতিবেগের অর্ধেক গতিবেগ নিয়ে এগিয়ে আসলেও আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইলই থাকছে। নভোচারী যখন দর্শকের কাছে এগিয়ে আসছে বা সরে যাচ্ছে দুবারই কিন্তু আলোর গতিবেগ একই থেকে যাচ্ছে। মনে হয় কে তাকে দেখছে তার ওপর নির্ভর করে হতভাগ্য আলোকে তার গতিবেগ বাড়াতে বা কমাতে হচ্ছে। শুধু তাই নয় একই সময়ে আলোকে ভিন্ন ভিন্ন গতিবেগ নিয়ে চলতে হচ্ছে। কিন্তু আলো কণার সমষ্টিমাত্রও কোন কিছুকে আঘাত করার আগে তাদের ইচ্ছামত চলে। কোন কিছুতে ধাক্কা লেগে তারা প্রতিহত হয়ে আসে কিংবা তাদের সকল শক্তিকে তড়িতাধানযুক্ত কণাতে হস্তান্তরিত করে দেয়। আলোর কণারা এইসব কাজই করতে পারে কিন্তূ তারা আপেক্ষিকতাবাদের সমীকরণ কখনই শেখে নি।

আলোর কণাগুলি খুব দ্রুত কিন্তু সুচতুর। শূন্যস্থানে তারা একে অপরকে অতিক্রম করে যায় না। সুতরাং শূন্যস্থানে আমরা ভাবতে পারি যে আলোর কণাদের মিছিল চলেছে সুসমঞ্জস ভাবে, কেউ দ্রুতও হচ্ছে না কেউ মন্থরও হচ্ছে না। টর্চের আলো জ্বলে উঠলে বা নক্ষত্রের বিস্ফোরণ ঘটলে এধরণের আরও মিছিল বার হবে। সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা রঞ্জন রশ্মি বা দূরবর্তী কোয়াসার থেকে বেরিয়ে আসা বেতার তরঙ্গের সঙ্গে এক হয়ে যাবে। টর্চের বা বিস্ফোরণশীল নক্ষত্রের গতিবেগ যাই হোক না কেন সেখান থেকে বেরিয়ে আসা আলোর কণা-গুলির গতিবেগ সফররত অন্যান্য আলোক কণার মতই হবে। কেন এধরণের ব্যাপারটা ঘটবে সে প্রশ্নটি আপাতত মুলতুবী রাখা যেতে পারে।

প্রত্যেকটি আলোর কণা জানে তাকে কি গতিবেগ নিয়ে চলতে হবে। এতে মনে হয় যে আলোর গতির সঙ্গে তুলনা করে কোন মানুষ বিশ্বে তার নিজস্ব গতিবেগ পরিমাপ করে নিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ কোন মানুষ তার গতিবেগ এমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যে আলো তার চারিপাশে একই গতি নিয়ে চলছে। তখন মনে হবে আলোর সকল কণার সাপেক্ষে সে স্থির হয়ে আছে।

ওপরের ব্যাপারটি চেষ্টা করলে মানুষ দেখবে যে তার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে না। সে দেখবে সে স্থির আর তার পাশ দিয়ে আলোর সব কণা সঠিক

গতি নিয়ে চলে যাচ্ছে। মানুষ তখন ভাববে বোধহয় কোপার্নিকাস ভুল করেছিলেন, পৃথিবীই শেষ পর্যন্ত মহাবিশ্বের কেন্দ্রে স্থির হয়ে বসে আছে। নভোচারীর কণ্ঠস্বর তখন বেতারে ভেসে আসবে—"না তা ঠিক নয় আমিই স্থির হয়ে আছি।" আমার কাছে সব দিকেই আলোর গতিবেগ সমান আর আলোর গতিবেগের অর্ধেক গতিবেগ নিয়ে পৃথিবী আমার পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের চিন্তায় মানুষ বুঝতে পারবে বিভিন্ন গতি সম্পন্ন উৎস থেকে বেরিয়ে আসার সময় যে ঘটনা ঘটেছিল তারই বিপরীত ঘটনা ঘটছে। সাধারণ প্রবাহের সঙ্গে সংগতি রেখে যে গতি শুরু হয়েছিল লক্ষ্যস্থলে পেঁছে কে তাকে দেখেছে তার সুবিধা অনুযায়ী আলো গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। আলো সব মানুষের কাছে সমান।

এ ধরণের গীয়ার পরিবর্তন করার জন্য আইনস্টাইনের বিশ্ব গণতান্ত্রিক। ঘটনাগুলি এতই সংগোপনে সংঘটিত হয় যে যারা এদের দেখছে তারা বুঝতেই পারে না কি হচ্ছে। কোন কিছু গোপন করা হচ্ছে একথা মানুষ যদি না জানে তবে তার গোপনীয়তা বেড়ে যায়। আইনস্টাইনের তত্ত্বে প্রকৃত গতিবেগ কোনটা তা বোঝার উপায় নেই, কে যে স্থির তাও জানবার উপায় নেই, সমস্ত দর্শকই এক। যেসব ক্ষেত্রে ত্বরণ বা মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব এসে পড়ে সেই সব অবস্থাতেই কেবল আলোর গতিবেগ পরিবর্তন হতে পারে। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদেই এ ঘটনাগুলি ঘটে। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ স্থির উচ্চগতি নিয়ে ভাবে এবং মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে।

আলোর গতিবেগ ও বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদে তার ভূমিকার ব্যাপারে তিনটি সুস্পষ্ট ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত রহস্য আছে। প্রথমটি হলো উৎসের গতিবেগের ওপর নির্ভর না করে আলো সর্বদিকে সমান গতিবেগ নিয়ে চলে। দ্বিতীয়তঃ হলো দর্শকের গতিবেগ যাই হোক না কেন তার কাছে আলোর গতিবেগ সব সময় সমান। তৃতীয়তঃ কোন গতিবেগই আলোর চেয়ে বেশী হতে পারে না।

উৎসের গতি যাই হোক না কেন শূন্যে আলো সব দিকে সমান গতিতে চলে —একথাটা বুঝতে আইনস্টাইনের শরণাপন্ন হবার দরকার নেই। এই বিশ্বেই এই কথাটির সত্যতা যাচাই করার উপায় নিহিত আছে। এর জন্য আমাদের একস্-রে পালসারের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। সাধারণ আলোর থেকে একস্‌রশ্মি দিয়ে আলোর গতিবেগ পরিমাপ করা সুবিধা কেননা ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান পরমাণুর দ্বারা রঞ্জন রশ্মি কম বিক্ষিপ্ত হয়। এর ওপরে একস্-রে পালসার খুব দ্রুতগতিতে চলে। সুতরাং উৎসের গতির যদি কোন প্রতিক্রিয়া থাকে তাহলে পালসারের থেকে বেরিয়ে আসা একস্ রশ্মিতে তা ধরা পড়বে। তাদের গুণের এই শেষ নয়। তারা নিয়মিত ভাবে আলোকময় হয়ে পড়ে যাতে ডপলার এফেক্টের সাহায্যে তাদের

গতিবেগ খুবই সঠিকভাবে মাপা যায়। ১৯৭৭ সালে ম্যাসাচুসেটস্ এর এক বিজ্ঞানী কেনেথ ব্রেচার, পালসার থেকে বেরিয়ে আসা রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে আইনস্টাইনের অনুমানকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অনুমান এত নিশ্চিতভাবে কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

একস্-রে পালসার হলো ধ্বংসপ্রাপ্ত নিউট্রন নক্ষত্র যা সাধারণ নক্ষত্রের চারিপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সাধারণ নক্ষত্র থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস নিউট্রন নক্ষত্রের দেহে ধাক্কা মারে ও তাতে একস্-রশ্মি বেরিয়ে আসে। নিউট্রন নক্ষত্র নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘোরে এবং আলোক ঘরের মত নিয়মিতভাবে আলো ছাড়তে থাকে। যদি একস্-রে পালসার পৃথিবীর সাপেক্ষে সুবিধাজনকভাবে অবস্থান করে যাতে কক্ষপথটিকে দেখা যায় তাহলে কিছুক্ষণের জন্য নক্ষত্রটি দর্শকের দিকে এগিয়ে আসবে, সঙ্গীর চারপাশ দিয়ে ঘুরে দর্শকের থেকে দূরে সরে যাবে। এসবই ঘটবে উচ্চগতিতে।

মুহূর্তের জন্য ধরা যাক্ আইনস্টাইন ভুল করেছিলেন এবং আলো বা একস্-রশ্মির গতিবেগ উৎসের গতিবেগের ওপর নির্ভর করে। পালসার যখন পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসবে তখন যে একটু একস্-রশ্মি ছাড়বে তার গতিবেগ বেশী বলে মনে হবে। অপরদিকে যখন পালসার বিপরীত দিকে চলবে তখন তার থেকে বেরিয়ে আসা একস্-রশ্মিকে মনে হবে কম গতিকে নিয়ে আসছে। একস্-রে চক্ষু দিয়ে দেখলে ব্যাপারটি অদ্ভুত দাঁড়াবে। উদাহরণ হিসাবে মনে হবে একস্-রে পালসার দর্শকের দিকে এগিয়ে আসছে তারপর আবার অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো একস্-রে পালসার যখন দূরে হঠে যাবে তখন তার থেকে যে রঞ্জন রশ্মি বেঁকবে তা আমাদের কাছে পেঁছুতে দীর্ঘ সময় নেবে। মন্থর গতি একস্ রশ্মিদের আসার ফাঁকে মনে হবে আলোক বার্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। একশো আলোক বর্ষ দূরে গতির পরিবর্তন যদি বিলিয়ন ভাগের একভাগ হয় তাহলে তথাকথিত শ্লথ একস্ রশ্মির ক্ষেত্রে দ্রুত গতি একস্ রশ্মির তুলনায় তিন সেকেন্ড দেরী হবে। তফাৎটি যদি আরও বেশী হয় তাহলে পরবর্তী দ্রুতগতি একস্ রশ্মিরা মন্থর একস্ রশ্মিদের অতিক্রম করে যাবে। এই ধরণের অনুমান করলে একটি চমকপ্রদ দৃশ্যের অবতারণা হয়। মনে হবে একই সময়ে নক্ষত্রটি এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাচ্ছে এতে প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যাবে ও এটা বুঝতে সাহায্য করবে যে আইনস্টাইনের অনুমান ভুল হলে সমস্ত বিশ্ব কেমন বিশৃঙ্খল হয়ে যেত। ব্রেচার তার এক্স-রে পালসারের মধ্যে এই ধরণের জিনিষ যেমন কক্ষপথের আপাত বিচ্যুতি অথবা সঙ্গী নক্ষত্রের পেছন দিয়ে যাবার সময় গ্রহণের বিলম্ব প্রভৃতি সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াগুলির লক্ষ্য করার চেষ্টা করেছিলেন। বিজ্ঞানী ব্রেচার এ ধরণের

কোন কিছু যন্ত্রের সাহায্যে ধরতে পারেননি। ফলে তিনি নিশ্চিত হলেন যে আলোর গতিবেগ একটি ধ্রুবক সংখ্যা। ব্রেচারের যন্ত্রপাতি এতই সূক্ষ্ম ছিল যে আইনস্টাইনের অনুমানের সামান্যতম ত্রুটিও তিনি ধরতে সক্ষম ছিলেন।

কিন্তু কেন? আইনস্টাইনের কাছে এটা স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়েছিল যে আলো শূন্য স্থানে সবসময় একই গতিবেগ নিয়ে চলবে। আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রবন্ধগুলিতে তিনি আলোর গতি সম্বন্ধে যে অনুমানগুলি করেছিলেন তা করেছিলেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। একটি ক্ষেত্রে তিনি ছোট একটি পাদটীকা লিখেছিলেন—"আলোর গতিবেগের ধ্রুবকত্ব ম্যাকস্ওয়েলের সমীকরণে আত্মগোপন করে আছে।"

ম্যাকস্ওয়েল কয়েকটি সমীকরণ খাড়া করে দেখালেন যে আলো চরিত্র হিসাবে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। যার গতিবেগ হলো c। আইনস্টাইন এই সিদ্ধান্তে এলেন যে আলোর গতিবেগ কোন ভাবেই উৎসের গতিবেগের ওপর নির্ভর করে না। তাঁর সরল যুক্তি হলো একটি চুম্বক তারের পাশ দিয়ে যাচ্ছে না একটি তার চুম্বকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে এই দুই অবস্থা তড়িৎ সংক্রান্ত ঘটনার মধ্যে কোন পার্থক্য রচনা করে না। উভয় ক্ষেত্রেই চুম্বকের স্থান পরিবর্তন তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে।

আইনস্টাইনকে ধন্যবাদ দেওয়া প্রয়োজন কেননা তাঁরই জন্য চুম্বকত্ব আজ আপেক্ষিকতাবাদে তড়িৎ বলের ওপর গতির পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া। তড়িৎচুম্বকীয় তত্ত্বে পরিবর্তনশীল চুম্বকত্ব সন্নিহিত অঞ্চলে পরিবর্তনশীল তড়িৎকেন্দ্রের সৃষ্টি করে—এই ব্যাপারটা চলতেই থাকে। এই ঘটনাগুলি শূন্যে সামনের দিকে একই গতিবেগ নিয়ে ছুটে চলে—এই গতিবেগই হলো আলোর গতিবেগ।

কার গণনায় আলোর গতিবেগ সবসময় এক থাকে? এর উত্তর হলো সকলের। দর্শকের যাই গতিবেগ হোক না কেন তার কাছে আলোর গতিবেগ সবসময় একই থাকবে—একথাটি কিন্তু আগেকার কথাগুলির চেয়ে ভিন্ন। এটাই হলো আপেক্ষিকতাবাদে আইনস্টাইনের সবচেয়ে বড় অনুমান। যখন ছোট ছিলেন তখন তাঁর কেবলি মনে হত যে যদি আলোর গতিবেগ নিয়ে আলোর সঙ্গে চলেন তাহলে আলো তার কাছে কিরূপে প্রতিভাত হবে। তিনি অনুমান করলেন এমন অবস্থাতে আলো নিশ্চয় একই থাকবে কেননা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ একইভাবে চলবে কোন অস্বাভাবিক ভাবে জমাট বেঁধে যাবে না। তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ সম্বন্ধে ম্যাকস্ওয়েলের সূত্রগুলি প্রত্যেক দর্শকের কাছে একই থাকবে তার গতিবেগ যাই হোক না কেন।

বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সংক্রান্ত একটি নিবন্ধে আইনস্টাইন দেখালেন

কিভাবে প্রকৃতি আলোর গতিবেগের এই অদ্ভুত চরিত্রটি বজায় রাখছে। আলোর গতিবেগ সব সময় একই থাকতে পারে যদি দূরত্ব ও সময়ের পরিমাপ প্রত্যেক দর্শকের ব্যক্তিগত ব্যাপার হয়। যে পৃথিবীতে বসে আছে আর যে নভোযানে আলোর গতিবেগের অর্ধেক গতিবেগ নিয়ে চলেছে তারা প্রত্যেকেই আলোর গতিবেগ একই দেখবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক দূরে সরে যাওয়া নভোচারীর নভোযানের জানালা দিয়ে কেউ একটি লেসার রশ্মি ছুঁড়ে দিল। নভোচারীর দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকরশ্মি স্বাভাবিক গতি নিয়ে নভোযানের নাক বরাবর যাবে। পৃথিবীর দর্শকের কাছে নভোযানের আপেক্ষিক গতিবেগ আলোর গতিবেগের অর্ধেক এবং তার মনে হবে লেসার রশ্মি পৌঁছুতে দ্বিগুণ সময় লাগবে। এই দুটি বৈপরীত্য মেলান যায় যদি পৃথিবীর দর্শক মনে করে নভোযানটি নভোচারী যা মনে করে তার চেয়ে ছোট এবং নভোচারীর ঘড়ি মন্থর হয়ে যাচ্ছে। আগের অধ্যায়ে যে গামা সংখ্যাটির কথা বলা হয়েছে সেই সব ব্যবস্থা নেবে।

দর্শকের গতিবেগ যাই হোক না কেন আলোর গতিবেগ সবসময় একই থাকে এটা প্রতিপন্ন করার জন্য বহু পরীক্ষা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৮৮০ সালের মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষাটি উল্লেখযোগ্য। অভূতপূর্ব নির্ভুলতার সঙ্গে মাইকেলসন আলোর গতিবেগ পরিমাপ করেছিলেন। লম্বভাবে অবস্থিত বিভিন্ন দিকে আলোর গতিবেগ বিভিন্ন হয় কিনা দেখার জন্য তিনি অনুসন্ধান চালান—শূন্যে পৃথিবী পরিক্রমার দরুণই এই পরিবর্তন আসতে পারে। অনেক চেষ্টা করে তিনি কোন তফাৎ খুঁজে পেলেন না। আপেক্ষিকতাবাদের যারা ইতিহাস রচনা করেন তাঁরা মাইকেলসন মর্লির ফলকে আইনস্টাইনের প্রেরণা হিসাবে ভাবেন। আইনস্টাইন লিখিত পত্রে জানা গেছে যে তিনি যখন আপেক্ষিকতাবাদের প্রথম নিবন্ধটি রচনা করেন তখন তিনি মাইকেলসন মর্লির পরীক্ষার কথা জানতেনই না। তবুও আইনস্টাইনের নিবন্ধটি পৃথিবীর সকল পদার্থবিদ্‌দের মধ্যে আলোড়নের সূচনা করেছিল। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁদের ধারণার মধ্যে কোন একটি ত্রুটি আছে এবং আইনস্টাইন প্রকৃত সত্য প্রকাশ করতে পারবেন।

আলোর গতিবেগ সম্বন্ধে আরেকটি কৌতূহলপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সন্ধান পেয়েছেন আইনস্টাইন। যখন বস্তুদের গতি আলোর গতিবেগের কাছাকাছি হয় তখন সাধারণভাবে তাদের গতিবেগ যোগ করা যায় না। কল্পনা করা যাক দুটি গ্যালাক্সি আলোর গতিবেগের পঁচাত্তর ভাগ গতিবেগ নিয়ে বিপরীত দিকে ছুটে চলেছে। সরলভাবে তাদের গতিবেগ যোগ করলে দাঁড়াবে তারা পরস্পর থেকে আলোর গতিবেগের $\frac{3}{2}$ ভাগ গতি নিয়ে ছুটে চলেছে। এক্ষেত্রে মনে হতে পারে একটি গ্যালাক্সি থেকে অপর গ্যালাক্সি-কে দেখা যাবে না কেননা তাদের থেকে

বেরিয়ে আসা আলো একে অপরকে ধরতে পারবে না। কিন্তু ভাবা দেখা সহজ যে গ্যালাক্সি দুটি নীতিগত ভাবে একসঙ্গে থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ তাদের মধ্যে কেউ অপরকে একটি বার্তা পাঠাতে পারে, প্রয়োজন বোধে পৃথিবী দিয়ে। পৃথিবী সাপেক্ষে গ্যালাক্সি দুটির গতিবেগ বার্তার গতিবেগের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করবে না। পৃথিবীতে বসে আমরা একটি গ্যালাক্সি থেকে একটি বার্তা পেতে পারি—"আইনস্টাইনের জন্মদিনে উষ্ণ অভিনন্দন, এই অভিনন্দন 'খ' গ্যালাক্সিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক" তারপর পৃথিবীর মানুষ একটি বার্তা পাঠাবে—"আইনস্টাইনের জন্মদিনে 'ক' গ্যালাক্সি অভিনন্দন জানাচ্ছে।" আমরা জানি যে বার্তাটি শেষ পর্যন্ত গন্তব্যস্থলে পেঁছুবে কেননা আমরা 'খ' গ্যালাক্সিকে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু যদি আমরা বা পৃথিবী এখানে না থাকতাম (ঘুমন্ত অবস্থায় বার্তাটি এসে পেঁছত) তাহলেও আমরা ভাবতে পারি ক গ্যালাক্সির বার্তা শূন্যে পৃথিবী যেখানে ছিল সেখান দিয়ে আমাদের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রবাহিত হয়ে 'খ' গ্যালাক্সিতে পেঁছুচ্ছে। সুতরাং গতিবেগ যোগ করে আমরা ভুল সমাধান পাই। 'ক' ও 'খ' গ্যালাক্সি যে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তা তাদের কাছে আলোর গতিবেগের চেয়ে কম বলে মনে হওয়া উচিত। এছাড়া কোন বার্তা পাঠানো সম্ভব না।

ওপরের কথাগুলির ব্যাখ্যা কি ? আমাদের খুঁজে বার করতে হবে 'ক' গ্যালাক্সি 'খ' গ্যালাক্সির সাপেক্ষে গতিবেগ কত হবে। যদি দেখা যায় যে এই গতিবেগ আলোর গতিবেগের চেয়ে বেশী তাহলে গ্যালাক্সি দুটো পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র বিহীন। প্রকৃত উত্তর পেতে আপেক্ষিকতাবাদ বিশারদরা দুটি গতিবেগের সরল যোগকে একটি সংখ্যা দিয়ে গুণ করেন (এই সংখ্যাটি কিন্তু গামা রাশি নয় তবে তার অনুরূপ) যা যারা গ্যালাক্সিতে বসে আছে তাদের কাছে সময়ের মন্থর হয়ে যাবার ব্যাপারটিকে বিচারের আওতায় আনে।

এই অবস্থাটি অনেকটা এই রকম যেন মহাকাশচারী ভাবছে সে দুটি তারার মধ্যে আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগে চলাচল করছে। উচ্চগতি সম্পন্ন 'ক' গ্যালাক্সিতে যারা বসে আছে তাদের কাছে বিশ্বের যে কোন দূরত্ব ছোট হয়ে যাচ্ছে দূরত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণার সাপেক্ষে। সুতরাং দূরবর্তী 'খ' গ্যালাক্সির গতিবেগও কম বলে মনে হবে। আলোর গতিবেগের পঁচাত্তর ভাগ গতিবেগ নিয়ে চলমান দুটি গ্যালাক্সির ক্ষেত্রে সংশোধনের গুণকটি হলো ০·৬৪। সহজ যোগফল ১৫০ কে এই সংখ্যাটি দিরে গুণ করলে 'ক' ও 'খ' গ্যালাক্সির পারস্পরিক গতি আলোর গতিবেগের ছিয়ানব্বই শতাংশ দাঁড়াবে।

লক্ষ্য করা চিত্তাকর্ষক হবে যে যদি আমাদের কাছে মনে হয় যে গ্যালাক্সি দুটো

আলোর গতিবেগের শতকরা একশোভাগ গতিবেগ নিয়ে পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তবে তাদের কাছে মনে হবে যে তারা পরস্পর আলোর গতিবেগে দূরে সরে যাচ্ছে, আলোর দ্বিগুণ গতিবেগ নিয়ে নয়। এই ঘটনাটি আলোর গতিবেগ সম্বন্ধে তৃতীয় রহস্যের মুখোমুখি করে দেয়।

কেন কোন কিছু আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চলতে পারে না? পদার্থবিদেরা সহজেই নানান জিনিষের কথা ভাবতে পারেন (যেমন তরঙ্গ) যা আলোর গতিবেগের চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চলে। কিন্তু তাঁদের এই বলে বোঝান হয় যে অর্থপূর্ণ কোন বার্তা বা শক্তি সরবরাহ আলোর চেয়ে দ্রুত গতিতে যেতে পারে না। কতকগুলি ব্যতিক্রম নিয়ে আলোচনা করলে নিয়মটি বোঝা যাবে। নভোচারী বা গ্যালাক্সিতে বসে থাকা কোন দর্শকের কাছে মনে হতে পারে যে তারা আলোর চেয়েও দ্রুতগতিতে চলেছে। এই সব দর্শকেরা যখন কোন দূরত্ব মাপে তখন তা ছোট হয়ে যায়। তার অর্থ হলো তাদের গতি আলোর চেয়ে কম।

কিছু কিছু বস্তু আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চলতে পারে যেমন আলো জলের বা অন্য কোন বস্তুর মধ্য দিয়ে কম গতিবেগ নিয়ে চলে। "সুইমিংপুল" কেন্দ্রীন রিয়াকটরের জলে নীলাভ আলো দেখা যায়। তড়িতাধানযুক্ত পারমাণবিক কণারা জলের মধ্যে দিয়ে আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগের চলার সময় আঘাত জনিত আলোক তরঙ্গ সৃষ্টি করে। আলোর ক্ষেত্রেই নীলাভ আলোকে শেরেনকভ বিকিরণ বলে। উচ্চশক্তি বিশিষ্ট কণাদের নিয়ে গবেষণা হয় যে সব গবেষণাগারে সেখানে সনাক্ত করনের কাজে যেসব যন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেখানে শেরেনকভ প্রক্রিয়াটি কাজে লাগানো হয়। আলো জলের মধ্যে যে গতিবেগ নিয়ে চলে কণারা তার চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চলে। কিন্তু শূন্যে আলোর গতিবেগের চেয়ে তাদের গতিবেগ অনেক কম।

দুদিক থেকে বোঝান যেতে পারে কেন সাধারণ ভাবে কোন কিছুই শূন্যে আলোর গতিবেগের চেয়ে জোরে চলতে পারে না। প্রথমটি হলো ভৌত ও গাণিতিক। আগের আলোচনাতে বলা হয়েছে যে আলোর গতিবেগের সীমাকে অতিক্রম করতে গেলে বা কোন বস্তুকে আলোর গতিবেগে ত্বরিত করতে গেলে গতিবেগ বৃদ্ধির চেয়ে শক্তি বৃদ্ধিই ঘটে বেশী। উত্তরোত্তর গতিবৃদ্ধি করা ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে পড়ে। আরও একটু গভীর ভাবে বললে আমরা বলতে পারি যে আলোর গতিবেগ সম্পন্ন কণাদের সাধারণ শক্তি আছে যা সাধারণ সময়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ হয়ে গেলে তাদের "শক্তি ঋণাত্মক" হয়ে যাবে। ঋণাত্মক শক্তি বলতে যে কি বোঝায় তা পরিষ্কার বোঝান মুস্কিল। শুধুমাত্র একথাই বলা যায় যে ঋণাত্মক শক্তির ধারণাটি সময়ের প্রচলিত ধারণার

সঙ্গে বিবাদের সৃষ্টি করে।

এখানে আরেকটি দার্শনিক কথা চলে আসে। যদি কোন কণা আলোর গতিবেগের চেয়ে জোরে চলে তাহলে স্পষ্টতই সময়ের বিপরীত দিকে যাবে। ব্যাপারটি বোঝার জন্য একটি ছবি কল্পনা করা যেতে পারে। ধরা যাক একটি বস্তু আলোর গতিবেগের চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে দর্শকের দিকে এগিয়ে আসছে। আপাতদৃষ্টিতে দর্শকের মনে হবে বস্তুটি তার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। যাত্রা শেষে বস্তুটিকে দর্শকের কাছে মনে হবে বস্তুটির আগমন বার্তা জানিয়ে অন্য প্রান্ত থেকে আলোর আসার আগেই।

এই ধরণের ঘটনা কম মান বিশিষ্ট শব্দের গতিবেগের ক্ষেত্রে যেমন সুপারসনিক বুলেট বা বিমানের বেলাতে জানা আছে। কিন্তু আলোর ক্ষেত্রে যেখানে গতি বিশ্বের চরম সময়ের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে যেখানে ফলাফলগুলি আরও প্রয়োজনীয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে যদি কেউ গুলিবিদ্ধ হয় তাহলে তাত্ত্বিকভাবে সে সময়ের বিপরীত দিকে একটি সংকেত পাঠাতে পারে যা লোকটিকে গুলি ছুঁড়তে বারণ করবে এবং গুলি বিদ্ধ হতে দেবে না অন্য কথায় বলতে গেলে কার্যকারণ সম্বন্ধে আমাদের সকল অভিজ্ঞতা বা সময়ের স্বাভাবিক গতি সম্বন্ধে সকল ধারণা সংকেতের সাহায্যে নস্যাৎ করে দেওয়া যায়—আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চলে। আইনস্টাইনের নিয়মের সাহায্যে বিশ্বকে সরল সংহত রাখা সম্ভব হচ্ছে।

আপেক্ষিকতাবাদের একটি সম্ভাব্য ত্রুটির কথা ভেবে বিজ্ঞানীরা আলোর ধাঁধার ওপরে এক ধরণের কণার কথা চিন্তা করলেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেইনবার্গ এই কণাদের নাম দিলেন ট্যাকিয়ন। ধারণা করা হল যে জন্মের শুরু থেকেই এই কণারা আলোর চেয়ে বেশী গতিবেগ নিয়ে চলে। আলোর বাধা এরা অতিক্রম করতে পারে না। ফলে গতিবেগ কমে গিয়ে পরিচিত স্বাভাবিক পারমাণবিক কণা হিসাবে প্রতীয়মান হতে পারে না। অংকের ভাষায় তাদের শক্তি ঋণাত্মক ও স্থিরভর কাল্পনিক হবে। যদি ট্যাকিয়ণদের তড়িতাধান থাকে তাহলে তারা শেরেণকভ রশ্মি নির্গত করবে এবং তার সাহায্যে তাদের সনাক্ত করা যাবে। এই পথে বিজ্ঞানী ট্যাকিয়ণের সন্ধান পেতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হননি।

অন্যদিকে যদি ট্যাকিয়ণের তড়িতাধান না থাকে তাহলেও তাদের অস্তিত্ব ধরা যেতে পারে। সাধারণ পারমাণবিক কণাদের সঙ্গে ট্যাকিয়ণের বিক্রিয়ার সময় সামগ্রিক শক্তির হেরফের থেকে তা সম্ভব। ট্যাকিয়ণ যেখানে পারমাণবিক কণাদের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে সেখানে বিক্রিয়ার পর শক্তির পরিমাণ বিক্রিয়ার আগে শক্তির মোট পরিমাণের চেয়ে বেশী হবে। এর কারণ হলো ট্যাকিয়ণের শক্তি

ঋণাত্মক। ট্যাকিয়ণের সন্ধানে বিজ্ঞানীরা বহু বিক্রিয়ার সন্ধান করেছেন কিন্তু ট্যাকিয়ণ তাঁদের কাছে ধরা দেয়নি।

ট্যাকিয়ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করাটা বর্তমান আলোচনার আসল উদ্দেশ্য না। যা দেখানো হলো তা হলো আইনস্টাইনের তত্ত্বকে কত পুংখানুপুংখ ভাবে বিচার করা হয়েছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আইনস্টাইনের তত্ত্বের সাহায্যে ট্যাকিয়ণের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যাচেছ তখন কিছু কিছু বিজ্ঞানী সন্তুষ্ট হন না। $E=mc^2$ ও আইনস্টাইনীয় মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের সাহায্যে আলোর সম্বন্ধে আইনস্টাইনের অনুমানকে ঘোরানো পথে যাচাই করা সম্ভব। আলোর গতি সংক্রান্ত ধারণাটি আইনস্টাইনের কাছে অনুমান কিন্তু আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তা ভিত্তিভূমি।

যেখানে সময় উড়ে চলে

১। স্থানকালে দুটি ঘটনার মধ্যে তফাৎ সকল দর্শকের কাছে এক হতে পারে না।
২। আলো যতদূর যায় তা সময় পরিমাপ করে।
৩। স্থানকালে একটি ওয়ার্ল্ড লাইন বস্তুর ইতিহাস রচনা করে।
৪। ত্বরণ এবং মাধ্যাকর্ষণ ওয়ার্ল্ড লাইনকে বক্র করে।
৫। স্থান শূন্যও নয় পূর্ণও নয়।

অস্পষ্টভাবে নির্দেশিত স্থান কালের মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টায় আইনস্টাইন বিশ্বকে টুকরো টুকরো করেন নি। তিনি আলাদা আলাদা ভাবে চরম স্থান চরম কালের ধারণাটি পরিত্যাগ করে তাদের বদলে একত্রে চরম স্থান-কালের ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিউটনের স্থান কাল হলো একটি দাবার ছকের মত যেখানে বস্তু ও শক্তির খেলা চলেছে। আইনস্টাইনের স্থান কাল এই খেলায় সক্রিয় অংশ নেয়। এমন কি বলা যেতে পারে যে শক্তি দ্বারাই স্থান কাল উৎপন্ন হচ্ছে। যাই হোক বিশ্বের সবকিছুর ভাগ্য ও ইতিহাসে অংশ নেয় আইনস্টাইনের স্থান কাল। আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের নানা অংশের মধ্যে আলোর গতিবেগ চরম, ভারী বস্তুর কাছে বক্র স্থানের চেহারাও চরম, কোন বস্তুর স্থিতি শক্তিও চরম। (absolute) পদার্থবিজ্ঞানের সকল নিয়মগুলিই চরম। এর অর্থ এই নয় যে ভবিষ্যতে নতুন গবেষণার নিয়মগুলি কোন দিন পালটাবে না। এখনও পর্যন্ত বিশ্বে সর্বত্র নিয়মগুলি এক।

একসঙ্গে স্থান ও কালকে চিন্তা করা কষ্টকর। আপেক্ষিকতাবাদ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা স্থান কাল সম্বন্ধে কি ভাবে ভাবেন সে সম্বন্ধে আলোকপাত করলে ভাল হয়। এর জন্য তাঁরা ইভেন্ট '(ঘটনা)' 'ওয়ারলড্ লাইন' বা 'লাইট কোণ' (আলোক শঙ্কু) প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেন। এদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা তাৎপর্য আছে। আইনস্টাইনের বিশ্বে স্থান কাল কিভাবে একে অপরকে প্রভাবিত করে তা বুঝতে উপরিউক্ত জিনিষগুলি খুবই সাহায্য করবে।

কোন একটি জায়গায় নির্দিষ্ট একটি সময়ে কোন কিছু সংঘটিত হলে তাকে আমরা 'ইভেণ্ট' বা 'ঘটনা' বলি। স্থানের জন্য তিনটি স্থানাঙ্ক ও সময়ের জন্য একটি রাশি একটি 'ইভেণ্ট' চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। যদি উদাহরণ হিসাবে

ধরা যায় একজন যাত্রী ৪৬°৫৫′ উত্তর দিকে অক্ষাংশ (প্রথম স্হানাঙ্ক), ৭°২৮′ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ (দ্বিতীয় স্হানাঙ্ক), ৩৩,০০০ ফিট উচ্চতায় (তৃতীয় স্হানাঙ্ক), ১৮ই মার্চ ১৯৭৯ সালের স্হানীয় সময় ৬.১৪ টার ২০ সেকেন্ড পরে (চতুর্থ মাত্রা সময়) একটি 'ইভেন্টের' সংজ্ঞা দিতে পারে। এ ধরণের একটি পরিকল্পনা নীতিগত ভাবে বিশ্বের সর্বত্র 'ইভেন্টের' সংজ্ঞা দিতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষ হলো ম্যাপ এবং ক্যালেন্ডার। মিঃ ব্রাউনের উড়োজাহাজের যাত্রীটি, ৪৩০ মাইল দূরে প্রথম ইভেন্টের ৫৮ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড পরে আরেকটি ঘটনা বা 'ইভেন্ট' ঘটলে তাদের মধ্যেকার তফাৎটা পরিমাপ করতে পারবে। এখানেই কিন্তু আপেক্ষিকতাবিদেরা খানিকটা দ্বর্থক। কার সাপেক্ষে গণনা—এই প্রশ্ন জাগে। রোম শহরে কখন একটি উড়োজাহাজ নামল তা বার্ণ শহরে সংকেত বার্তা পাওয়া গেলেই জানা যেতে পারে। আলোর গতিবেগে রোম থেকে বার্ণ শহরে সংকেত এসে পৌঁছুতে অন্ততঃ ০.০০২৩ সেকেন্ড সময় লাগবে।

আপেক্ষিকতাবিদেরা দুটি ঘটনার মধ্যে বিরতি বা 'ইন্টারভ্যাল' এমন ভাবে পরিমাপ করবেন যাতে স্থান কাল সংযুক্ত থাকে। সময়ের সংখ্যাকে স্হানের সংখ্যায় পরিবর্তিত করেই এটা করা হয়। যেমন একটি নির্দিষ্ট সময়ে আলো কতখানি দূরত্ব যাবে। এখানে সময়কে স্হানেরই অতিরিক্ত মাত্রা হিসাবে ভাবা হচ্ছে। এই ভাবে দেখলে বার্ণ থেকে রোমের দূরত্ব ৬৬০ মিলিয়ন মাইলের মত। এই দূরত্ব হলো আলো একঘন্টায় যতখানি দূরত্ব যায়। আপেক্ষিকতাবাদের কাছে বিরতির এই আপাত উদ্ভট পরিমাপ সবচেয়ে উদ্ভট। সময়কে অনেক সময় পরিচিত ত্রিমাত্রিক স্হানেরই বিস্তৃতি রূপ হিসাবে ভাবা হয়। ব্যাপারটি কিন্তু তা ঠিক নয়। গণিতের সুবিধার জন্য সময়কে অতিরিক্ত মাত্রা হিসাবে ভাবা হয়। স্হান ও কাল স্বতন্ত্র দুটি জিনিষ এবং আপেক্ষিকতাবাদের সকল সমীকরণে তাদের আলাদা জিনিষ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ সত্ত্বেও সময় ও স্হান পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এই বিক্রিয়ার ফল খুবই চমকপ্রদ এবং বিভ্রান্তিকর।

সময়কে সাংকেতিক ভাবে বর্ণনা করলে আপেক্ষিকতাবিদদের খুবই সুবিধা হয়। এর সাহায্যে ওয়ারলড লাইনের ধারণা করা যায়। চর্তুমাত্রিক স্হান কালে কোন বস্তুর যাত্রাপথই হলো ওয়ারলড লাইন। উদাহরণ স্বরূপ স্বয়ং আইনস্টাইনের ওয়ারলড লাইনটি আকা যেতে পারে। এর জন্য পৃথিবীকে চেপ্টা ভেবে সময়কে উল্লম্ব বারবর ধরতে পারি। আমরা পৃথিবীর গতিকে অবহেলা করছি। আইনস্টাইন যেসব শহরে বাস করেছিলেন তারা সচল নয় বলে তাদের স্হান কালে ওয়ারলর্ড লাইন হবে কতকগুলি সমান্তরাল রেললাইনের মত। একটি ট্রেনের মত আইনস্টাইন এক লাইন থেকে আরেক লাইনে বিচরণ করতেন। তিনি জার্মানিতে জন্মগ্রহণ

করেন, এক আলোক বর্ষ পরিমাণ সময় অতিবাহিত করার পর (একবছর) তাঁর পরিবার মিউনিখ-এর ওয়ারলড লাইনে চলে যান। শেষ পর্যন্ত প্রিন্সটনে যাওয়া ও ৭৬ বছর ৩৪ দিন জীবিত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আমাদের নিকটবর্তী তারা এ্যালডেবারাণ থেকে বেশী দূরত্ব পরিভ্রমণ করেছিলেন।

ওয়ারলড লাইনের এই হলো ধারণা। জীবনী রচনার জন্য নয় পদার্থবিদ্যায় ব্যবহারের জন্য আপেক্ষিকবিদেরা এই বিশ্বকে অনেকগুলি ওয়ারলড লাইনের সমষ্টি হিসাবে ভাবেন। ছোট বড় সব বস্তুরাই এই ওয়ারলড লাইনগুলি তৈরী করে। যদি দুটি কণার মধ্যে সংঘর্ষ হয়ে তারা প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে তাহলে তাদের ওয়ারলড লাইনগুলি প্রথমে প্রতিসারী হয়ে পরে পরস্পর থেকে দূরে সরে যাবে।

আলোর কণাদের ওয়ারলড লাইনগুলি একটু ভিন্ন। এই ভিন্নতা অনুমান-যোগ্য কেননা ওয়ারলড লাইনের কাঠামোটি তৈরী হয়েছে আলোর গতিবেগের ওপর নির্ভর করে। আমরা যদি ত্রিমাত্রিক স্থানকে দ্বিমাত্রিক স্থানে পরিণত করি এবং সময়কে তৃতীয় মাত্রা হিসাবে চিহ্নিত করি তাহলে আলো সমতলের সঙ্গে, ৪৫° ডিগ্রি করে চলবে। এই পরিকল্পনায় কোন একটি বিন্দুতে শূন্য থেকে যে কোন দিক থেকে আগত সকল আলোকরশ্মি একটি শঙ্কু (cone) তৈরী করবে। অনুরূপ ভাবে একটি বিন্দু থেকে অভিসারী সকল রশ্মিগুলিও একটি শঙ্কু (cone) তৈরী করবে।

স্থান কাল যদি শঙ্কুর মধ্যে না থাকে তবে কোন তথ্যই মানুষের কাছে এসে পেঁছুতে পারে না। আমরা জানতে পারব না বেটেল জিউস্ আজ বাড়ছে কি না। এর কারণ হলো 'আজ' আলোক শঙ্কুর বাইরে ৬০০ আলোকবর্ষ দূরে আছে। ছয় শতাব্দি পরে যখন বর্তমান অধিবাসীদের উত্তর পুরুষেরা সময়ের সাপেক্ষে এগিয়ে যাবে তখনই তারা জানতে পারবে ৬০০ বছর পূর্বে বেটেলজিউন বেড়ে উঠেছিল কি না। বেটেল জিউসের আলোক শঙ্কুতে পৃথিবীকে ৬০০ বছর আগের পৃথিবী মনে হবে যে সময় মঙ্গলীয়রা আধিপত্য বিস্তার করে ছিল।

আরেকটি আলোক শঙ্কু যা সামনের দিকে খুলছে তা মানুষের সম্ভাব্য ভবিষ্যতের নির্দেশক। মানুষ আগামীকাল বেটেলজিউসে যেতে পারে না। তার প্রতি কোন সংকেত পাঠালে তা ৬০০ বছর পরে পেঁছুবে কেননা এই সময়ে বেটেল জিউয়েসের ওয়ারলর্ড লাইন ভবিষ্যতের আলোক শঙ্কুকে খণ্ডিত করবে।

যদি কেউ আলোর গতিবেগের এক দশমাংশ গতিবেশ নিয়ে তারাটির দিকে রওনা হয় তাহলে সে এমন একটি ওয়ারলর্ড লাইন অনুসরণ করবে যা আলোক শঙ্কুর অনেক ভেতরে থাকবে। এবং সময় অক্ষের সঙ্গে ৬ ডিগ্রি কোন করবে বেটেলজিউসে

যেতে সময় লাগবে ৬০০০ বছর যদি শঙ্কুর সময় অক্ষ পৃথিবীর ওয়ারলর্ড লাইন নির্দেশ করে তাহলে মানুষ স্থান কালে বাঁকা রাস্তায় চলবে। পৃথিবীর সাপেক্ষে ৪৫° (ডিগ্রিতে) চলমান আলোর গতিপথের মত হবে। আলোর গতিবেগে সময় স্থির হয়ে যাবে। মানুষের গতিবেগ যত বেশী হবে তত সে ৪৫° (ডিগ্রির) মধ্যে আসবে এবং তার ঘড়ি পৃথিবীর ঘড়ি সাপেক্ষে ধীর বা মন্থর হয়ে যাবে।

ত্বরণ মাধ্যাকর্ষণের সমতুল। মাধ্যাকর্ষণকে অনুকরণ করার আরেকটি রাস্তা হলো ঘূর্ণন। ঘূর্ণন মাধ্যাকর্ষণেরই একটি বিশেষ রূপ। গতিবেগ একই থাকলেও ঘূর্ণায়মান কোন বস্তু কেন্দ্রের অভিমুখে একটি ত্বরণ অনুভব করে। নভোচারীরা যাতে মাধ্যাকর্ষণ জনিত বল সহ্য করতে পারে সেজন্য তাদের সেণ্ট্রিফিউজে ঘোরানো হয়। সেণ্ট্রিফিউজ হলো নাগরদোলার মত জিনিষ যা প্রচণ্ড জোরে ঘুরছে। অপকেন্দ্র বল ও তীব্র মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে যাত্রী কোন তফাৎ করতে পারে না শূন্যে কোন আবাস স্থল স্থাপন করতে হলে তাকে উপযুক্ত ভাবে ঘোরাতে হবে যাতে g ত্বরণ সৃষ্টি হয়। তখন ভার শূন্য না হয়ে বস্তুরা স্বাভাবিক প্রতীয়মান হবে। যে ব্যক্তি সেণ্ট্রিফিউজে বসে আছে সে ভরশূন্য না হয়ে স্বাভাবিক হবে। স্থান কালের চিত্রে সেণ্ট্রিফিউজে থাকা কোন ব্যক্তির ওয়ারলর্ড লাইন আঁকা বাঁকা হবে (helical) ওয়ারলর্ড লাইনের দিক সব সময় পরিবর্তিত হচ্ছে বলে সে নিয়ত একটি মাধ্যাকর্ষণ অনুভব করবে।

মাধ্যাকর্ষণের বেলাতে কোন ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে গেলে আলোর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। মাধ্যাকর্ষণ লাইট কোণকে পৃথিবীর বা সূর্যের মত ভারী বস্তুর দিকে হেলিয়ে দেয়। 'আলোক শঙ্কু' হেলে গেলে সময় ও ধীরগতি হয়ে যায়। কারুর ওয়ারলর্ড লাইন ও আলোর মধ্যে কোণ (angle), উচ্চগতিতে শুধু নয়, আলোর ওপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবেও কমে যায়।

আপেক্ষিকতা তত্ত্বে এর মধ্যে ত্বরণকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। কানের মধ্যে যে অভিকর্ষ স্নায়ু আছে তা মোটর, সেণ্ট্রিফিউজ বা অভিকর্ষ ত্বরণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। শূন্যে সরল রেখায় সুসম গতিকে কখনও কখনও বোঝা বা সনাক্ত করা যাবে না। কিন্তু কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী শূন্যস্থান আসলে শূন্য নয়। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের পরে আমাদের সেই ভৌতিক আলোক কণা বা বস্তুকণাদের কথা ধরতে হবে যারা নিচ্ছিদ্র শূন্যতাকে ভরে রাখে। এদের অস্তিত্ব ধরে নিলে সহজে প্রতীয়মান হয় কেননা শূন্যস্থানে এক ধরণের সুসম গতিকে সনাক্ত করা যাবে না।

প্রথম নজরে কেউ ভাবতে পারে যে শূন্যে অর্ন্তজগত তার গতিবেগের ওপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন দেখাবে। সর্বোপরি সুসম গতিতে চলমান নভোচারীর

সাপেক্ষে ভৌতিক কণাদের অতিরিক্ত শক্তি থাকবে। তাহলে নভোচারী কি বলতে পারেন না যে সে নিজে স্থির আছে আর সব কিছু পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে? সে যদি সঠিক হয় তাহলে আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বটি বিনষ্ট হয়ে যাবে।

সামনের আলো পেছনের আলোর চেয়ে বেশী শক্তি সম্পন্ন। নভোচারী যখন ছুটে চলেছে তখন সূর্য থেকে বেরিয়ে আসা আলোর ক্ষেত্রে এমনই হয়। এর ফলে নভোযানে পেছনের চেয়ে সামনের দিকে বেশী চাপ পড়বে যার ফলে নভোযানটি মন্থর হতে চাইবে। গতিশীল বস্তুরা তখন গতিশীল থাকবে না, শূন্যে আস্তে আস্তে থেমে যাবে।

নিউটন ও আইনস্টাইনের তত্ত্বকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা একটি প্রশ্ন করতে পারি। তাহলে কি এমন ভৌতিক আলোক কণা আছে যা সব সময় এক থাকবে এবং দর্শক কি গতিবেগে তার দিকে এগুচ্ছে তার ওপর নির্ভর করবে না? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে 'হ্যাঁ'। আলোর কম্পনাংক দ্বিগুণ হলে আলোর কণার সংখ্যা আটগুণ হতে হবে। দেখা যায় যে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব কণার সংখ্যা সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করে আপেক্ষিকতাবাদকে বাঁচতে সেই সংখ্যাই প্রয়োজন।

সরলবিশ্ব

১। গ্যালাক্সিরা একে অপরের কাছ থেকে ছুটে চলেছে যেন বিস্ফোরণ ঘটেছে।

২। এক ধরণের বেতার শক্তি সমস্ত বিশ্বকে ঘিরে আছে।

৩। সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী সরল বিশ্ব বিস্ফোরণের পর সঙ্কুচিত হয়ে আসে।

৪। সরল বিশ্বের আকার ও স্থায়িত্ব এর শক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট।

৫। আইনস্টাইন 'বিগ ব্যাং' ভবিষ্যতবাণী করতে পারতেন কিন্তু করেন নি।

মহাজাগতিক ব্যাপারে আমরা সব সময় বিরাট কোন কিছুকে জটিল বলে ভাবি—একটি শহর গ্রামের থেকে, সাগর নদীর থেকে বেশী জটিল। কিন্তু বিশ্বের ব্যাপারে ঠিক বিপরীত ব্যাপারটি মনে হয়। বড় কিছু সব সময় সরল। খুব ছোট প্রাণীদের গঠন খুবই জটিল। গ্রহ, নক্ষত্র এরাও কম জটিল নয়।

ছায়াপথ বা গ্যালাক্সিদের কতকগুলি বিভ্রান্তি কর বৈশিষ্ট্য আছে। উদাহরণ হিসাবে ধরা যেতে পারে আমরা যে ছায়াপথে বাস করি তার কথা। এর একটি আশ্চর্যজনক পেঁচানো হাত আছে। M ৮৭ ছায়াপথের একটি বিশুদ্ধ কেন্দ্রীন আছে। তবে যে সব তারাদের নিয়ে এই ছায়াপথগুলি তৈরী তাদের তুলনায় ছায়াপথটি বেশী জটিল নয়। আশ্চর্যজনকভাবে এর বিশ্ব খুবই সরল। বিশ্বের অন্যতম সদস্য পৃথিবীর চেয়ে সে কখনই বেশী জটিল নয়।

বিশ্ব সম্বন্ধে লব্ধ জ্ঞানকে মোটামুটি কয়েকটি বাক্যে প্রকাশ করা যায়। (১) এই বিশ্ব লক্ষ লক্ষ গ্যালাক্সির সমন্বয়ে তৈরী এবং যারা বিস্ফোরণের পর পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। (২) আলোকোজ্জ্বল গ্যালাক্সি ছাড়াও এই বিশ্বে আরও বিকিরণ বর্তমান। এই সব বিকিরণ হলো সেই বিস্ফোরণের অবশিষ্টাংশে যে বিস্ফোরণের ফলে বর্তমান বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। (৩) যে কোনদিক থেকে গ্যালাক্সি ও বিকিরণ একই রকম প্রতিভাত হয় যা প্রমাণ করে বিশ্ব ঘূর্ণায়মান নয়।

বিশ্বের মধ্যে এই সরলতা তা কিন্তু অজ্ঞানতাজনিত কোন বিভ্রান্তি নয়। বরং নভোচারী পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে বিশ্বের মধ্যে যতই জটিলতা বা বিশৃঙখলার সন্ধান করছেন ততই তারা দেখেছেন আসলে সেখানে এক বিরাট সরলতা বিরাজ

করছে। অবশ্য বিশ্ব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নেরই উত্তর মেলেনি। এইসব প্রশ্নের কিছু কিছু জটিল, আবার কিছু প্রশ্ন আকর্ষণীয়। এইসব প্রশ্নের উত্তর নভোচারীদের হাতে। সকল প্রশ্নের মধ্যে যা সবচেয়ে গভীর তা হলো : কেন এই বিশ্ব এত সুসংহত।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সাহায্যে বিশ্বকে মোটামুটি ভাবে বোঝা যায়। তিনি যে শুধু $E=mc^2$ সমীকরণ বা উচ্চগতিতে বস্তুর ব্যবহারের নিয়মগুলি আবিষ্কার করেছিলেন তা নয়, তাঁর পাওয়া সমীকরণগুলির মধ্যে বিশ্বের সৃষ্টি ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে তথ্য নিহিত আছে। এ ব্যাপারে আলোচনা করার আগে আমরা প্রথমে দেখব কেমন করে বিশ্বের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নভোচারীদের কাছে ধরা পড়েছে।

বিশ্বের গঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্যই বিংশ শতাব্দিতে পাওয়া গেছে। গ্যালাক্সি, বেতার গ্যালাক্সি, কোয়াসার, পালসার, এক্স-রে নক্ষত্র প্রভৃতি অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সবের মধ্যে দুটি আবিষ্কার আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যাকে প্রভাবিত করেছে। একটি আবিষ্কার ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছে আরেকটি বিনামেঘে বজ্রপাতের মত এসেছে।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এডউইন হুবল মাউণ্ট উইলসনে ১০০ ইঞ্চি টেলিস্কোপের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বসে থাকতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি গ্যালাক্সিদের দূরত্ব বার করার পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন এবং ডপলার ক্রিয়ার সাহায্যে তাদের গতিবেগ নির্ধারণ করতে সমর্থ হলেন। দূরবর্তী গ্যালাক্সি থেকে বেরিয়ে আসা আলোর কম্পনাংক কমে যেত (অর্থাৎ লালের দিকে সরে যেত)। এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যেত যে আমাদের ছায়াপথ থেকে অন্যান্য গ্যালাক্সিরা উচ্চগতিতে দূরে সরে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটি খুবই চমকপ্রদ কেন না এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে সাধারণ ভাবে বিশ্ব ক্রমশ বড় হচ্ছে। হুবল দূরত্ব ও গতিবেগের মধ্যে যে সম্পর্ক বার করলেন তা আরও চমৎকার। হুবলের নিয়ম অনুযায়ী গ্যালাক্সিদের গতিবেগ তাদের দূরত্বের সঙ্গে সমানুপাতিক। দূরত্ব যদি দ্বিগুণ হয়ে যায় গতিবেগও দ্বিগুণ হয়ে যাবে। ১৯২৯ সালের মধ্যেই হুবল তাঁর সূত্র প্রতিষ্ঠা করলেন ও ছয় মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরত্ব পর্যন্ত নিয়মটিকে যাচাই করলেন।

হুবলের নিয়মটির তাৎপর্য কিন্তু চমকপ্রদ। কোন সময়ে গ্যালাক্সিরা যদি এক জায়গা থেকে যাত্রা শুরু করে থাকে তবে হুবলের নিয়মটি একেবারে সঠিক। অন্য ভাষায় আমরা যদি গ্যালাক্সিদের গতির পশ্চাদপসারণ করি তাহলে দেখা যাবে একসময় গ্যালাক্সিরা সবাই এক জায়গায় জড় হয়েছিল। তখন সমস্ত বিশ্বের

চেহারা বর্তমানে বিশ্বের চেয়ে অন্যরকম ছিল। হ্বলের এই আবিষ্কার সরল এবং স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত হলো 'বিগ ব্যাং' তত্ত্ব।

এই তত্ত্বে একটা বিচ্যুতি ছিল। শুরু থেকে বিশ্বের বয়স কত হবে তা নির্ধারণ করেছিলেন হ্বল। একেই আমরা হ্বল সময় (Hubble·Time) বলি। তাঁর মতে এর মান হলো দুই বিলিয়ন বছর। যদি ধরি যে মাধ্যাকর্ষণ গ্যালাক্সিদের মন্হর করেছিল তাহলে বিশ্বের বয়স আরও কম হওয়া উচিত। কিন্তু এমন সব নজীর আছে যাতে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর বয়স কয়েক বিলিয়ন বছর, কয়েকটি তারার বয়স তার চেয়ে বেশী। পৃথিবী বিশ্বের চেয়ে কিভাবে বয়সে বড় হতে পারে?

এই কারণে বিগ ব্যাং তত্ত্বটিকে খানিকটা সন্দেহের চোখে দেখা হত। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটল ১৯50 সালে তখন হ্বলের ছাত্রেরা তাঁর দূরত্ব পরিমাপে একটি ত্রুটি বার করলেন। হ্বল সময়ের পরিবর্তন ঘটল। এখন হ্বল সময় বলতে ১৫-২০ বিলিয়ন বছর বোঝায়। এটা হ্বলের প্রাথমিক অনুমানের দশ গুণ। এই হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের বয়স ১০-১৫ বিলিয়ন বছর। এখন আর পৃথিবী বা তারাদের বয়স নিয়ে কোন বৈপরীত্য রইল না।

বিগ ব্যাং তত্ত্বের সরাসরি প্রমাণ মিললো ১৯৬৫ সালে। আইনস্টাইনের মৃত্যুর দশবছর পরে। বেতার গ্যালাক্সি বা কোয়াসার ছাড়াও বিশ্বের এক ধরণের বেতার শক্তি পাওয়া গেল। অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা এর উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত প্রিন্সটন ইউনিভারসিটির বিজ্ঞানীরা দেখলেন বিগ ব্যাং তত্ত্বের মধ্যেই এই অতিরিক্ত বেতার শক্তির উৎস নিহিত আছে। বিশ্ব যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় আলো ছিল সূর্যালোকের মত সাদা। পরে বিশ্বের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সাদা আলো ক্রমশঃ লালের দিকে সরে যেতে লাগল। শুরু থেকে বিশ্ব যত বড় হয়েছে ততই আলোর কম্পনাংক কমেছে। এ ধরণের বিকিরণের নাম দেওয়া হয়েছে '3k' বিকিরণ। এই বিকিরণের পরিমাণ পর্যাপ্ত। দীর্ঘদিন পরীক্ষা চালিয়েও কোন দিকেই এই বিকিরণের কোন তারতম্য লক্ষিত হয়নি। এতে সমস্ত বিশ্বের একটা সুসম চেহারাই ফুটে ওঠে। বিকিরণের সুসম চেহারা বিশ্ব ঘুরছে এরকম একটা ধারণা বাতিল করে দেয়। আরও প্রমাণিত হয় যে আমাদের ছায়াপথ সাধারণ ভাবেও সুসংহত অংশ গ্রহণ করছে। আমাদের ছায়াপথে কোন অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য থাকলে তা 3k বিকিরণের তারতম্যের মধ্যে ধরা পড়ত। ছড়িয়ে থাকা 3k বিকিরণের সাহায্যে আমরা বিশ্বের মধ্যে যে সুসম গতি আছে তা অনুধাবন করতে পারি। অবশ্য এতে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূলসূত্রটি কিছু পরিমাণে বিঘ্নিত হচ্ছে।

বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়কর সামঞ্জস্য তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীদের কতকগুলি সুবিধা করে দিয়েছে। 'বিগ ব্যাং'-এর সময় সম্ভাব্য ঘটনাগুলি সম্বন্ধে তাঁরা একমত হতে পারেন এবং বিশ্বাস যোগ্য ভাবে তাদের বর্ণনা করতে পারেন। এইসব ব্যাখ্যা থেকে মনে হয় সৃষ্টির উষালগ্নে ক্রমবর্ধমান বিকিরণ, বস্তু ও প্রতীপ (Anti) বস্তু পূর্ণ ছিল। প্রথম কয়েকটি সেকেন্ড বস্তু ও প্রতীপ বস্তু নিজেদের ধ্বংস করেছিল। সামান্য অবশিষ্ট বাকী পড়েছিল। এরপর বিশ্ব ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে লাগল। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মত, বিশ্ব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তৈরী হতে লাগল। পরমাণু তৈরী হবার সময় আলোর ঝলকানি দেখা গেল। এই আলোকই হলো 3k বিকিরণের সম্ভাব্য উৎপত্তি।

পরিষ্কার ভাবে জানা এমন সব প্রক্রিয়ার সাহাযো পরমাণু সংযুক্ত হয়ে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র সৃষ্টি করল। বিশ্ব ক্রমশই বড় হতে লাগল। গ্যালাক্সিরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। সংক্ষেপে বললে সৃষ্টির শুরু হতে খুব সংহত শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং পরে তা ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যেসব আবিষ্কার এই সব ছবি পরিস্ফুট করে তারা সবাই ছিল চমকপ্রদ। আরও চমকপ্রদ হলো যে এসব আবিষ্কারের ব্যাখ্যা খুঁজতে তাত্ত্বিকদের খুব বেশী দূরে যেতে হয়নি। আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মধ্যে এসব কাহিনী নিহিত ছিল। আপেক্ষিক মহাকাশ তত্ত্বে বিশ্বের শক্তিই স্থান কাল সৃষ্টি করে।

পদার্থবিজ্ঞান বিদ্ বা জ্যোতির্বিদেরা সব সময় বিশ্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে খোঁজার চেষ্টা করেন। তাঁরা পরমাণু, নক্ষত্র, গ্যালাক্সির উৎপত্তি বা পরিণতি নিয়ে চিন্তা করেন কিন্তু সূর্য বা পৃথিবীর উৎপত্তি নিয়ে মাথা ঘামান না। আইনস্টাইন কিন্তু তাঁর ভূমিকা নৈপুণ্যের সঙ্গে পালন করেছিলেন। ১৯১৭ সালে অঙ্ক করে এক চমকপ্রদ নৈসর্গিক কাহিনীর সন্ধান তখন তাঁর কাছে এতই বিপ্লবাত্মক মনে হয়েছিল যে প্রথমটা নিজের তত্ত্বকেই বিশ্বাস করতে পারেন নি।

খুব বেশী বিবরণের মধ্যে না গিয়ে বলা যায় আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব একটি বিস্ময়কর সম্ভাবনার মুখোমুখি করে দিল। দেখা গেল বিশ্বের সর্বোচ্চ ব্যাস মোট শক্তির ওপর নির্ভর করবে আর কিছুর ওপরে নয়। তাঁর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী অস্থির বিশ্বের ধারণাকে কিছুতেই পরিহার করা যায় না। সমস্ত বিশ্বকে নিরন্তর বাড়তে হবে কিংবা সংকুচিত হতে হবে। বিশ্বের সব অংশগুলি যদি স্থির থাকত তাহলে মাধ্যাকর্ষণ তাদেরকে পরস্পরের কাছে টেনে আনত।

আইনস্টাইনের সরল সমীকরণগুলি সরল বিশ্বের কথা বলে। ছোট থেকে শুরু হয়ে বিশ্ব ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। এরপর বিশ্বের বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ব্যাসে না পৌঁছোনো পর্যন্ত ক্রমশঃ কমতে থাকে। তারপরে বিশ্ব আরো বড় না হয়ে

সংকুচিত হতে থাকবে। সংকুচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার হলো যে কেবলমাত্র বিশ্বের সর্বোচ্চ ব্যাস নয় সমস্ত ঘটনার সামগ্রিক সময়ও মোট শক্তির ওপর নির্ভর করে। ধরা যাক একটি সরল বিশ্বের সূর্যের স্থিতিভর পরিমাণ শক্তি আছে। আইনস্টাইনের সমীকরণগুলি বলে যে বিশ্ব এক মাইলের মত বড় হয়ে একই সময় ধরে সংকুচিত হয়ে যাবে। বিশ্বের অস্তিত্বের যে সময়কাল তার ছয় ভাগের এক ভাগ আমরা কাটিয়েছি, বিশ্ব এখনও বেড়ে চলেছে। ১৯১৭ সালে আইনস্টাইনের হাতে এসব তথ্য ছিল না ঠিকই কিন্তু এসবই তাঁর তত্ত্বে নিহিত ছিল। আইনস্টাইন যদি একটু সচেতন হতেন তাহলে হাবলের আগেই গ্যালাক্সির সঙ্কোচনের কথা, বিগ ব্যাং তত্ত্ব উপস্থাপিত করতে পারতেন। ১৯১৯ সালের আগে বিশ্বকে সবাই স্থির ভাবে ভাবত। এমনকি স্বয়ং আইনস্টাইন তাঁর গবেষণার ফলাফলে এতই বিস্মিত হয়েছিল যে নাটকীয় ফলাফল যাতে না আসে তার জন্য ইচ্ছাকরেই তাঁর তত্ত্ব পালটাবার কথা ভেবে ছিলেন।

কালোত্তীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী

১। ধর্ম ও রাজনীতির ব্যাপারে আইনস্টাইন মধ্য পন্থা অবলম্বন করতেন।
২। প্রকৃতিতে অবিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী ছিলেন আইনস্টাইন।
৩। পরমাণু বিজ্ঞান প্রকৃতিতে বিচ্ছিন্নতা দাবী করে।
৪। আইনস্টাইন অনিশ্চয়তা সূত্র মেনে নিতে পারেননি।

কোন একটি বিশেষ ধর্মে ব্যাপৃত না হলেও আইনস্টাইনের মনে সব সময় একটা ধর্মীয় ভাব বিরাজ করত। ভগবান সম্বন্ধে তাঁর উক্তি থেকে বোঝা যায় যে প্রকৃতির সম্বন্ধে তাঁর কি বিরাট শ্রদ্ধাই না ছিল। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বললেন—"আমি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না যিনি মানুষের ভাগ্য নির্ণয় করেন, আমি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি যিনি প্রকৃতির মধ্যে ঐকতানের-সৃষ্টি করেন।" এ ধরণের ধর্মচেতনা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে অসুবিধায় ফেলেছিল।

শুরুতে আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রচুর আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছিল। নাজী বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের চিন্তাকে প্রাচীন চিন্তার সঙ্গে কিছু অসংলগ্ন সংযোজন বলে আখ্যা দিলেন। জুরোও আইনস্টাইনকে আক্রমণ করলেন। আমেরিকার যাজকেরা বললেন যে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ ভগবানও তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে মানুষকে সন্দিহান করে তুলবে। জু সংবাদ পত্রে বলা হলো আইনস্টাইনের তত্ত্ব ঈশ্বর-নিন্দা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্ট্যালিনের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত রাশিয়াও তাঁর তত্ত্ব পুরোপুরি গ্রহণ করে নি।

আইনস্টাইনের তত্ত্বের সমালোচনা একটা জিনিষই প্রতিপন্ন করে যে ধর্মীয় চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্যে দ্বন্দের অবসান আজও ঘটেনি। ফ্যাশিষ্ট ইউরোপ থেকে না চলে গেলে হয়ত তাঁকে মনোরোগীদের হাসপাতালে জীবন কাটাতে হত। কেন্দ্রীন শক্তি কাজে লাগানোর ব্যাপারে তাঁর বাধ্যতামূলক অংশ নেওয়াটা তাঁর কাছে খুবই বেদনাদায়ক হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুবক আইনস্টাইন বার্লিনে ছিলেন। এই সময় সাহসের পরিচয় দিয়ে তিনি যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাবে সাক্ষর করেছিলেন। যখন ইউরোপের বেশীর ভাগ যুবকেরা একে অপরের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে আছে তখন যুবক আইনস্টাইন নিবিষ্ট সাধনায় মগ্ন। তাঁর মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত গবেষণার এটাই হলো সর্বোচ্চ বিন্দু।

১৯৩৯ সালে আইনস্টাইন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান আর এই সময়ই বার্লিনে ইউরেনিয়ামের ফিসন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। সমস্ত কেন্দ্রীন বিজ্ঞানীদের ইউরেনিয়াম বোমার কথা মনে আসতে বেশী সময় লাগেনি। হিটলারের হাতে যদি এই অস্ত্র প্রথমে যায় তবে তার মারাত্মক পরিণতির কথা ভেবে তারা শঙ্কিত হলেন। এই কারণে পারমাণবিক বোমা তৈরীর যৌক্তিকতা আর সব রাষ্ট্রকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টকে এ ব্যাপারে সচেতন করার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল আইনস্টাইনের ওপর। ১৯৩৯ সালে তিনি প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টকে পারমাণবিক বোমার শক্তি সম্বন্ধে জানিয়ে চিঠি লিখলেন। জার্মানরা কিভাবে এ ব্যাপারে উৎসাহ নিচ্ছে সে কথাও জানালেন। রুসভেল্ট এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আইনস্টাইন আমেরিকার নৌবাহিনীতে সমরাস্ত্র সম্পর্কিত গবেষণার উপদেষ্টা নিযুক্ত হলেন। তবে এতখানি যোগাযোগ থাকলেও মনের দিক থেকে তিনি পুরোপুরি সামরিক ভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন নি।

১৯৪৫ সালে প্রেসিডেণ্ট মারা যাবার মাত্র তিন সপ্তাহ আগে আইনস্টাইন তাঁকে আরেকটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি দাবী জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীন শক্তি চালিত অস্ত্রের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু হোক্। কিন্তু এই চিঠির কোন উত্তর আসেনি। ১৯৫০ সালে তাঁর জীবদ্দশাতে আইনস্টাইন হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের কথা জানতে পারেন। যে মানুষটি সারা জীবন মানুষের মনকে উদ্দীপিত করেছেন পরমাণু বোমার ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা দেখে তাঁর জীবন শেষ হলো। ১৯৫৫ সালে আইনস্টাইন বার্ট্রাণ্ড রাসেল রচিত একটি আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেন। আবেদনের শেষ কটি লাইন হলো—

'We appeal, as human beings, to human beings : remember your humanity and forget the rest. If you can do so the way lies open to new paradise ; if you cannot there lies before you the risk of universal death.'

বিংশ শতাব্দির এই টালমাটাল অবস্থার মধ্যে আইনস্টাইন নীতি নিষ্ঠতার মূর্ত প্রতীক। প্রতিভাবানের যদি বিচার করা যায় তবে দেখা যাবে সাধারণ মানুষের যেসব গুণ থাকে আইনস্টাইনের সেইসব গুণগুলি ছিল। তিনি একটি শিশুর যা কৌতূহল সেই কৌতূহল নিয়েই প্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ অবলোকন করতেন। প্রকৃতিকে তাড়াতাড়ি বোঝার মত সহজাত ক্ষমতা ছিল তাঁর। স্বল্পবাক্ এই মানুষটি তাঁর অকল্পনীয় দৃষ্টি শক্তি দিয়ে চিন্তা করতেন। তাঁর তত্ত্বে তিনি যে গণিতের ব্যবহার করেছিলেন তা যে কোন পদার্থবিদের পক্ষে খুব সোজা নয় আবার খুব কঠিনও

নয়। গাণিতিক বাঁধা তিনি পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন আত্মমগ্ন মানুষ। অপরের সান্নিধ্যের চেয়ে নিজে নিজে চিন্তা করেই তিনি আনন্দ পেতেন। তাঁর চরিত্রে এক ধরণের একগুঁয়েমি ছিল। অন্যরা যে সমস্যা দেখে পিছিয়ে আসতেন আইনস্টাইন তার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়তেন আগে। সকল কৃতী বিজ্ঞানীদের মধ্যে হয়ত এধরণের গুণাবলী কিছু না কিছু থাকে। আইনস্টাইনের মধ্যে কিন্তু এইসব গুণগুলি মিশে এক অবিশ্বাস্য কার্যকারিতা লাভ করেছিল।

এ্যারিস্টটলের ভাষায় কৌতূহল যে কোন দর্শনের শুরু। বিখ্যাত বিজ্ঞানের ইতিহাস রচয়িতা হলটনের ভাষায় বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের কল্পনাশক্তি জীবনের শুরুতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। মাত্র চার বছর বয়সে আইনস্টাইন চুম্বক নিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। তখন থেকেই তিনি ক্ষেত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হন। মাধ্যাকর্ষণ ও চুম্বকক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য হলো উৎস থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই তার প্রভাব কমতে থাকে। প্রকৃতিতে নিরবচ্ছিন্নতার প্রতি অগাধ বিশ্বাস আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টি করতে তাঁকে প্রভুত সাহায্য করেছিল। পরমাণুদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতি অবিচ্ছন্ন নয়—এই কথাটির সঙ্গে তার মানসিক বিরোধ ছিল। বিংশ শতাব্দির পদার্থবিজ্ঞানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক অর্থাৎ কোয়াণ্টাম পরমাণু তত্ত্ব তার সমর্থন আদায় করতে পারে নি।

প্রথম দিকে আইনস্টাইন কোয়াণ্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন কিন্তু কোয়াণ্টাম বলবিদ্যাকে তিনি কখনই গ্রহণ করতে পারেননি। অনিশ্চয়তা সূত্র সম্বন্ধেও তিনি দ্বিধাহীন ছিলেন না। প্রচ্ছন্ন ধর্ম চেতনা তাঁকে প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্নতার বিশ্বাসী করে তুলেছিল। "ঈশ্বর কখনও পাশা খেলে না" —তাঁর এই ছিল বিশ্বাস। পরমাণু বিজ্ঞানী বোরের এতটা বিশ্বাস ছিল না। তাঁর বিশ্বাস ছিল ভগবান মাঝে মাঝে পাশা খেলেন। পরমাণু বিজ্ঞানীরা আইনস্টাইনের দিকে কিছুটা মুখ ফিরিয়েই ছিলেন। প্রতীপ বস্তুর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীন বিজ্ঞানে, পরমাণু বিজ্ঞানে কোয়াণ্টাম বলবিদ্যার সাফল্য আপেক্ষিকতার ঔজ্জ্বল্যকেও অনেক সময় ম্লান করে দেয়। কোয়াণ্টাম মতবাদ সম্পর্কে অনীহা আইনস্টাইনের কাজকে খানিকটা অনুর্বর করে তুলেছে। জীবনের শেষ তিরিশ বছর তিনি মাধ্যাকর্ষণ ও তাঁড়িৎ বিদ্যাকে একাত্মকরণের চেষ্টায় মগ্ন ছিলেন। কিন্তু তড়িৎ সংক্রান্ত সকল তথ্যকে কোয়াণ্টাম তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। হয়ত আইনস্টাইনের চেষ্টা সময়োচিত ছিল না। তাঁর মৃত্যুর কুড়ি বছর পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণ ও কোয়াণ্টাম মতবাদের মধ্যেকার মিলন সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে তখন আইনস্টাইন হয়ত কিছু করতে পারতেন কিন্তু প্রৌঢ় আইনস্টাইনের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। নতুন নতুন বিজ্ঞানীদের

অনুসন্ধিৎসু, জিজ্ঞাসা, সন্দেহই মিলিত হয়ে একটি তত্ত্বকে জীবিত রাখে। আইনস্টাইনের মধ্যে অন্তত জিজ্ঞাসার প্রবাহ ছিল। তিনি তাঁর তত্ত্বকে কখনই ধর্মীয় বিধানের স্তরে নিয়ে যাননি। তাত্ত্বিকভাবে, পরীক্ষা দ্বারা নানারকম ভাবে আইনস্টাইনের তত্ত্বকে যাচাই করার চেষ্টা হয়েছে। সমকালীন কোন তত্ত্বই এতো পরীক্ষার সম্মুখীন হয়নি। আপেক্ষিকতাবাদের কিছু ত্রুটির কথা আইনস্টাইনের মনে মাঝে মাঝে উঁকি দিত যদিও নিজের তত্ত্বে তিনি খুবই বিশ্বাসী ছিলেন।

"A hundred against Einstein" বইটির কথা তাঁকে জানান হলে তিনি শুষ্কভাবে বলেছিলেন "One is enough"।

আইনস্টাইনের উত্তরাধিকারী

১। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব পরমাণুর রহস্য ব্যাখ্যা করতে পারে।
২। এক জায়গায় আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব পরস্পর বিরোধী।
৩। কোয়াণ্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদের মিলন এক বিরাট কাজ হবে।
৪। যাইহোক আইনস্টাইনের কীর্তি অক্ষয়।

১৯২৭ সালে একটি আলোচনা সভায় আইনস্টাইন ও নীলস্ বোরের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটে। এর পরেই আইনস্টাইন কিছুটা চুপ হয়ে যান ও তাত্ত্বিক পদার্থ বিদ্যার অবিসংবাদী নেতা হিসাবে চিহ্নিত হন বোর। বোর ও আইনস্টাইনের মতপার্থক্য কিন্তু বিশেষ অর্থবহ। তাঁদের মতবিরোধ বোঝার ব্যাপারে একটি বিরাট ফাঁককেই নির্দেশ করে। মাধ্যাকর্ষণ ও কোয়ান্টাম তত্ত্ব একটি বিন্দুতে পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। সাধারণ আপেক্ষিকতা অনুযায়ী মাধ্যাকর্ষণ অপ্রতিহত। কৃষ্ণগহবরের ভেতরে অথবা সঙ্কুরণশীল বিশ্বে সমস্ত কিছু বস্তু জ্যামিতিক বিন্দুতে পরিণত হয়ে যাবে। এই বিন্দু স্থান কালের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্নতা (Singularity) কেননা তখন বিরাট ভর কোন স্থান অধিকার করছে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইনস্টাইন এই মতেরই প্রবক্তা ছিলেন।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা কিন্তু এ ধরণের ঘটনা বন্ধ করতে পারে। পরমাণুরা তড়িৎ বলের প্রভাব সত্ত্বেও বেশ কিছু পরিমাণ স্থান অধিকার করবে তার ব্যাখ্যা কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা দিতে পারে। পারমাণবিক কণারা তাদের গতির জন্যই একটি স্থান অধিকার করে। স্থানের অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার জন্য পারমাণবিক কণারা প্রকৃতপক্ষে ছড়িয়ে আছে। অনিশ্চয়তা কতদূর বিস্তৃত হতে পারে তা নিশ্চিত।

সুতরাং কৃষ্ণগহবরের সঙ্গেও অনিশ্চয়তা সংশ্লিষ্ট। যদি মনে করা যায় যে কৃষ্ণগহবর ক্রমশ ছোট হচ্ছে তাহলে আমরা 'প্লাংক ভরে' উপনীত হব। প্লাংক হলেন কোয়ণ্টাম তত্ত্বের উদ্গাতা। প্লাংক ভরের ব্যাস হবে তার স্থানের অনিশ্চয়তার সঙ্গে সমান। এর ফলে শূন্যে কৃষ্ণগহবর আর ছোট হতে পারবে না। প্লাংক ভর এক গ্রামের দশ মিলিয়ন গুণ। এই পরিমাণ ভরবিশিষ্ট কৃষ্ণগহবরের বস্তু ঘনত্ব খুবই বেশী। বিগ ব্যাং এর প্রথম পর্যায়ে এই ধরণের বস্তু ঘনত্বই বিরাজ করত। এই দূরত্বে এবং ঘনত্বে পদার্থবিদ্যা এক বিরাট দুর্যোগের মুখোমুখি হয়। এই অবস্থায় আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ন্টাম তত্ত্ব দুইই কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলে। যদি

বিশ্ব একটি জ্যামিতিক বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে পদার্থবিদদের নিশ্চিতভাবে বলে দিতে হবে সৃষ্টির প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত কি ঘটেছিল অর্থাৎ বস্তু ঘনত্ব প্লাঙ্ক ভরের বস্তু ঘনত্বের চেয়ে কম হওয়া পর্যন্ত কি ঘটেছিল। বিগ ব্যাং তত্ত্ব থেকে জানা যায় যে এই সময় $১০^{-৪৩}$ সেকেন্ড। তাহলে খুব সামান্য সময়ের জন্যই মানুষের অজ্ঞতা? একজন পদার্থবিদের কাছে ব্যাপারটা কিন্তু এরকম নয়। আমরা যদি কৃষ্ণগহবর বা বিগ ব্যাং তত্ত্বকে দূরে সরিয়ে রাখি তাহলেও মাত্রাতিরিক্ত ঘনত্বে আপেক্ষিকতাবাদ ভেঙ্গে পড়বে। খুব স্বল্প দূরত্বে কি হবে তা ভাবতে গিয়ে অনেকে মনে করেন যে মাধ্যাকর্ষণ এই দূরত্বে তড়িৎ ক্ষেত্রের মত শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সে কাহিনী তখন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের চেয়ে ভিন্ন হবে।

পদার্থবিজ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো যতখানি সম্ভব সরল করে প্রকৃতিকে বোঝা। চারিদিকে তাকালেই পদার্থবিজ্ঞানী বিভিন্ন ধরণের বস্তু বিভিন্ন ধরণের বল দেখতে পান। গ্রীকরা সর্বপ্রথম প্রকৃতিতে শৃংখলা আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। বিংশ শতাব্দি পর্যন্ত এই প্রচেষ্টার অগ্রগতি অসামান্য। দৃশ্যমান সব কিছু পরমাণু দিয়ে তৈরী। পরমাণুরা আবার প্রকৃতি সৃষ্ট ছোট ছোট কণার সমষ্টি। বল ক্ষেত্রের তালিকা তুলনামূলক ভাবে ছোট। মাধ্যাকর্ষণ, তড়িৎ ক্ষেত্র, কেন্দ্রীন বল ও দুর্বল বিক্রিয়া। শেষোক্ত দু-ধরণের বল কেন্দ্রীন নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কি ধরণের কণা দিয়ে ও কি ধরণের বলের সাহায্যে একটি বস্তু তৈরী জানলে সবকিছুই ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

কি কারণে প্রকৃতি বিশেষ ধরণের কণা বা বিশেষ ধরণের বল বেছে নিলো? তাদের নিজেদের মধ্যে অথবা স্থান কালে বা মহাজাগতিক ইতিহাসের সঙ্গে তাদের কি সম্পর্ক? আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়াণ্টাম তত্ত্বের মধ্যে বিরোধই এসব প্রশ্নের উত্তর পাবার অন্তরায়।

মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের বাকী সব অংশের মিল ঘটাবার প্রথম প্রয়াস হল ১৯৭৪ সালে। এই বছরেই বিজ্ঞানী হকিন্স তাত্ত্বিক ভাবে বিস্ফোরণ শীল কৃষ্ণগহবরের কথা বলেন। অতি শক্তিশালী মাধ্যাকর্ষণ, কোয়াণ্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী নীতিগতভাবে শূন্যস্থান থেকে ভর সংকোচন করতে পারে। ইংল্যাণ্ডের রাদারফোর্ড গবেষণাগারের সভাতে হকিন্স তাঁর তত্ত্ব পেশ করেন। এই তত্ত্ব শুনে জন হুইলার বলেছিলেন "বিদায় জ্যামিতি"। এর অর্থ হলো মাধ্যাকর্ষণ ও কোয়াণ্টাম তত্ত্বের মিলন ঘটাতে আইনস্টাইনের স্থান কালের ধারণা উপযুক্ত নয় কারণ স্বল্প দূরত্বে জ্যামিতির নিয়মগুলিই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী রোজার পেনরোজের মতে 'প্লাঙ্ক ভর' হবার আগেই জ্যামিতির নিয়মগুলি নিষ্ক্রিয় হতে থাকবে। পেনরোজের মতে জ্যামিতির

চেয়ে আরও গভীর কিছু সন্ধান করতে হবে। এই প্রসঙ্গে দুটি নতুন তত্ত্বের কথা বলা যায়। একটি হলো পেনরোজের 'twistor' তত্ত্ব ও অপরটি হলো ফ্রীডম্যানের 'supergravity' তত্ত্ব। দ্বিতীয় তত্ত্বটি আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ ও কোয়াণ্টাম তত্ত্বের কণাদের মধ্যে এক সংযোগ স্থাপন করে।

যে সব জিনিষ নিয়ে বস্তুরা তৈরী তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী হলো ইলেকট্রন ও ও কোয়ার্ক। যদি কেউ একটি ইলেকট্রন তৈরী করে তাহলে তাকে একটি প্রতীপ ইলেকট্রনও তৈরী করতে হবে। এই ভাবেই প্রকৃতি তার হিসাবের খাতা পরিচ্ছন্ন রাখে। এইসব দীর্ঘস্থায়ী কণাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা স্থান অধিকার করে। অনেকগুলি ইলেকট্রন আছে এমন একটি পরমাণু কম সংখ্যক ইলেকট্রন আছে এমন পরমাণুর চেয়ে বেশী জায়গা নেবে। আপাতদৃষ্টিতে বল বহনকারী কণারা আলাদা। অলোককণা বা ফোটন তড়িৎ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। মেসন বা যুক্ত শক্তিশালী কেন্দ্রীন বলের সঙ্গে। এইসব কণা বা বস্তুও প্রতীপ বস্তুর সংমিশ্রণে তৈরী। যেমন ফোটন ইলেকট্রন ও প্রতীপ ইলেকট্রন (পসিট্রন) দিয়ে তৈরী। সুপার গ্র্যাভিটি তত্ত্বে এ ধরণের কণা ও বলবাহী কণাদের একই জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ হিসাবে ধরা হয়েছে। নীতিগতভাবে ধাপে ধাপে একটি কণাকে অন্য কণাতে পরিবর্তিত করে দেওয়া যায়।

'সুপার গ্র্যাভিটি' ধারণার সঙ্গে আইনস্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের সম্পর্ক কি? বিস্তারিত ব্যাখ্যার মধ্যে না গিয়ে বলা যায় যে 'সুপার গ্র্যাভিটি' তত্ত্বের মধ্যে সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নিহিত আছে। সুপার গ্র্যাভিটিতে মাধ্যাকর্ষণের কোয়াণ্টাম হলো গ্র্যাভিটন। মাধ্যাকর্ষণবাহী কণা গ্র্যাভিটন এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। সুপার গ্র্যাভিটিতে আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুবকের (cosmo-logical constant) আবির্ভাব চাঞ্চল্যকর। মহাজাগতিক ধ্রুবক সুপারগ্র্যাভিটি থেকে উদ্ভূত একটি আশ্চর্যজনক বলকে বোঝায় যা তড়িৎ এবং পারমাণবিক কণাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের ওপর নির্ভর করে। পারমাণবিক নিয়মাবলী ও বিশ্বের অবস্থানের মধ্যে এক যোগসূত্র রচনা করে এই ধ্রুবক।

আইনস্টাইনের জন্মের একশত বছর পরে নতুন প্রতিভার আসার সময় হয়েছে। কোনো বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের স্থান গ্রহণ করবেন যেমন ভাবে আইনস্টাইন নিউটন, ম্যাকসওয়েলের স্থান অধিকার করেছিলেন। ১৯৭০ সালের শেষভাগে পদার্থ-বিদ্যায় ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে নতুন নতুন তথ্য, চিন্তা সংযোজিত হয়েছে। যাই হোক্ না কেন আইনস্টাইনের অবদান অবিনশ্বর। তাঁর অনেক চিন্তা ভাবনা হয়ত হারিয়ে যাবে কিন্তু ১৯০৫-১৯১৭ পর্যন্ত তাঁর যে কাজ তা কোনদিনই মূল্যহীন

হবে না। শিশুরা খেলাচ্ছলে যেমন মালা গাঁথে ঠিক তেমনি ভাবে তিনি ভর ও শক্তি বা স্থানকালকে একই সূত্রে বেধে ফেলেছিলেন। বর্তমান শতাব্দ যতই উন্নাসিক হোক না কেন তরুণ আইনস্টাইন সম্বন্ধে বলা যায় "Near the god no mortal may approach".

আরও পড়ার জন্য সুপারিশ

P.G. Bergman : Introduction to the theory of Relativety (Prentice Hall 1969)

R.C. Tolman : Relativity, Thermodynamics and cosmology (Oxford Clarendon Press)

Max Born : Einstein Theory of Relativity (Dover)

A.S. Eddingtion : Mathematical Theory of Relativity (Camb. Univ. Press)

S.N. Gupta : Theory of Relativity (Meenakshi Prakashan)

শ্রীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় : আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ)

শঙ্কর সেনগুপ্ত : পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ (বেস্ট বুকস্)

নিউটনের তত্ত্ব আজ পরিচিত, তাঁর সূত্রগুলি তেমন কঠিন বলে মনে হয় না। দীর্ঘদিনের পরিচিতিই এর কারণ। নিউটনের অনেক পরে আইনস্টাইনের আবির্ভাব ঘটার দরুণ আইনস্টাইনের তত্ত্ব ততটা পরিচিতি লাভ করেনি আর সেই কারণেই হয়ত সাধারণ মানুষের কাছে তা দুর্বোধ্য মনে হয়। আইনস্টাইন যেভাবে বিশ্বকে দেখেছিলেন তা কিছুটা জটিল সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তবে দীর্ঘ পরিচিতির আওতায় আনতে পারলে হয়ত এই জটিলতা একদিন দূর হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে 'আইনস্টাইনের বিশ্ব' বইটি রচিত। আইনস্টাইনের ভাবধারা তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো প্রাঞ্জল ভাষায়। চেষ্টা যে সর্বত্র সফল এ দাবী বর্তমান লেখকের নেই—তবে এই আশা আছে যে বইটি কিছু মানুষকে আইনস্টাইনের তত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত করে তুলবে।

লেখক ডঃ শংকর সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল শিক্ষকতা ও গবেষণা নিয়ে ব্যাপৃত। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের রীডার। পদার্থবিজ্ঞানে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবাসী কলেজ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, সাহা ইনস্টিটিউট ও নিউক্লীয়ার ফিজিকস্, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সময় সময় যুক্ত ছিলেন। গবেষণা ও শিক্ষকতা ছাড়া উনি বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায় ব্রতী। এঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বই হলো "সূর্যের আদিঅন্ত" ও "পদার্থবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ"।

১৮.০০

বেস্ট বুক্স্
১এ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

ISBN 81-85262-09-2.

মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
ও
অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস

মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান

শ্রী দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
ও
অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস